KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : নীর রহমান
Title : চতুরঙ্গ	Size : 7"x9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৫১/১ ৫১/2 ৫১/৩ ৫১/৪	Year of Publication : বৈশাখ ১৩৯৭ ॥ May 1990 জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৭ ॥ Jun 1990 আষাঢ় ১৩৯৭ ॥ July 1990 শ্রাবণ ১৩৯৭ ॥ Aug 1990
	Condition : Brittle : Good ✓
Editor : আবদুর রউফ	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫১ সংখ্যা ৩ জুলাই ১৯৯০

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

"নীচের তলা থেকে বিপ্লব" সন্দর্ভে আজকের অতিপরিচিত আন্তর্জাতিক বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতাদর্শের ব্যাখ্যা করেছেন শিবনারায়ণ রায়।

সমাজতাত্ত্বিকের অনুসন্ধিৎসা নিয়ে 'মহাভারতকথা'র আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক জীবন এবং এই মহাকাব্যের নান্দনিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন অধ্যাপিকা অরুণা হালদার।

"কঙ্কাবতী", "বুড়ো আংলা" এবং "হ-য-ব-র-ল"-র পিছনে তত্ত্ব আর তথ্য অনুসন্ধানের ছায়াবাজি করেছেন ড. করবী দাশগুপ্ত।

বাঙলা সাহিত্যে গোটেচর্চা : ড. শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়।

প্রথম বাঙালি লেখিকাকে নিয়ে অধ্যাপক বসন্তকুমার সামন্তের গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ।

মন এবং মস্তিষ্কের সম্পর্কের ধারণার ইতিহাস প্রসঙ্গে ড. দেবব্রত ঘোষের নিবন্ধ।

মহারাষ্ট্রের লোকনাট্য "তামাশা" নিয়ে কিরণশঙ্কর মৈত্রের প্রতিবেদন।

বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে বদরুদ্দিন উমরের বইয়ের আলোচনা।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের চিঠির জবাবে দিব্যজ্যোতি মজুমদার

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মনের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

— শ্রীমা

বর্ষ ৫১। সংখ্যা ৩
জুলাই ১৯৯০
আষাঢ় ১৩৯৭

নীচের তলা থেকে বিপ্লব শিবনারায়ণ রায় ১৫৭
মহাভারতকথা অরুণা হালদার ১৮০
ছায়াবাজি করবী দাশগুপ্ত ১৯৩
প্রসঙ্গ : মন ও মস্তিষ্ক দেবব্রত ঘোষ ২০০

ধারাবাহিকতা সুরজিৎ দাশগুপ্ত ১৬৪
দারিদ্র্যরেখার পারে সুমন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ১৬৫
সাঁকো কামাল হোসেন ১৬৬
না-লেখারা অতনু বর্মন ১৬৭

দিনকয়েক ইন্দ্রপুরীতে ঘোরাঘুরি প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায় ১৬৮

প্রতিবেশী সাহিত্য-সংস্কৃতি ২০৫-২১৫
চীফের নিমন্ত্রণ ভীষ্ম সাহনী
মহারাষ্ট্রের লোকনাট্য তামাশা কিরণশঙ্কর মৈত্র

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি ২১৬
কবি কৃষ্ণকামিনী : "চিত্তবিলাসিনী" বসন্তকুমার সামন্ত

গ্রন্থসমালোচনা ২২৩
শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, মতি মুখোপাধ্যায়, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত,
রণেন্দ্রনাথ দেব

মতামত ২৪৫
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, দিব্যজ্যোতি মজুমদার, অরুণশঙ্কর দাশ

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

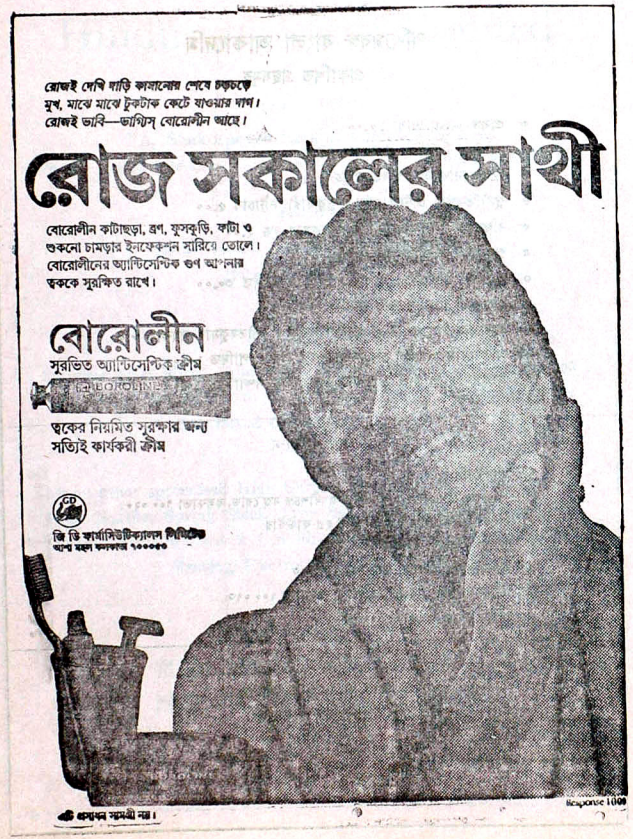

নীচের তলা থেকে বিপ্লব

শিবনারায়ণ রায়

বিপ্লব বলতে বুঝি অল্প সময়ের ভিতরে কোনো সমাজের আমূল পরিবর্তন। আমূল অর্থাৎ আর্থিক, রাষ্ট্রিক, সাম্পর্কিক, সাংস্কৃতিক কাঠামোর রূপান্তর। ইতিহাসে এ ব্যাপার কালেভদ্রে ঘটে। সাধারণত যা ঘটে তা হল একটু-একটু করে এখানে-সেখানে রদবদল, সংস্কার। এতে ঝুঁকি কম, বাধা অল্প, পরিবর্তন যে ঘটছে সেটা সব সময়ে টেরও পাওয়া যায় না। অপর পক্ষে, বিপ্লব একটা নাটকীয় ব্যাপার। যুধ্যমান পক্ষরা প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয়, রূপান্তরে সমাজের সব মানুষের জীবনই কমবেশি জড়িয়ে যায়, উপরতলার প্রতিষ্ঠিত মানুষদের পতন ঘটে, প্রায় ক্ষেত্রেই বিস্তর রক্তপাত হয়, ঝুঁকিও প্রচুর। উপরতলার মানুষদের উচ্ছেদ করে যারা তাদের জায়গায় ক্ষমতায় আসে, তারা যে সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করবে না—এমন কোনো প্রত্যাভূতি বা গ্যারানটি নেই। এটাই বিপ্লবের বড়ো ঝুঁকি।

কালেভদ্রে হলেও ইতিহাসে বিপ্লব ঘটে। বস্তুত, আমাদের শতাব্দীকে বলা হয় যুদ্ধ এবং বিপ্লবের শতাব্দী।[১] আমাদের সময়কার দুই বিশ্বযুদ্ধের মতো সর্বব্যাপী মহাযুদ্ধ ইতিহাসে আর ঘটে নি। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে রাশিয়াতে বিপ্লব, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে চীনদেশে বিপ্লব—পৃথিবীর দুই বিরাট দেশে পরম্পরাশ্রয়ী প্রাচীন ব্যবস্থাকে চুরমার করে নতুন ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিণামে পূর্ব ইয়োরোপ আসে সোভিয়েত ইউনিয়নের ছত্রছায়ায়। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও অনেকগুলি রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে। তাদের সুফল কুফল নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দেয়, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যে-নাটকীয় ভাবে মৌল পরিবর্তন ঘটেছিল তা নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ নেই। আর রাষ্ট্রবিপ্লব সমাজের অন্য সব ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন আনে। পুরোনো জমানা বদলে প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন জমানা।

বিপ্লব কেন ঘটে? মনে রাখা দরকার যে, কোনো একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার উচ্ছেদ নানা কারণে ঘটতে পারে। যেমন, বিরাট কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অথবা বহিরাগত শক্তিমান জনসমষ্টির আক্রমণ, অথবা গৃহযুদ্ধ। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার উচ্ছেদের ফলে প্রকৃষ্টতর ব্যবস্থার প্রবর্তন ক্বচিৎ এভাবে হয়। বিপ্লবের জাতার্থে প্রকর্ষের কথাও নিহিত থাকে। পুরোনো ব্যবস্থায় বিকাশের সম্ভাবনা যখন নিঃশেষিত, সেই ব্যবস্থায় কায়েমি স্বার্থ যখন পরিবর্তনের শক্তিতে সাড়া দিতে অক্ষম, সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ যখন ব্যাপক, তখন সেই ব্যবস্থার উচ্ছেদ করে তার চাইতে প্রাণবন্ত, বিকাশধর্মী, সম্ভাবনাশীল নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন—এই ব্যাপারটাকেই সাধারণত বিপ্লব

বলা হয়। অর্থাৎ শুধু ধ্বংস নয়, অথবা তুলনামূলক ভাবে নিকৃষ্ট ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা নয়, ধ্বংসের ভিতর দিয়ে প্রকৃষ্টতর জমানায় পৌঁছোনোই বিপ্লব। উনিশ শতকে কার্ল মার্কস সমাজবিপ্লবের একটা বিশ্লেষী ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর ব্যাখ্যা অনুসারে, সমাজের ভিতরেই একটি প্রক্রিয়া নিহিত আছে যা প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটিয়ে প্রকৃষ্টতর ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটায়। ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়ার নাম ডায়ালেকটিক। মার্কসের তত্ত্বচিন্তা মুখ্যত দাঁড়িয়েছিল ইয়োরোপীয় ইতিহাসের অভিজ্ঞতার উপরে। তিনি ভারত, চীন, রাশিয়া ইত্যাদি দেশ নিয়ে পড়েছিলেন এবং ভেবেছিলেন, কিন্তু তাঁর ইতিহাসতত্ত্বের উপাদান ছিল পশ্চিম ইয়োরোপ থেকেই মুখ্যত আহৃত। তাঁর বিচার অনুসারে ফিউডাল ব্যবস্থার ভিতর থেকে ক্রমে দেখা দেয় বুর্জোয়াশ্রেণী, এবং বুর্জোয়ারাই ওই ব্যবস্থার উচ্ছেদ করে তার চাইতে প্রগতিশীল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করে। এই ব্যবস্থায় শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি অনেক গুণ বেড়ে যায়, ক্রমে মজুররাই হয়ে ওঠে সমাজের সংখ্যাগুরু জন, পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত সংকট থেকে মানবসমাজকে উদ্ধার করবার দায়িত্ব এবং শক্তি নিয়ে বিপ্লব ঘটায় এই সর্বহারা মজুরশ্রেণী। এরা যে সভ্যতাকে রূপ দেবে তার নাম সমাজতন্ত্র। তা ধনতন্ত্রের চাইতে প্রকৃষ্ট, কারণ ওই ব্যবস্থায় শুধু উৎপাদনপ্রক্রিয়া নয়, উৎপন্ন সম্পদের সম্ভোগও সমাজীকৃত হবে, এবং মানুষ তার পারক্যদশা থেকে মুক্ত হয়ে স্বকীয়তা অর্জন করবে ও সমাজসম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য রচনা করবে। স্বাধীনতা এবং সহযোগ দুইই সুপ্রতিষ্ঠ হবে বিপ্লবোত্তর সমাজতন্ত্রে।

যুবক মার্কস ভেবেছিলেন, ১৮৪৮ সালেই ইয়োরোপ-ব্যাপী বিপ্লব সমাগত এবং সেই আসন্ন বিপ্লবের ঘোষণা-পত্র হিসেবেই তিনি কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো লেখেন। কিন্তু ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে ওই সময়ে ব্যাপক বিক্ষোভের প্রকাশ ঘটলেও কোনো দেশেই ওই সময়ে অথবা পরবর্তী কালে মার্কসীয় অর্থে বিপ্লব ঘটে নি। মার্কস অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নি; বিস্তর বিশ্লেষী এবং উত্তেজক নিবন্ধ লিখেছেন; শ্রমিকদের বিপ্লবী আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়েছেন। কিন্তু জীবনের শেষ-ভাগে তাঁর মনেও বিপ্লবপ্রত্যাশা ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। পারি কমিউনের ভিতরে তিনি দেখেছিলেন বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম ঐতিহাসিক অভ্যুত্থান; কিন্তু ভয়ঙ্কর রক্তপাতের ভিতর দিয়ে সেই অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়। যে আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংগঠন তিনি নিজে গড়েছিলেন, ১৮৭২ সালে তাকে চালান দেন আমেরিকায়, তার মৃত্যু অনিবার্য জেনে। "ক্রিটিক অব গোথা প্রোগ্রাম" (১৮৭৫)-এর পরে তিনি আর নতুন কোনো বই লেখেন নি। অদীনসত্ত্ব বন্ধু এঙ্গেলস ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন যাতে মার্কস শেষজীবন মোটামুটি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যে কাটাতে পারেন। এই সময়ে মার্কস তাঁর মতামত বিষয়ে বিবিধ নোটস করেছেন, বিস্তর চিঠিপত্র লিখেছেন, কিন্তু আর কোনো বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হন নি। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে বর্ধমান শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লববিমুখতা (বা বুর্জোয়ায়ন) ক্রমে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল।

মার্কস-এঙ্গেলস-এর সাক্ষাৎ শিষ্য এডুয়ার্ড বার্নস্টাইন সিদ্ধান্তে আসেন যে বিপ্লব অনিবার্য নয়, এমনকী কাম্যও নয়, বরং সমাজের ক্রমিক বিবর্তনই স্বাভাবিক এবং ধনতন্ত্র এইভাবেই ক্রমে সমাজতন্ত্রে পরিণতি পাবে। এঙ্গেলস-এর একেবারে শেষদিকের লেখায় ("ক্লাস স্ট্রাগলস্ ইন ফ্রান্স"-এর ভূমিকা, মার্চ ১৮৯৫) এই চিন্তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়, এবং স্বয়ং এঙ্গেলস-ই মৃত্যুর আগে বার্নস্টাইনকে তাঁর কাগজপত্রের অছি হিসাবে নিযুক্ত করে যান। কিন্তু অন্য মার্কসপন্থীরা বার্নস্টাইনের ব্যাখ্যাকে "রিভিশ্যনিস্ট" বলে আক্রমণ করেন। এঁদের মধ্যে লেনিন বিপ্লব সম্পর্কে একটি বিশিষ্ট তত্ত্বকে খাড়া করেন, এবং ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবে ক্ষমতা দখলের ভিতর দিয়ে তাঁর এই তত্ত্বটি প্রমাণসিদ্ধ বলে ব্যাপক স্বীকৃতি পায়। তাঁর তত্ত্বের মূল কথাটি ছিল যে

ইতিহাসের স্রোত অনিবার্য ভাবেই বিপ্লবের অভিমুখী বটে, কিন্তু তাকে দ্রুত এবং সফল করার জন্য চাই একটি কঠিন শৃঙ্খলাবদ্ধ গুপ্ত রাজনৈতিক বিপ্লবী দল। বিবিধ কারণসমাবেশে রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে পড়লে এই দল সর্বহারাশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে ক্ষমতা দখল করবে, এবং সমস্ত প্রতিবন্ধক নির্মমভাবে অপসৃত করে সেখানে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবে। লেনিন এই উদ্দেশ্যে রাশিয়ান সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে ভেঙে বলশেভিক পার্টি গড়েন। প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে রুশদেশে জারতন্ত্র ভেঙে পড়ার কয়েক মাস পরে প্রতিযোগী অন্য সব দলকে জবরদস্তি করে হটিয়ে দিয়ে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। সব ক্ষেত্রে পার্টির একচেটিয়া প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত কমিউনিস্ট ইনটার-ন্যাশন্যালের মাধ্যমে লেনিনের বিপ্লবতত্ত্ব দেশে-দেশে ছড়িয়ে যায়, এবং সেসব দেশে বলশেভিক আদলে ছোটোবড়ো কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে।

সব মার্কসপন্থী ভাবুক, এমনকী কমিউনিস্ট দল কিন্তু লেনিনপ্রোক্ত বিপ্লবপন্থা মেনে নেন নি। বস্তুত, লেনিনের সমকালে যিনি ছিলেন পশ্চিম ইয়োরোপে মার্কসীয় বিপ্লবচিন্তার এবং বিপ্লবপ্রচেষ্টার মুখ্য তাত্ত্বিক ও সংগঠক, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সেই রোজা লুক্সেমবুর্গ প্রথমাবধি লেনিনব্যাখ্যাত বিপ্লবপন্থার বিরোধী। রোজার মতে, লেনিন মার্কসের অপব্যাখ্যা করেছেন। কেন্দ্রিত গুপ্তদল রাষ্ট্রবিপ্লবের সুযোগে ক্ষমতা দখল করলে সেই দল যে-ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে, রোজার মতে তা সর্বহারা শ্রমিকের শাসন হবে না, তা হবে সর্বগ্রাসী বলশেভিক পার্টির স্বৈরতন্ত্র। ডাচ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী আনটন প্যানেকুক এবং আরো অনেকে ছিলেন রোজার সমর্থক। কিন্তু রুশ দেশে লেনিন একচ্ছত্র ক্ষমতায় আসেন, আর যুদ্ধোত্তর জার্মানিতে বিপ্লববিরোধী সেনানায়করা রোজাকে নির্মমভাবে হত্যা করে তাঁর দেহ বার্লিনের খালে ভাসিয়ে দেয়। অতঃপর বিশের দশকের সূচনায় কমিউনিস্ট জগতে লেনিনের এবং ত্রিশের দশকের সূচনায় একচ্ছত্র ক্ষমতায় তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে স্তালিনের প্রাধিকার অপ্রতর্ক্য হয়ে ওঠে।

ক্রুশ্চভের ঐতিহাসিক বক্তৃতা প্রকাশিত হবার আগে পর্যন্ত অধিকাংশ প্রগতিপন্থী শিক্ষিত লোকেরই ধারণা ছিল বলশেভিক বিপ্লবের ফলে রাশিয়াতে জারিস্ট স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘ'টে প্রকৃষ্টতর এক নবীন সমাজসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ধারণার বিরুদ্ধে বেশ কিছু প্রবন্ধ এবং বই বেরিয়েছিল, কিন্তু বলশেভিক প্রচারের তোড়ে তারা বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারে নি। কিন্তু গত তিরিশ বছরে এই ধারণায় অসংখ্য ফাটল ধরেছে, এবং ১৯৮৯ সালের নাটকীয় ঘটনাবলী এই ধারণাকে একেবারে চুরমার করে দিয়ে গেল। পরমাণবিক ধ্বংস-সামর্থ্যে রাশিয়া আজ পয়লা নম্বর রাষ্ট্র বটে, কিন্তু সেখানে সাধারণ মানুষের জীবনে না এসেছে স্বাধীনতা না স্বাচ্ছন্দ্য। স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্পবিপ্লব অনেকটা সাধিত হয়, পূর্ব ইয়োরোপের দেশগুলি রুশ সাম্রাজ্যের অধীন হয়। বলশেভিক প্রচারের প্রভাব দেশে-দেশে ছড়ায়। কিন্তু একই সঙ্গে পরিকল্পিত ভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নে কোটি-কোটি লোক বলশেভিক জুলুমের বলি হয়—চাষী উচ্ছিন্ন হয় তার খেত থেকে, দাস-শ্রমিকশিবিরগুলি ভরে ওঠে বন্দী স্ত্রীপুরুষে, জেলে এবং নির্বাসনে লোকচক্ষু থেকে বিলুপ্ত হয় অসংখ্য লোক, বিচারের প্রহসন করে অথবা বিনা বিচারেই হত্যা করা হয় লক্ষ-লক্ষ মানুষকে। পার্টিকবলিত সরকারের গুপ্তচরে ছেয়ে যায় সারা দেশ। আইনের শাসন, ব্যক্তিস্বাধীনতা, নাগরিক ও রাজনৈতিক সব অধিকার বাস্তবে অবলুপ্ত হয়। অথচ কৃষিজাত বা নিত্যব্যবহার্য পণ্যের উৎপাদন প্রয়োজনমাফিক বাড়ে না; উপরতলা এবং নীচের তলার মধ্যে ব্যবধান বাড়তেই থাকে। কোথায় সেই অভীপ্সিত সমাজতন্ত্র

বিপ্লব যার উপায় মাত্র? ১৯৮৯ সালে পূর্ব ইয়োরোপের প্রত্যেকটি দেশে কমিউনিস্ট জুলুমতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ-আন্দোলন অপ্রত্যাশিত ভাবে সফল হয়ে উঠেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন-এও কমিউনিস্ট পার্টির ভবিষ্যৎ আজ অনিশ্চিত। সমস্ত কমিউনিস্ট জগতে প্রশ্ন উঠেছে প্রকৃষ্টতর জমানার জন্যে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব পুরোপুরি বর্জনীয় কিনা।

লেনিন-স্তালিন-প্রবর্তিত পথে বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত বিপ্লব জুলুমতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু তা থেকে কি এই সিদ্ধান্তে আসা সঙ্গত যে বিপ্লবেরই কোনো প্রয়োজন নেই, সব অবস্থাতেই বিপ্লব অকাম্য, অথবা আদর্শানুযায়ী বিপ্লব অসম্ভব? দার্শনিক বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় অন্তত তা মনে করতেন না। তাঁর মহাবিচিত্র জীবনে অনেকগুলি বাঁক দেখা যায়, কিন্তু যেটি তাঁর জীবনের মূল স্রোত সেটি হল ঐকান্তিকভাবে বিপ্লবের সাধনা। তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে কয়েক বছর তাঁর সহকর্মী হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাঁর বিপ্লবসাধনার অন্যতম সূত্রটিকে যেটুকু বুঝেছি বর্তমান প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে সেটির পরিচয় দিই।

বিদেশী শাসনের গ্লানি এবং দেশবাসীর দুরবস্থা তরুণ বয়সেই মানবেন্দ্রনাথকে এতটা গভীরভাবে বিচলিত করেছিল যে ব্রাহ্মণ পুরোহিত-পণ্ডিত ঘরের পরম্পরাগত নিরাপত্তাকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে আঠারো বছর বয়সে তিনি গুপ্তবিপ্লবী দলে যোগ দেন (১৯০৫)। তখন বিপ্লব বলতে তিনি বুঝতেন সশস্ত্র সংগ্রামে বিদেশী শাসনের উচ্ছেদ এবং ভারতবর্ষের পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন। প্রথম মহাযুদ্ধের সুযোগে তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা বাঙলায় এবং উত্তর ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেন। অস্ত্রসংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি ইন্দোনেশিয়া, জাপান, কোরিয়া, মহাচীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়ে পৌঁছন মেক্সিকোতে। অভ্যুত্থানপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। মেক্সিকোতে বিপ্লবী আন্দোলনে কাজ করবার সময়ে মার্কস-এর রচনাদি পড়ে তিনি বুঝতে পারেন যে প্রকৃত বিপ্লবের উদ্দেশ্য শুধু বিদেশী শাসনের অবসান নয়, স্বদেশী শোষকদেরও উচ্ছেদ বটে। ১৯১৯ সালে তিনি মেক্সিকোতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরের দশ বছর প্রথমে লেনিন এবং পরে স্তালিনের সহকর্মী হিসেবে কমিউনিস্ট ইনটারন্যাশনালের একজন প্রধান তাত্ত্বিক এবং সংগঠক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। চীনের বিপ্লবপ্রচেষ্টাতেও তাঁর একটি প্রধান ভূমিকা ছিল। সে সম্পর্কে সম্প্রতিকালে কমিউনিস্ট চীনের ঐতিহাসিকরা অনেক মূল্যবান তথ্যাদি আবিষ্কার করেছেন এবং তার কিছু কিছু প্রকাশিত এবং আলোচিত হয়েছে। (দ্রষ্টব্য: Huang I-Shu, *Chinese Source Materials on M. N. Roy – A Report*, 1988)।

স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইনটারন্যাশনাল ১৯২৮ সালে যে পথ গ্রহণ করে মানবেন্দ্রের কাছে সেটি অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে হয়, এবং সেই পথের সমালোচনা করে তিনি অনেকগুলি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেন। সম্প্রতি এই জার্মান প্রবন্ধমালার ইংরেজি অনুবাদ আমার সম্পাদনায় *Selected Works of M. N. Roy Vol. III 1828-32* (Oxford University Press)-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অতঃপর কমিনটার্নের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে। তিনি দেশে ফেরার পর ছ বছর কারাবন্দী অবস্থায় থাকেন। বিপ্লবের আদর্শ ও পন্থা নিয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করেন। তাঁর জীবনের তৃতীয় ও শেষ পর্বে তাঁর বিপ্লবচিন্তা যে আকার নেয় তার নাম দেন র‍্যাডিক্যাল ডিমোক্র্যাসি বা র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম। নীচে থেকে না হলে যে বিপ্লব সফল বা সার্থক হতে পারে না, এটি তাঁর কাছে ক্রমেই খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কমিউনিস্ট অথবা অন্য কোনো দলের নেতৃত্বে এতাবৎ যেসব বিপ্লব হয়েছে তাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে সংগঠিত উনজনের হাতে। তারা পরিবর্তনের চেষ্টা করেছে উপর থেকে ক্ষমতা প্রয়োগ করে। এই চেষ্টার ফলে একদিকে যেমন দলের হাতে সর্ববিধ ক্ষমতা কেন্দ্রিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ স্ত্রী-পুরুষ পরিণত হয়েছে হুকুম তামিলের যন্ত্রে। মানবেন্দ্র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারেন, এই প্রক্রিয়া যথার্থ বিপ্লব নয়, এটি এক সংখ্যালঘু গোষ্ঠী থেকে অন্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীতে ক্ষমতার হস্তান্তর মাত্র। মাঝখান থেকে বুর্জোয়া ব্যবস্থায় যেটুকু-বা ব্যক্তিস্বাধীনতা, বা মতপ্রকাশের এবং বিকল্প সংগঠন গড়ার অধিকার ছিল তাও বিনষ্ট হয়। সুতরাং এই পথ গ্রহণীয় নয়।

কিন্তু আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে। বুর্জোয়া-প্রবর্তিত ধনতন্ত্রের ত্রুটি বিস্তর, আবার কমিউনিস্টদের প্রবর্তিত পার্টি জুলুমতন্ত্রের মৌলিক গলদও আর গোপন নেই। দুয়েরই বিকল্পে একটি প্রকৃষ্টতর সমাজের পরিকল্পনা এবং উদ্ভব আজ জরুরি। এটি এমন একটি সমাজ হবে যেখানে মুষ্টিমেয় মানুষ বাকি স্ত্রী-পুরুষের ভাগ্য নিরূপণ করবে না; যেখানে সাধারণ মানুষ নিয়ত নিজের-নিজের ব্যক্তিগত জীবন এবং সামূহিক জীবন সম্পর্কে স্বাধীন, সচেতন এবং সক্রিয় ভাবে ফলপ্রদ সিদ্ধান্ত নিতে পারবে; যেখানে মুনাফার জন্য নয়, রাষ্ট্র অথবা কোনো সংগঠনের ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য নয়, সাধারণ মানুষের প্রয়োজন মেটানো এবং সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য প্রাকৃতিক এবং শ্রমজাত সম্পদ ব্যবহৃত হবে; যেখানে প্রতিযোগিতা বা দ্বন্দ্ব নয়, সহযোগ হবে সমাজের স্থায়িত্ব এবং বিবর্ধনের সূত্র; যেখানে আমলাপুলিশমালিকমহাজন কর্তৃত্ব করবার কোনো সুযোগ পাবে না; যেখানে নিয়মকানুন প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠানের ভিতরে প্রতিফলিত হবে মানুষের জ্ঞান, কল্যাণবুদ্ধি, উদ্ভাবনাসামর্থ্য। এই বিপ্লবোত্তর ব্যবস্থায় রাষ্ট্রিক এবং আর্থিক শক্তি হবে পরিপূর্ণভাবে বিকেন্দ্রিত। সবচাইতে নীচের তলার সংগঠনগুলি হবে সবচাইতে সক্রিয়, সম্পন্ন এবং দায়িত্বশীল। নীচের তলার সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা যতই স্বাধীন নির্বাচনের সূত্রে উপরতলার সংগঠনগুলিতে যাবে ততই তাদের ক্ষমতা এবং আয়ত্তাধীন সম্পদকে অধিকতর সীমাবদ্ধ করা হবে। নীচের তলার সমর্থন ছাড়া উপরতলার সংগঠনগুলির পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া বা সিদ্ধান্তকে কার্যকর করা অসম্ভব হবে। রাষ্ট্র থাকবে, কিন্তু সেটি হবে বিকেন্দ্রিত রাষ্ট্র, যেখানে আমলা, পুলিশ, সেনাবাহিনী খুব লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পাবে; প্রধান ভিত্তি হবে সমবায়; সরকারের ভূমিকা কমবে; বৃহদাকার পরিকল্পনার জায়গায় আসবে প্রমিত পরিকল্পনা; যারা উৎপাদন করে এবং সেই উৎপন্ন যাদের প্রয়োজন মেটায় তারাই এইসব প্রমিত পরিকল্পনার পূর্ণতা এবং ব্যবস্থাদি নির্ধারণ করবে।

সমাজের এই আমূল রূপান্তর বৈপ্লবিক—একটু-আধটু সংস্কারের মারফত এই রূপান্তর সম্ভব নয়। কীভাবে এই রূপান্তর ঘটবে? মানবেন্দ্রনাথ দুটি পরস্পরের পরিপূরক কর্মসূচীর পরিকল্পনা করেছিলেন। প্রথমটির তিনি নাম দিয়েছিলেন রেনেসাঁস বা দার্শনিক তথা সাংস্কৃতিক বিপ্লব। এই রেনেসাঁস মুষ্টিমেয় উচ্চশিক্ষিতের নবজাগরণ নয়, এটির অর্থ সর্বসাধারণের উজ্জীবন। অসহায়তাবোধ, নিয়তিনির্ভরতা, বিচারবিমুখতা, গড্ডলতা, গুরু-সাঁই-পীর-অবতার-মহাত্মা-নেতাজী-উদ্ধারকর্তার ভরসায় প্রতীক্ষার প্রবণতা, নির্বেদ, হীনম্মন্যতা, বাক্‌ছল—এসব ত্যাগ করে সাধারণ স্ত্রীপুরুষকে হতে হবে আত্মপ্রত্যয়ী এবং যুক্তিশীল, উদ্যোগী এবং সহযোগকামী, জগৎজিজ্ঞাসু এবং মুক্তমনা, বিবেকী এবং স্বাধীনচিত্ত। বহুকাল ধরে সাধারণ মানুষকে শেখানো হয়েছে সে দুর্বল এবং অক্ষম, অবস্থাকে মেনে নেওয়া ছাড়া তার অন্য উপায় নেই, রহস্যময় নানা শক্তির হাতে সে পুতুল মাত্র, শুধু অল্প কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি এইসব রহস্যময় শক্তির সুলুকসন্ধান জানে, সেইসব ব্রাহ্মণ পুরোহিত, গুরুগোসাঁই, পীরপয়গম্বর, মোল্লাদরবেশরাই তাকে এই দুঃসহ সংসারে কিছুটা নিরাপত্তা

দিতে পারে। এই সন্ত্রস্ত, জড়ীভূত, নিরুদ্যম, আচার-সর্বস্ব, অভ্যাসাশ্রয়ী, জিজ্ঞাসারিক্ত, মোহাবিষ্ট দশাকে স্থায়ী করবার জন্য চতুর সুবিধাবাদী প্রতারকরা বানিয়েছে এক কাল্পনিক জগৎ। সেখানে আছে স্বর্গ-নরক, দেবদানব, ভূতপ্রেত, পাপপ্রায়শ্চিত্ত, অতি-প্রাকৃতিক শক্তিদের দালাল এবং বিবিধ পূজাপ্রকরণ। সাধারণ মানুষের মগজধোলাই করে এই প্রতারকরা তাদের উদ্ভাবিত জগৎকেই বাস্তব বলে বিশ্বাস করতে শিখিয়েছে। এই মোহগ্রস্ততা থেকে মুক্ত না হলে বিপ্লবোত্তর বিকেন্দ্রিত স্বাধীন সমাজের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। গুরু ও মোল্লার জায়গায় আধুনিক কালে পার্টি-পুলিশের রাজত্ব কায়েম হলে তাকে আর যাই বলা যাক, বিপ্লব বলা চলে না। সর্বোদয়ী রেনেসাঁস বা মানস বিপ্লব র‍্যাডিক্যাল ডিমোক্র্যাসি বা সাধারণ স্ত্রীপুরুষের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রপরিচালিত গণ-তন্ত্রের ন্যূনতম শর্ত।

অপর পক্ষে, সাংস্কৃতিক তথা দার্শনিক বিপ্লবের সঙ্গে-সঙ্গে চাই একেবারে নীচের তলা থেকে গণ-তান্ত্রিক সংগ্রামী গণসংগঠন। বর্তমানে যে ত্রুটিকীর্ণ ব্যবস্থা বিদ্যমান তার ভিতর থেকেই এই বৈপ্লবিক গণ-সংগঠনকে গড়ে তুলতে হবে। মানবেন্দ্র এই সংগঠনের নাম দিয়েছিলেন পিপ্‌ল্‌স কমিটি। স্থানীয় প্রাপ্ত-বয়স্ক স্ত্রীপুরুষরা একত্রিত হয়ে এই সংগঠন গড়বে। এক-এক করে স্থানীয় জীবনের সামূহিক দায়িত্বগুলি —শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথঘাট, আবাস, খাদ্যপানীয়, উৎপাদন ও সরবরাহ, নিরাপত্তা, সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্ম —সবই স্বাধীন, পারস্পরিক সহযোগের ভিত্তিতে পিপ্‌ল্‌স কমিটি গ্রহণ করবে। গ্রামে-গ্রামে, শহরে-শহরে এইসব পিপ্‌ল্‌স কমিটি হবে বর্তমান ব্যবস্থার ভিতরে ভবিষ্যৎ বিকল্প ব্যবস্থার নির্মাতা এবং ভিত্তি। পিপল্‌স্ কমিটিদের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হবে জেলা কমিটি, তাদের প্রতিনিধি নিয়ে রাজ্য কমিটি, তাদের প্রতিনিধি নিয়ে আমেল রাষ্ট্রের লোকসভা। বিদ্যমান ব্যবস্থায় যাদের কায়েমি স্বার্থ আছে তারা এইভাবে বিকল্প সংগঠনের উদ্ভব, বিন্যাস এবং বিবর্ধমান ক্রিয়া-কলাপে স্বভাবতই বাধা দেবে। সংঘাত সম্ভবত এড়ানো যাবে না। কিন্তু সমাজের অধিকাংশ মানুষ যদি এই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের উদ্যোগে সক্রিয় অংশ নেয় তাহলে কায়েমি স্বার্থকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের ক্ষমতার দুর্গ থেকে হঠানো দুঃসাধ্য হবে না। তবে এক্ষেত্রেও বিপ্লবের সাফল্য নির্ভর করে এই উদ্যোগে জনসাধারণের স্বাধীন সচেতন এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের উপরে।

এই রেনেসাঁস এবং গণসংগঠনের সর্বোদয়ী আন্দোলন কীভাবে এবং কাদের দ্বারা সূচিত হবে? সারাজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে মানবেন্দ্র স্থির সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে রাজনৈতিক দল মাত্রই এ কাজের শুধু অনুপযোগী নয়, এ আন্দোলনের পরি-পন্থীও বটে। কারণ নিজেদের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রায়ন রাজনৈতিক দল মাত্রেরই অভীষ্ট। রেনে-সাঁস এবং র‍্যাডিক্যাল ডিমোক্রাসির আন্দোলনে যাঁরা শরিক হবেন ক্ষমতা এবং বিত্তের প্রতি লোভ তাঁদের সম্পূর্ণভাবে জয় করতে হবে। তাঁদের সমাজের এবং আপন-আপন বিবেকের কাছে শপথ নিতে হবে যে তাঁরা জনসাধারণের সেবক হবেন, শিক্ষক হবেন, পথপ্রদর্শক হবেন, কিন্তু কোনো সময়েই কোনো ক্ষমতার পদ গ্রহণ করবেন না। তাঁরা হবেন নিজেরা মুক্তমনা, নির্ভীক, নির্লোভ, স্বনির্ভর, সত্যপরায়ণ, কর্মিষ্ঠ মানবহিতৈষী। তবেই তাঁরা সর্বসাধারণের উজ্জীবনের সহায়ক হতে পারেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তাঁরা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নেবেন না অথবা কামনা করবেন না। মানবেন্দ্রনাথ মনে করতেন এই অনুশীলিত স্ত্রীপুরুষরাই যথার্থ বিপ্লবী মানবতন্ত্রী এবং রেনেসাঁসের পথপ্রদর্শক। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে তিনি তাঁর নিজের রাজনৈতিক দল র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে সদস্যদের সমর্থন নিয়ে ১৯৪৮ সালে বিলুপ্ত করেন। তারপরে তিনি তাঁর চিন্তার একটি বিস্তৃত এবং সন্নিবদ্ধ বিবরণ লেখেন

তাঁর *Reason, Romanticism and Revolution* নামে মহাগ্রন্থে।

মানবেন্দ্রের এই বিপ্লবতত্ত্ব আমার চিন্তায় এবং জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। এই তত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীর চিন্তার কিছু মিল, কিছু অমিল দেখতে পাই। তা নিয়ে আমি অন্যত্র কিছুটা আলোচনা করেছি। (*Tagore, Gandhi, and Roy : Three Twentieth Century Utopians*)। এই তত্ত্ব মোটেই সমস্যামুক্ত নয়। এ প্রসঙ্গে কোনো-কোনো মৌলিক সমস্যা নিয়েও আমি কিছুটা বিচার করেছি। (*Radical Humanism, Revolution and Renaissance*)। কিন্তু সমস্যা-সচেতন হওয়া সত্ত্বেও আমি নিঃসন্দেহ যে একেবারে নীচ থেকে মনের মুক্তি এবং গণতান্ত্রিক সংগঠন আজকের দিনে বিপ্লবের অবশ্য কর্মসূচী। এদেশে যারা ধর্মীয় মৌলবাদী, স্তালিন-উপাসক অথবা বিত্ত-এবং-ক্ষমতালিপ্সু, তাদের কাছে নয়, যাঁরা এখনো সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার আদর্শে বিশ্বাসী, যাঁরা এই জরিষ্ণু ও ভ্রষ্টাচারগ্রস্ত ব্যবস্থার আমূল রূপান্তরে আগ্রহী, তাঁদের কাছে নিবেদন করি নীচের তলা থেকে বিপ্লবের তত্ত্ব এবং কর্মসূচী নিয়ে তাঁরা বিচারবিবেচনা করুন এবং সেই মহৎ ঐতিহাসিক আন্দোলন গড়ে তোলায় তাঁরা অংশভাক্ হোন। তাহলে হয়তো এদেশের ঘনায়মান অন্ধকারে জড়তাবিনাশী আলোর উন্মোচন ঘটবে।

এই প্রসঙ্গে পাঠ্য কয়েকটি বই :

P. J. Proudhon, *General Idea of the Revolution in the 19th Century*, tr. Robinson, 1923

Karl Marx on Economy, Class and Social Revolution, ed. Z. A. Jordan, 1975.

Writings of Marx and Engels on the Paris Commune, ed. N. Draper, 1972

E. Bernstein, *Evolutionary Socialism*, 1909

V. I. Lenin, *What is to be done*, 1902

Rosa Luxemburg, *The Russian Revolution*, 1922; 1940.

Anton Pannekoek, *Lenin as Philosopher*, 1948.

Edmund Wilson, *To the Finland Station*, 1940.

M. N. Roy, *Reason, Romanticism and Revolution*, 2 vols, 1952-55.

Raymond Williams, *Modern Tragedy*, 1966.

Leo Labedz (ed), *Revisionism*, 1962.

S.N. Roy (ed), *For a Revolution from Below*, 1989.

ধারাবাহিকতা

সুব্রজিৎ দাশগুপ্ত

ঘর থেকে বেরোনোর আগে
পাখি-পড়া-করে বলে দিল কী কী কিনতে হবে।
তারপর বাড়ি থেকে বাজারের পথে
চেনা-চেনা একজন জিজ্ঞেস করলেন,
কেমন আছেন?
উত্তর দেওয়ার আগেই
প্রশ্নকর্তা আর-একজনকে বললেন,
তোমাকেই খুঁজছিলাম।

বাজারের ভিড়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি,
তাই তো, কী কী কিনতে বলেছিল?
ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসব?
নাকি নিজের বুদ্ধিতে বাজার নিয়ে যাব?

খালি থলে হাতে ঘরে ফিরে দেখি
সেখানে উঠেছে দশতলা বাড়ি
গেটে দরোয়ান জিজ্ঞেস করল,
কোথায় যাবেন?

দারিদ্র্যরেখার পারে

সুমন্ত্র চট্টোপাধ্যায়

আমাদের গাঁয়ে আপনি এসেছেন। বেশি বড়ো নয়। মাঝারি—
কি ছোটোই বলা যায়। এধারে ঘোষপাড়া বামুনপাড়া। একটু
খোলা মাঠ। রাধেশ্যামের মন্দির। তারপর সদগোপদের
পাড়া। একশো বছরেরও পুরোনো আমাদের নতুন পুকুর।
পেরিয়ে গেলে আমাদের গাঁয়ের রেখা ভাগ হয়ে গেল।
এখানে দারিদ্র্যরেখার শুরু। ওপারে বায়েন গায়েন
ভস্মাবাগদী মেঝেনের সংসার। বর্গা অপারেশনে তেমন
কোনো চিকিৎসে হলো না এদের। পাঁচ পুরুষের খেতমজুর
দিনমজুর দেনমজুর এরা। মিছেমিছি রোজ নিয়ে
একদিন বর্গাদার সাধু ঘোষের সাথে শান্তি গায়েনের
লাঠিবাজি হল। অথচ ক' বছর আগেও তারা গানের
দোসর ছিল। হায় ভূমি! হায়গো জমি! মনে যে
কিগো ব্যথা জানতে যদি স্বামী···।

দারিদ্র্যরেখার কাছে রক্ত ভাসে ঘাসে। চারিধার শুনশান।
দারিদ্র্যরেখার ওপারে উনুন ও হাঁড়ির মাঝে শুয়ে থাকে
হতমান হিম অন্ধকার। এপারে হপ্তায় দিনদুই
শোনা যায় উচ্চরোল—জলদি করো জলদি করো,
আজ হাটবার।

সাঁকো

কামাল হোসেন

শব্দের ওপারে এক কালো রঙের সাঁকো :
নৃত্য করে খুদে-খুদে তিনটি বামন
চেহারা যেন ছবিতে আঁকা হৃৎপিণ্ড
উড়তে-উড়তে
সাঁকোর ওপারে বসে বিশ্রাম করে
একটি দাঁড়কাক…

পর পর প্রতিবিম্ব ভাঙার মতো
কুয়াশার শরীর ভেদ করে
চঞ্চল চিত্রকলার ছন্দে
যান্ত্রিক পদ্ধতিতে নৃত্য করে চলে
হৃৎপিণ্ডের মুখোশ আঁটা
সেই তিন বামন…

দাঁড়কাকটি ঝিমোয়
শব্দের তরঙ্গ ক্রমশ লম্বিত ছায়ার মতো
লম্বা হয়—লম্বা হয়—

না-লেখারা

অতনু বর্মন

সারাজীবন খুঁজে বেড়াই সেই লেখাকে,
সেই লেখারা হারিয়ে গেছে অন্ধকারে।
চলতে পথে আবছায়াতে আচম্বিতে
যে লেখারা ঝিলিক মেরে মন-নদীতে
মাছের মতোন লাফিয়ে উঠে, কোথায় গেল।
কোথায় যে যায়। সেই ভাবনা—ভাবনাগুলো।
সেই লেখাদের হয় না লেখা।

সারাজীবন খুঁজে বেড়াই
খ্যাপা যেমন পরশপাথর
পেয়েও আবার হারিয়ে খোঁজে,
অবহেলায় যে লেখাদের
লিখে রাখার পাই নি সময়
তারা আমায় টিট্‌কিরি দেয়,
মুচকি হাসে,
বঁড়শি-ছেঁড়া মাছের মতোন
তারা কি টোপ গিলতে আসে?

ছিপ ফেলেছি মন-নদীতে
কতই না মাছ পড়ল ধরা
ইলিশ থেকে কাংলা পুটি
রাঘব বোয়াল মাগুর কই-ও
পায় নি ছাড়া
তবু আমার মাথার ভেতর
তারাই শুধু চিড়িক মারে
অধরা সেই মাছের মতোন
নিরুদ্দিষ্ট না-লেখারা।

দিনকয়েক ইন্দ্রপুরীতে ঘোরাঘুরি

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

সবে এসেছে অফিসে। কাজকম্মো এখন সব শিকেয় তোলা। সেসব মালিক-মালকিন জোড়ে ঢুকবেন যখন, তখন। এখন একটু গুলতানির মৌতাত। মূর্তিমতী রসভঙ্গ উর্মিলার হস্তদন্ত ছায়া কাচ-দরজার ওপাশে। উঠে আসে বিভাস। জমাটি আড্ডা ছেড়ে, অনিচ্ছের কাঁধে ভর করে।

—কী ব্যাপার? তুমি এমন সময়ে?

—আমি তো স্কুল থেকে নার্সিং হোম ফেরত এখানে।

—কেন, কেন? নার্সিং হোমে কেন? ···কী হয়েছে কী··· কার···?

—ফুলদি তো ওখানে রোববার থেকে। আজ ছুরি ছুটোয় অপারেশন।

—হয়েছে-টা কী ফুলদির ··· খবরটাই বা দিলে কে তোমায়?

—স্কুলে গিয়ে টুকুদির চিঠি পেলাম। ফুলদির ইউটেরাস অপারেশন। টিউমার।

—সে কী! ম্যালিগন্যানট গ্রোথ-ট্রোথ কিছু নেই তো?

—অত শত জানবার সময়টাই-বা পেলাম কোথায়? বায়োপসি করবে ঠিকই। তখনই জানা যাবে।··· কিন্তু আমি বলছিলাম··· এতটা সময় ঠায় থাকা···বাড়িতে কোনো জানান দেওয়া নেই তো··· মেয়েটাও একা···তুমি কি যাবেএকবারটি···তাহলে···

যেন কতই না চিন্তাভাবনার কথা। বিভাস ভুরু কুঁচকে, ঠোঁটে তর্জনী ঠেকিয়ে, তেমনই একটা পোজে। ফুলদি, ফুলমালা চৌধুরী—উর্মির দিদি। শ্যালিকা বলে কথা। সেজন্যেই মুখের কথা একেবারে নাভিমূল থেকে উঠে আসা ধ্বনি। নাদ।

—হুঁ-উঁ-উ-ম।

—যাচ্ছ···তবে!

—না-যাওয়ার কথা এখানে আসে কী করে··· ঠিক আছে, তুমি যাও···আমি খবরাখবর সব নিয়ে ওবেলা ফিরছি।

বিভাসের এই আশ্বাস-দেওয়া কি সত্যিই ভেতর থেকে! ডাক্তার করবে অপারেশন ও-টি-তে। দরজা বন্ধ। লাল-বাল্বের তর্জনী দরজার মাথায়। বাইরে গাদাগুচ্ছের 'একসপার্ট'—রোগীর আত্মীয়স্বজন। পোড়াসিগারেটে ছাইদান উপচানো আর চা-পেয়ালার ঠুনঠুন। কিছু কথা-চালাচালি—ইউটেরাস আর টিউমার বিষয়ে। সবারই অতীত অভিজ্ঞতা, বর্তমান উদ্বেগ আর ভবিষ্যৎ শঙ্কার কল্প-সত্য কথা। কথার খই ফোটানোই শুধু। মাঝে-মাঝে এক-আধবার উঁকিঝুঁকি। করিৎকর্মাদের ব্যস্ত-পায়ের ওপর-নীচ। কত আগাম খবর আনা যায় তারই এক নিঃশব্দ প্রতিযোগিতা যেন। এই তো! কিন্তু তবু যেতেই হয়। কেননা, ভাইদা-মণিদি যাবেন। টুকুদি-সরলবাবু যাবেন। এঁরা সব উর্মির দিদি-জামাইবাবু। উর্মির দাদাদের তো কথাই নেই। সবার ওপরে অনলদা—ফুলদির হাজবেনড। লোকটির ওপর কি একটু টান বিভাসের। মোটের ওপর যেতেই হয়। তবে আর দেরিই-বা কেন শুধুমুধু।

উর্মির অকুস্থলের নির্দেশ—রাসবিহারী ত্রিকোণ পার্কের গায়ে দেখবে ছ-তলা বাড়ি। ওপর থেকে নীচ অবধি চাউস নিওন সাইন—হেভেনলি কিংডম। নিরঝনঝাট যেতে হলে মেট্রোই ভালো। মিনিট দশেকের পাতাল পরিচ্ছন্নতা। একটু আরাম। দামটা একটু চড়া। তবু ওপরের থেকে শতগুণে ভালো। পুষিয়ে যায়। সুতরাং বিভাসের ধর্মতলায় পাতাল-প্রবেশ এবং কালীঘাটে উত্থান।

খানিকটা হাঁটলেই তো ত্রিকোণ পার্ক। কিছু কষ্ট যদিও পচা-ভাদ্রের গুমোটে। তবুও হাঁটাই অনেক নিরঝনঝাট। ত্রিকোণ-পার্কে পৌঁছে চারপাশে বিভাসের ব্যস্ত-চোখের আনাগোনা। তবে সে যা এলাহি ব্যাপার, চোখ না-চালালেও চোখে ধরবেই। 'বাপরে—ইন্দ্রপুরীই বটে।' প্রাচীন কোনো রাজবাড়ি যেন। তফাতের মধ্যে বিশাল আয়তনের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতাও মেঘ-ছুঁই-ছুঁই। ঘাড় পেছনে দু-সমকোণ হেলিয়েও নাগাল পাওয়া ভার। সেই মেঘলোক থেকেই নেমে-আসা বিজ্ঞাপনের দোতলার মুখে সম। খোপ-খোপ চৌকো বিশাল এক-একটা আলো-ভরা বাকস। বাকসের ভেতর এক-একটা অক্ষর। হে-ভে-ন-লি কি-ং-ড-ম। ঢোকার মুখেই দেড়-তলা-সমান গ্রিল-পাঁচিল। গ্রিল গেট।

যেসব মানুষজনের আসা-যাওয়া এখানে, তাদের উচ্চতার সীমানির্দেশ যেন। মাটিতে মিশে-যাওয়া বিভাস তবু গুটিগুটি পায়ে গেটের ভেতর। কেননা, উর্মির দিদি। শ্যালিকা বলে কথা! তাঁর টিউমার ইউটেরাসে। না ঢুকে উপায়।

—এই যে বিভাস, এসে গেছ। খবর কোত্থেকে পেলে?

অনলদার আবাহনে বিভাসের মগ্নচিন্তা থেকে মাটিতে থুড়ি মোজেইক-টাইলস মেঝেতে পা।

—উর্মি স্কুলফেরত।

—এসো, এসো, বসো এখানে। চা হবে নাকি একটু!

বিভাসকে হ্যাঁ-না বলার কোনো সুযোগ না দিয়েই অনলদা আবার

—ওই বাটনটা টেপো। ওই যে ডানদিকের কর্নারে।

বিভাসের মুখ ফেরে ডানদিকে। দেওয়ালে একটা বাকস। তাতে একসার বিদ্যুৎ-বোতাম। ওপরে ইংরেজি প্ল্যাসটিক হরফে লেখা—প্রেস বাটন নং ১৪ ফর টি-কফি-স্ন্যাকস। অন্য বোতামগুলো বুঝি সাধারণের জন্যে নয়। বোতাম টিপে বিভাস অনলদার পাশের সোফায়। ডানলোপিলো-সোফায় ডুবে যেতে-যেতে না-শোওয়া না-বসা এক আড়ষ্ট ভঙ্গি। বসতে-না-বসতেই এক নীলবসনা সামনে, নেহাতই আটপৌরে চেহারায়।

—কী চাই বলুন?

—চা, সেরেফ দু-কাপ চা।

একটু কি বেজার মুখ। শুধু চা-দেওয়ার রেওয়াজ

নেই বুঝি এখানে। আর বিভাস-অনলের পোশাক-আশাকও তো সম্ভ্রম-জাগানো নয় তেমন কিছু। চা তবু এসে যায় ঝটতি। সোফার হাতলে ঠক করে কাপ দুটো নামিয়ে রাখায় অনীহার কিছু প্রকাশ হয়তো। চায়ে ঠোঁট ছুঁইয়ে প্যাকেট থেকে একটা চারমিনার অনলদাকে। একটা নিজে। ধরিয়ে জুতসই টান। এতক্ষণে অনলদার মুখ খোলে :

—কদ্‌দিন থেকেই তোমার ফুলদির নানা উপসর্গ। পেটব্যথা-বমি-তারপর ব্লিডি। রক্তপড়া থামে না কিছুতেই। দস্তুরমতো ঘাবড়ে যাওয়ারই কথা। বাড়ির ডাক্তার, পাড়ার স্পেশালিস্ট, ধর্মতলার মোড়ের আরো বড়ো স্পেশালিস্টের কাছে হুড়োহুড়ি। রোগ তবুও অধরা। রক্ত-পেচ্ছাপ-পায়খানা—পরীক্ষার পর পরীক্ষা। বিরাম নেই কোনো। এদিকে ব্লিডিং থামবারও কোনো লক্ষণ নেই। কী করি কী না করি। কেমন যেন বেদিশাই তখন আমি। এরকম আর দেখি নি তো কখনো। শেষে অঞ্জনের মামা···অঞ্জনকে চেনো তো···দাদার ছোটোমেয়ে পুপের বর···সেই মামারই এই নার্সিং হোমে জানাশোনা। তিনিই নিয়ে এলেন এখানে। রিপোর্ট ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখেশুনে ড. বি. সান্যালের এই রায়। আজই তো পেট কাটা ···দেখা যাক কী হয়···

ছেঁড়া-ছেঁড়া কথাগুলো খাপচা-খাপচা ভাবে বিভাসের কান থেকে মগজে। কেননা, বিভাসের মন আর চোখ তখন ইন্দ্রপুরী জরিপে টানটান। ঢুকেই বাঁ-দিকে টানা ঘরটার কাচঘেরা এক ফালি। মেঝে থেকে কোমরসমান উজ্জ্বল আকাশি রঙের টিক-প্রাই। টিকের ওপর ফুট দুই-আড়াই রোদ-চশমার মতো কালো কাচ। ওই কাচ থাকাতে বাইরে থেকে ভেতরের কাজকম্মো টের পাওয়ার উপায় নেই কোনো। কিন্তু ভেতর থেকে সবদিকে নজর রাখার বন্দোবস্ত। কালো-কাচের ওপর একটু ফাঁক। আবার সিলিং অবধি কাচ। কাচঘেরা টানা ঘরের ফালিটি পায়রার বাসার মতো খোপ-খোপ। খোপে-খোপে কাচবসানো প্লাইয়ের দরজা। দরজায় শাদা নেমপ্লেটের ওপরে নীল অক্ষর। প্রথম খোপ—মেট্রন এ সন্যামত, ডেপুটি মেট্রন এল কুণ্ডু। দ্বিতীয় খোপ ক্যাশ। তৃতীয় অনুসন্ধান।

বিভাস যেখানে বসা, সেখান থেকে মেট্রনদের দেখা পাওয়া ভার। সবটাই কালো-কাচের আড়ালে। ক্যাশের জানলার বাইরে দু-একজন লোক। অনুসন্ধানে দুই তরুণী। ওঠ-বোস করা, সুইং-দরজা ঠেলে ভেতর-বার করাই যেহেতু তাদের কাজ সেহেতু তারা দৃশ্যমান। ঝলমলে সাজপোশাক সব। হিসেব-করা প্রসাধন।

ডানপাশে, যে পাশে বসা বিভাস, পেশেন্ট-পার্টি-দের বসার জায়গা। প্রায় ৬০ বাই ৬০ ফিট চৌকো। তিনদিকে ডানলোপিলো-সোফাসেটি। একদিকে টি ভি সেট। কালার। টি ভি-র পাশে মূল-প্রাসাদটার ফাইবার গ্লাস মডেল। সিলিং-এ সিনেমাহলের মতোই কারুকাজ-করা প্লাস্টার। টি ভি-র পেছনের দেওয়ালে এক বিশাল তেলছবি। ল্যানডস্কেপ। উলটোদিকে চিরায়ত মা-ছেলে। জননীর উন্মুক্ত স্তনবৃন্ত সন্তানের মুখে। মহিলার দেহবল্লরী যে-সুষমায় আঁকা, তাতে জননী থেকে একে রমণীই মনে হয় যেন বেশি। বিভাসের এরকম মনে হওয়াটা সমর্থনও পায়—ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে-থাকা মানুষজনের চোখেমুখে। বিভাসের আশপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসা গুটিকয় পুরুষ। হয়তো তাদের রোগী বা রোগিণীদের জন্যে উৎকণ্ঠায়। চোখ তাদের ঘুরেফিরে ওই ছবিতেই বারবার। ছবিতে পড়তেই চোখ একেবারে উজ্জ্বল সার্চলাইট। অন্যদিকে ঘুরলেই চোখে কেমন এক ঝিমুনি। মা-ছেলের ছবির মাথায় কনভেক্সশনের পোশাকে একটা গ্রুপ-ফটো। ফটোর পাশে বাঁধানো সার্টিফিকেট। তার পাশে নেমপ্লেট। দুটো নাম ড. বি সান্যাল, ড. (মিসেস) বি সান্যাল। দু-এক দিন বাদে জেনেছে বিভাস—একজন বিশ্বম্ভর, অন্যজন বনলতা।

—তুমি দেখা করে আসবে না আগে একবার··· ?

—ও হ্যাঁ··অপারেশন কটায় ?

—একখুনি···গোছগাছ চলছে সব···অ্যানাস-থেসিস্ট এসে পড়লেই···

বিভাস গা তোলে। সিঁড়ি ভাঙে। দোতলা-তিনতলা। চারতলায় যতি। বাঁ দিক ঘুরে টানা বারান্দার এক কোণে রুম নং ৩১১। ফুলদির এখনকার আস্তানা। পরদা ঠেলে বিভাস ঘরের ভেতর। চোখের সামনে নার্স। হাতে প্রেশার-মাপা যন্ত্র। ফুলদির কনুই-এর ওপর চলছে পট্টি বাঁধা। সবুজ অ্যাপ্রনে ঢাকা শরীরে কেবল ফুলদির ফ্যাকাশে মুখখানা জেগে। ঠোঁটে এক চিলতে হাসি।

—আয়···কখন এলি ?

—এই তো···

নার্স তাড়া লাগায়—চটপট সারুন। পেশেন্ট-এর ওটি-তে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে।

—ফুলদি, আমি তবে এখন নীচে যাই···কোনো ভয় নেই···এই অপারেশন আজকাল মুড়ি-মুড়কি !

—হুঁ-উ-উ···সব যেন জেনে বসে আছিস তুই ! ···অ্যাই শোন··আর কে কে এসেছে রে ?

—সবাই—। বড়দা-মেজদা-ভাইদা-সরলবাবু-মণিদি-টুকুদি সব্‌বাই···

—উর্মি ?

উত্তর দিতে গিয়ে গলায় একদলা কফ জড়িয়ে যায় বিভাসের—ও-ই তো খবরটা দিল আমায়। তবে বলা নেই কওয়া নেই···মেয়েটা বাড়িতে একা কি না···

—ওঃ···আয় তবে···

নেমে আসে বিভাস। নীচে অপেক্ষায় সব।

—কী বললে কী তোমার ফুলদি ?

অনলদা হনহনিয়ে বিভাসের দিকে। হাতে পেটেনট ছাতাটি ঠিক ঝোলানো।

—এতক্ষণে ফুলদি বোধ হয় ওটি-তে।

—নিয়ে গেছে। না না, তা কী করে হবে? এখনও অ্যানাসথেসিস্ট ড. রক্ষিত-ই আসেন নি···

—আসেন নি···এসে পড়বেন।

এবার উর্মির বড়দা সোফা ছেড়ে—তুই নিজে দেখেছিস···ফুলকে ওটি-তে নিয়ে যেতে ?

—না, তা দেখি নি···তবে ওটি-তে নিয়ে যাবে বলে নার্স যা একটা তাড়া লাগালে···

—তাই বল···ধ্‌স্···তুমি অত উতলা হয়ো না তো অনল···নেয় নি এখনও···অ্যানাসথেসিস্ট না আসলে ওটি-তে নেয় না কি কখনো ? বিভাসের যত আগ-বাড়ানো কথা !

এই ঝাঁপিয়ে পড়ল সবাই। ওটি-তে ঠিক কখন নেয় তা নিয়ে চুলচেরা কথা। হাতে সময় অঢেল। ইস্যু যখন পাওয়াই গেছে একটা। চলুক না—ক্ষতি-বৃদ্ধি নেইতো কিছু। বেগতিক দেখে বিভাস সটকাবার তালে। তাছাড়া পেটও কখন থেকে চুঁই-চুঁই। সেই সকাল আটটায় একমুঠো। কী করা যায়! ভাবতে-ভাবতেই চোখের ইশারায় অনলদার ভাই বিমল-দাকে নিয়ে বাইরে। লজ্জার মাথা খেয়ে বলেই ফেলে —উফ্‌, যা খিদে পেয়েছে না! ···চলুন না বিমলদা, কিছু একটা মুখে দেওয়া যাক।

—এ কথাটা আগে বলবে তো···আমারও পেয়েছে সেই কখন থেকে···বলতে পারছিলাম না চোখলাজে কাউকেই··পকেট এদিকে ফাঁকা···যাক গে, ভালোই হল। চলো, চলো মোড়ের ওই দোকান-টায়। আমার চেনা দোকান। যা কচুরি ভাজে না! ···গরম গরম দারুণ খেতে···

এখন যদি উর্মি থাকত! কচুরির নাম শুনলেই জরিমানা···তা আবার ফুটের দোকান থেকে! বিভাস-এর স্বামীর চাকরিটাই থাকত না কি? মালকিন যখন নেই·· তখন চালাও। উর্মির অগোচরে পাপ নেই তো কোনো। সত্যিই ভালো খেতে কচুরিটা। অনেক—অনেকদিন বাদে বিভাসের খাওয়ার উল্লাস। সেই স্কুলে হজমিওয়ালার সামনে দাঁড়িয়ে যেমন।

খেতে খেতে আপনমনেই গজগজ করতে থাকেন বিমলদা—বলো বিভাস···আকছার হচ্ছে এসব যে-কোনো হাসপাতালে। তা নয়, নিয়ে এলেন একেবারে

হেভেনলি কিংডমে। এদের যা রাক্ষুসে খাঁই টাকার! থই পাবে? কোথ্থেকে যে কী জোটাবে, জানি না বাবা!

—ওই কার মামা না মেসো···তিনি নিশ্চয়ই একটু কমসম করিয়ে দেবেন···

—আরে থামো তো তুমি···ও একটা এজেনট, বড়ো জোর নিজের কমিশনটা ছেড়ে দিতে পারে। ছুরি ধরলেই ডাক্তার পাঁচ হাজার। ঘরভাড়া রোজ দুশো। কম করে দশ দিন থাকা। দুবেলা আয়া। অ্যানাসথেসিস্ট, কারডিওলজিস্ট, স্যালাইন, ব্লাড, মেডিসিন—জোড়ো কত হল। হাতির খোরাক হল কি না! হাসপাতালের কেবিনে এর পনেরো ভাগের একভাগ খরচও হত না। বলো তো তুমি, আমাদের মতো ঘরে পোষায় এসব। আদিখ্যেতা···যত্ত সব ···ভেতর-ভেতর পোষা-রাগটা বিভাসকে পেয়েই ফেটে পড়ে যেন বিমলের। একটু সামাল দেওয়ার চেষ্টা বিভাসের—কী করবে বলুন···যা ঝড় গেল আপনাদের বাড়ির ওপর দিয়ে তিনবছরে···বারবার যদি ক্যানসার-ই হতে থাকে, মানুষ তো ঘাবড়াবেই একটু···টিউমার যখন।

সদ্য-গত বোন আর বছর তিনেক আগে দাদার হাসপাতাল-ছবি মনে আসতে কিছুটা বিমনাই বিমল। গলার ঝাঁঝ মরে আসে। মনে-মনে কেঁপে ওঠে না কি! আস্তিক হলে প্রার্থনায় কিছু রাগ-জ্বালা-ভয়ের উপশম হত। তবুও বিড়বিড় করে হয়তো—বউদি, ভালো হয়ে বাড়ি চলো···যত তাড়াতাড়ি হয়। চায়ে শেষ চুমুক। বিমলের তখ্খুনি তাড়া—চলো চলো··· ওধারে আবার কী হচ্ছে দেখি···

—হবে আবার কী···ঘণ্টা তিনেক সময় তো লাগবেই।

—আরে ধুর···ওকথা বলছে কে? তোমার জামাই-বাবুটি। ওকে তো চেন না···যা নারভাস···দেখো গে এতক্ষণে হয়তো ছাতা ঝুলিয়ে এ মাথা-ও মাথা পায়-চারি শুরু করে দিয়েছে···পারলে ওটি-তেই ঢুকে পড়ে।

কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অনল-দার কথা কম। কিন্তু বড়ো ব্যস্তসমস্ত। সেকেনডে সেকেনডে তাঁর খবর চাই—টাটকা। নইলে সবাইকে উদ্‌ব্যস্ত করে মারেন। ফিরে আসতে না আসতেই অনলদা—কোথায় গিয়েছিলে তোমরা ··· আমি এদিকে খুঁজতে-খুঁজতে হয়রান···শুনেছ, এখনও শুরুই করে নি · আগে নাকি একটা ছোটো কেস আছে··· তারপর···তা ধরো আরো ঘণ্টাখানেকের ধাক্কা।

যান্ত্রিক অভ্যাসেই হয়তো বিভাসের চোখ ঘড়িতে। অফিসে ফিরতেই হবে। না বলে-কয়ে আসা। কাজের যা চাপ। কিন্তু এমন অসময়ে সে কথা কি বলা যায়। কেননা ফুলদির টিউমার। ইউটেরাসে। এখনও শুরুই হল না অপারেশন।

—আমি একবার ওপরে গিয়ে দেখব না কি? অনলদার জিজ্ঞাসা।

—তুই চুপটি করে ওখানে বসে থাক। নড়বি না একদম—প্রায় খেঁকিয়ে ওঠে বিমল।

বিভাস মাঝে পড়ে—না না আপনাকে যেতে হবে না···আমি দেখছি।

ফের সিঁড়ি ভাঙে বিভাস। ওটি বন্ধ। তবু খবর একটা নেওয়া দরকার। এধার ওধার উঁকিঝুঁকি। ওটি-র সামনের ঘরের কপাট আধ-খোলা। সেখানে বছর পঁচিশের এক তন্বী মুখ। গলায় স্টেথো। কাকে যেন ডাকাডাকি। বিভাসের দিকে চোখ পড়তে—হ্যাঁ ···মানে আমাদের পেশেনট-এর অপারেশন···

—কে? ৩০৮ না ৩১১?

—৩১১।

—টেবিলে তোলা হয়েছে···এই শুরু হল বলে···

—সময় লাগবে কেমন?

—তা ধরুন, কম করে সাড়ে তিন থেকে চার ঘণ্টা···

—আচ্ছা, এ-সময়টা এখানে থাকা যাবে?

—যাবে···তবে ভিড় করবেন না···

দরকারের লোকটি এসে গেছে। কথাবার্তা সেরে ডাক্তারনি ভেতর দিকে পা বাড়ায়। কী মনে করে ফিরে আবার বিভাসের মুখোমুখি—পেশেনট আপনার কে হয়?

'শালী' বলতে গিয়ে জিব সামলে নেয় বিভাস।

—আমার স্ত্রীর দিদি।

—ওঃ!

ফিরে যাওয়ার সময়ে তন্বীর ঠোঁটে কি চিলতে হাসি! না-কি বিভাসের চোখের ভুল। মরুক গে। নেমে আসে নীচে।

টাটকা খবর পেয়ে কিছুটা তরতাজা অনলদা। একটু থিতু যেন। করারও তো নেই কিছু। বিভাসও বসে পড়ে। ভাবে। মানুষের পরিচয়ের কত রকম-ফের। এই যে তার শালী, ঊর্মির দিদি, অনলদার স্ত্রী, সরলাবালা প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের দিদিমণি, বাঁশদ্রোণীর এক কোণে কাঠা আড়াই জমির মালকিন ফুলমালা চৌধুরী—এই হেভেনলি কিংডমে নাম-গোত্র-জাত সব খুইয়ে নেহাতই এক সংখ্যা—৩১১। ওইটে বিনে এ-রাজ্যে ফুলদি অস্তিত্বহীন। যেন ৩১১তেই তাঁর টি'কে থাকা, তাঁর বাঁচা-মরা। ফুলদির জীবনের লাভ-ডুল এখন নিখাদ ওই সংখ্যানির্ভর।

ধু-উ-স্, কী যে সব ছাইপাঁশ ভাবনা তার। ওদিকে আর সবাই তখন তুমুল আড্ডায় মত্ত। অনেক অনেকদিন বাদে গেট-টুগেদার তো। কার ছেলের চাকরি হল, কার মেয়ের বাচ্চা হবে···কোথায় দেওয়া যায়···কার অপত্যর এবারে হায়ার-সেকেনডারি—এমন নানা খারাপ ভালো খবর-চালাচালি। আড্ডা জমে ওঠে চাকরির বাজার, হাসপাতাল-নারসিং হোম-গুলোর দুর্দশা, শিক্ষাব্যবস্থার দফারফা এইসব নিয়ে বিশেষজ্ঞ-মত দেওয়া-নেওয়াতে। সব ফুরোলে পড়ে থাকে সর্বঘটে কাঁঠালিকলা রাজনীতি। তা থেকে ভাসা-ভাসা দু-এক টুকরো কথা বিভাসের কানে—এই পলিটিকস পলিটিকস করেই দেশটা গেল। চা-দোকানে কাগুজে রাজনীতি যত। কিন্তু একটু গতর নাড়াতে বলো, অমনি এলিয়ে পড়ল সব।

—তা নাড়াবে কেন? দিনরাত তো কেবল নিপাত যাক আর দিতে হবে।

—আরে ব্যাটা দেবেটা কে? এ কী ছেলের হাতের মোয়া!

নাঃ, সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে। নিমাইদার চা-দোকান বানিয়ে দিলে একেবারে। বরং একবার ওপরে খোঁজ নেওয়া যাক। হলও তো ঘণ্টা দুয়েক। ওপরে বিমলদা আর পড়শি এক ছোকরা ব্যালকনির ধারে বসে। সামনে একটা বড়ো খোপ। টি ভি-র পরদাটা যদি একটা ঘরের দেওয়ালের মাপে হয়, অনেকটা তেমন। ভেতরে যারা বসে গুলতানি মারছে তারা কেউ রুপোলি পরদার নায়িকা নয় ঠিকই; কিন্তু ভাবসাব অনেকটাই নায়িকা-নায়িকা। এরা নিশ্চয়ই নার্সিং হোমেই কাজ করে। কিন্তু কী সাজ। ফুর্তিতে গায়ে-গায়ে ঢলে পড়া। যেন এখানে কাচের আবডাল নেই বলে সবই বে-আবরু। তবে চামড়ার বরন, পায়ের চপ্পল লুকোবে কোথায়। ঠিক ফুটে বেরোয় কোন্ বাড়ি, কোন্ কলোনি-বস্তি থেকে এদের আসা-যাওয়া।

ওই তো ডাক্তারনি। কিছুই সাজে নি। বা সাজলেও বিভাসের আনাড়ি চোখে তের পাওয়ার উপায় নেই কোনো। কিন্তু চামড়ার ওপর মাপসই এক পরত মাখন-চর্বি, চামড়ার ট্যান আর পায়ে দামি বিদেশী চপ্পল জাত ঠিক চিনিয়ে দেয়।

এদের ভেতর একজনের তো বেশ খারাপভাবেই পায়ের ওপর পা। হাঁটু-প্রদর্শন। মানতেই হয় সুন্দর সুগঠিত পা। শোনা কথা মার্কিন-মুলুকে লেগসের ওপরই নাকি মেয়েদের যত যত্ন। ওদের সৌন্দর্য মুখে নয়, পায়ে। ও দেশে হয়তো এ মেয়ের কদর হলেও হতে পারত। এদেশে ঠ্যাং দেখিয়ে কি চলবে? মুখের যা ছিরি! কিন্তু এ কেমন ধারা—হাতছানি নাকি সেরেফ অবজ্ঞা! শুনেছে বইস আদমিদের কোনো-কোনো বাড়ির ম্যাডামরা নাকি পরিচারকদের সামনেই

জামা-কাপড় ছাড়ে। ওদের দিয়ে ম্যাসাজ করায়। যেন চাকর-বাকরদের সামনে হায়া থাকাটাই অমর্যাদার। এই ইন্দ্রপুরীর এরাও কি নিজেদের খানদানি ঘরের বউ-বেটি ভাবে নাকি।

এ কী! খাবার-বোঝাই ঢাকা-ট্রে নিয়ে দুই নীল-পরী চলল কোথায়। ওটি-তেই ঢুকছে দেখি। ওটি-তে এই সময় খাবার!

—কী ব্যাপার···বিমলদা ওরা···

—দেখতে পাচ্ছ না? ভূরিভোজের আয়োজন···

—তা তো পাচ্ছি···কিন্তু···

—তুমি দেখছি কিস্যুই জান না! এত মেহনতে শরীরের ওপর ধকল পড়ে না! সেজন্যে ডাক্তারবাবু-দের খিদে যা পায় না! খায় একেবারে গো-গ্রাসে। পারেও বাব্বা।

ও, তাহলে তো অপারেশন শেষের মুখে। বিভাসদের বাড়ানো গলা সুতরাং ওটি-র দিকে ফেরে। নিভে যায় লাল-আলোর দপদপানি। ক্যাঁচ শব্দে দরজা খুলতে যে ফাঁকটুকু সেখানে সবুজ অ্যাপ্রন-ঢাকা মুখের উঁকি। ছাঁৎ করে ওঠে বিভাসের ভেতরটা। এ তো ফুলদিরই মুখ! ধাত ফিরে আসে অবিশ্যি তখুনি। নিজের মনেই হেসে ওঠে সে। উঃ, কী টেনশন রে বাবা!

—৩১১-র কেউ আছেন এখানে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—বিভাসদের কোরাস গলা। এলো-পাথাড়ি ছুটোছুটিতে দু-একটি প্লাস্টিক-চেয়ার পড়ে যায়। কিছু শব্দ ওঠে। উঁকি-মারা মুখে বিরক্তির আভাস। ভাবখানা—আদেখলেদের কাণ্ডটা দেখো একবার।

—৩১১-র হাজবেনড কে?

—নীচে আছেন।

—তাঁকে ডেকে দিন।

দুপদুপিয়ে সিঁড়ি বেয়ে সবাই নীচে। হাঁফাতে-হাঁফাতে বিভাস—অনলদা···হয়ে গেছে···শিগগির আসুন···ডাকছে আপনাকে···

বকের মতো লম্বা-লম্বা পায়ে অনলদা তখুনি ওপরে। বিভাস পিছে গুটিগুটি। ভেতরে এবার ডাক্তারের মুখ। অনলদার সঙ্গে কিছুক্ষণ ফিসফিস।

—বিভাস, রুমাকে ডাকো তো···টাকা সব ওর কাছে···বলো হাজার ছয়েক নিয়ে আসতে।

বিভাস শাটলককের মতো ছিটকে নীচে। ড. সান্যাল দরজা আগলে। অপেক্ষায়। অনলদার অস্থির পায়চারি। বিভাস নীচে গেল তো গেলই। রুমাটাও যা গেঁতো। নড়তে-চড়তে ছ-মাস। কটা সিঁড়ির ধাপ পেরোতে দিন কাবার। কিছু যদি একটা হয়ে যায়।

রুমা আসতেই অনলদা টাকাটা তড়বড়িয়ে গুনে ডাক্তারের হাতে। এতক্ষণে হাসি ফোটে মুখে ডাক্তারের। কথা ফোটে।

—ভয় নেই কিছু, বুঝলেন···অপারেশন একদম ও কে; এইসঙ্গে অ্যাপেনডিসটাও দিলাম উড়িয়ে··· বাড়তি ঝামেলা যত! আরে না না···এর জন্যে একস্ট্রা ফি দিতে হবে না কোনো।

কথার সঙ্গে-সঙ্গে টাকার গোছা-ধরা উদাস ডান হাতটা প্যান্টের পকেটে। সকলের অগোচরে।

—হ্যাঁ শুনুন, ৩১১-র সুগার তো দেখছি হাই। ঘা শুকোতে দেরি হতে পারে। নরমালি আমরা সাতদিনে কাটি। ওকে দু-একদিন ওয়াচে রাখব। দিন দশেক লাগতে পারে···কেমন! আপনি ক্যাশে দশ দিনের রুম-চার্জ জমা দিয়ে যান। কমবেশি ফাইনাল বিলে অ্যাডজাস্ট হবে।···আচ্ছা।

ডাক্তারের ডানহাত কপালে ওঠার একান্ত অনিচ্ছে থেকেই যেন ঝট করে নেমে আসে। ওই এক ভঙ্গি। মানে···এবার আসতে হয়।

এতক্ষণে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে বিভাস। নীচে এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে পোস্ট-অপারেশন গজল্লা। এর ভেতর একবার ঢুকে পড়লে আর রেহাই নেই। অফিসে ফেরার দফা রফা। উশখুশ বিভাস গলায় অনেক কুণ্ঠা জড়িয়ে হাত ধরে অনলদার—এবার

আমি আসি···কাল সকালে আসব আবার···অফিসে একবার না গেলেই···

বিভাসের মুখের কথাটা প্রায় লুফে নিলেন ঊর্মির বড়দা—তুই এসপ্লানেডের দিকেই যাবি তো? চল্, তোতে-আমাতে একসঙ্গেই যাই···আমারও একবারটি ঢুঁ না মেরে উপায় নেই কোনো।

পরদিন সকালে জোড়ে ইন্দ্রপুরী। ঊর্মি স্কুল-ফেরত। বিভাস অফিসের আগে। আজ যেন ভিড় একটু বেশি। বিশেষ কাউকে ঘিরে। বিভাসের চোখ পড়ে ভিজিটর্সরুমে সোফা-আসীন প্রায়-ষাট মানুষটির দিকে। শরীর যেন বয়স ছোঁয় নি। বেশ চনমনে এখনও। ওঁকে ঘিরে মহিলারাই যত। এ ওর গা টেপাটেপি, হাসাহাসি। কথা বলার আকুল আগ্রহে ওঁর চারপাশে জড়িয়ে-মড়িয়ে রঙবাহারি শাড়ি-শালোয়ার কামিজ-ফেডেড জিনস।

আচমকাই বিভাসের পেছনে ঊর্মির চিমটি।

—ওঁকে চেন না?

—কে?

—হাঁদারাম একটা। দিব্য সেন—নামকরা পরিচালক। কার দৌলতে আমরা রবি ঠাকুরকে জেনেছি—উনিই তো। ফিল্ম-লাইনে রবি ঠাকুর-স্পেশালিস্ট বলতে তো একজনই—দিব্য সেন।

নামটা চেনা-চেনা। ছবিও হয়তো দেখেছে কাগজে-টাগজে। কিন্তু এসব কি মনে থাকার মতো।

—অ্যাই শোনো না···ফুলদির কাছে একটু পরে যাব···আগে আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলে আসি··· এতটা কাছ থেকে ছেড়ে দেব!

—বলবে কী তুমি ওঁকে···চেন না জান না···

—থামো তো তুমি!

এক ঝটকায় ঊর্মি ততক্ষণে দিব্য-সোফার পাশে। উদ্ভাসিত মুখ। এ-মুহূর্তে হাসির ঝরনা যেন ঊর্মি। কত যে জমা-কথা ছিল তার। ভদ্রলোকেরও হেনস্তার একশেষ। হাসি-বিনিময় করতে-করতেই তো ঠোঁট ঝুলে পড়ার দাখিল। খানিক বাদে ঊর্মি বিভাসের পাশে। টকটকে মুখ।

—চলো, যাওয়া যাক এবার।

সিঁড়ি ভাঙতে-ভাঙতে যেন আকাশের চাঁদ হাতে-পাওয়া ঊর্মির দ্রুত-কণ্ঠ—জান, ওঁর ছেলের বউ এই নার্সিং হোমেই। নাতনি হয়েছে···কী খুশি কী খুশি ···হাসিটা খেয়াল করেছ···কী মিষ্টি তাই না···আঃ, যদি উনি নায়ক হতেন···

যেন হাত কামড়ায় ঊর্মি। নায়ক হলে কোন্ দিব্যদর্শন হত সে কথা জানবার ফুরসত মেলে না। —জান, সাহস করে ওঁকে আমি বলেই ফেললাম, 'আপনার নাতনিকে একবার দেখতে পারি?' উনি হাসলেন ঘাড় হেলিয়ে···উঃ। আমার যে কী হচ্ছে না···ইচ্ছে করছে স্কুলে ফিরে এখুনি লিলি-গীতা-অপালা সববাইকে ডেকে-ডেকে বলি···

ফুলদি এখনও চেতন-অচেতনের মাঝে হাবুডুবু। তাই দেখার পাট ওপর-ওপরই সারা। এ-বেলা অনলদা একাই।

—চলো বিভাস, একটু চা হয়ে যাক।

বোধ হয় বাটন-টেপা চা স্বাদে যেমন কড়া দামেও তেমন চড়া। আর সেজন্যেই বুঝি চা-এর খোঁজে এখন অনলদার বাহির-পানে চোখ মেলা।

—এখন থাক অনলদা···হাজিরা দেওয়ার কথা সকাল-সকাল। এমনিতেই অনেক দেরি···

—ওঃ, অফিস যাবে তুমি? বেশ···ঊর্মি থাকছে তো?

ঊর্মির গলাতেও যেন ইনুনিবিনুনি—উঁ, আমিও একসঙ্গেই বেরিয়ে পড়ি···আজ আবার সকালে রেঁধে আসতে পারি নি···গিয়ে রান্নাবান্না···তবে তিতলির খাওয়া···

—সে কী! তাহলে বেরিয়ে পড়ো···দেরি কোরো না আর। ঝক্কি-ঝামেলা আর তেমন নেই

তো এখন কিছু। তবে ঘণ্টা ছয়েক একা-একা থাকা ···এক-আধজন সঙ্গে থাকলে···বিশেষ তোমার মতো শালী! স্ত্রী-বিহনে শালী-সঙ্গ তো আমার রাইটের মধ্যেই পড়ে···কী বল?

বলতে-বলতে অনলদার দিলখোলসা হাসি। ঊর্মির চোখমুখও নরম লাজুক-লাজুক।

—তাহলে আসছি, অনলদা।

বিদায় দিতে অনলদার হাতে ছাতা নাড়ে।

কালীঘাট পাতালে ঢুকে তবে ঊর্মির স্বস্তি।

—বাব্বা···একঝুড়িমিথ্যে···গলায় এমন আটকে যায় না···বিষম খাওয়ার জোগাড়···

বিভাস হাসে। আসলে তিতলি আজ ওপরে খাবে। বাড়ির মালকিনের ঘরে। প্ল্যানটা ঊর্মির। একসঙ্গে বেরোনো হয় না অনেকদিন। ফুলদিকে দেখতে যাওয়ার সুবাদে হাতে এই সুযোগ। একটু কেনাকাটা, একটা ছিমছাম রেস্তরাঁয় একটু নিরিবিলিতে চাইনিজ ডিশ···অনেকদিনের জমে-থাকা ছোটোখাটো সাধ মেটানো, এই আর কী। বেশ কাটল দিনটা। ফুরফুরে হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতে ঊর্মি টার্মিনাসে। বিভাসকে হাত নাড়ায়।

বিপদ তো এখন প্রায় কেটেই গেছে। তবে আর কেন রোজ-রোজ হাজিরা। ডুব মারে কয়েকদিন বিভাস। ঊর্মির অবিশ্যি স্কুল থেকে ফেরার পথে ইন্দ্রপুরীতে একবার পা-রাখায় অসুবিধে নেই কোনো। এখন তাই ফুলদির লেটেস্ট হেলথ-বুলেটিন ঊর্মি মারফত বিভাসের কানে।

—জান, আজ আচ্ছাসে কড়কে দিয়েছি ওঁদের।

—কাদের?

—অনলদাদের।

—কেন?

—আজ সকালে ফুলদি আমায় বললে কি না—কী লজ্জা বল্ তো···কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা···হুশ করে উড়ে যাচ্ছে···আমার জন্যেই তো···নিজেকে কেমন চোর-চোর লাগে···

—কেন? এটা তো তোমার হক। ওই হেঁসেল সামলায় কে শুনি! এসব কথা তুমি একদম ভাববে না···

—না রে না···হাসপাতাল বা পাড়ার কোনো ছোটোখাটো নার্সিং হোম দিলেও তো এত টাকা···

—সেটা অনলদার ব্যাপার।

কথার মাঝখানে অনলদাও ভেতরে।

– আপনাদের নাকি অনেক খরচা হচ্ছে ফুলদির জন্যে?

—কে বললে এ কথা?

—কেন ফুলদি নিজেই।

—আঃ, কী যে বিলকিছিলকি বকিস না তুই।

ধমক লাগান ঊর্মিকে ফুলদি। অনলদার আঙুল ছাতার বাঁটের ওপর নড়াচড়া করে।

—কী জান···ভরসা করতে পারি না আর··· জানি প্রচুর টাকা গুনোগার···কিন্তু তোমার ফুলদিও তো··

হঠাৎই এমন ভারী হয়ে যায় চারপাশ। অপ্রস্তুতের একশেষ ঊর্মি।

—এ কী অনলদা···আপনি এত সিরিয়াস হয়ে গেলেন···আমি তো নেহাতই ঠাট্টা···

—ঠাট্টা! একটু বলেকয়ে করবে তো! ঠিক আছে, পকেটে টান পড়লে বাকি বিলগুলো বিভাস আর তোমার দাদাদের কাছে পাঠিয়ে দেব।

হাসতে থাকে ফুলদি।

ফুলদির আজ ছুটি। বিভাসের ওপর ভার গাড়ি ঠিক করবার। ট্যাকসির যা লঝঝরে দশা। ঝাঁকুনির চোটে সেলাই না কেটে যায়। তাই ভালো স্প্রিং-দেওয়া গাড়ি চাই। আবার দশটার ভেতর ফুলদির ছুটি না করাতে পারলে নার্সিং হোমে একদিনের বাড়তি টাকা খেসারত। তাই বড়োবাজার থেকে গাড়ি নিয়ে বিভাস তড়িঘড়ি হেভেনলি কিংডমে।

আজ এমন ত্রস্ত কেন সব। নার্সদের ছুটোছুটি।

আয়ারা সব ভিজিটর্স রুমের পেছনে গোল হয়ে জড়ো। এমনকী রিসেপসনিস্ট দুজনও যেন তাদের স্মার্টনেস ভুলে ঠোঁট জুড়ে ফেলেছে।

—কী হয়েছে দেখো তো, ঊর্মি।

ওপর থেকে ঊর্মি খবর আনে। ওই দিব্য সেনের ছেলের বউয়ের রাতের আয়া। কাল থেকে শরীর খারাপ। ব্লিডিং। কিন্তু নার্সিং হোম থেকে ওষুধবিষুধ দেওয়ার এক্তিয়ার নেই কারো। ড. বিশ্বম্ভর আর ড. (মিসেস) বনলতা ততক্ষণে তাঁদের পাঁচতলার কোয়ার্টারে বিশ্রামে। তাঁদের খবর দেবে এমন বুকের পাটা কার। থাকার মধ্যে ওই ডে-নাইট রেসিডেন্ট ধরনের ছুকরি ডাক্তারনি। সে বেচারি আয়াকে পরীক্ষা করে নিজের পয়সায় কিছু ওষুধ কিনে দিয়েছে। কিন্তু কেস বোধ হয় খুব খারাপ। আয়ারা বলছে ওকে কনসেসন বেড়ে ভরতি করে নিতে। টাকা-পয়সা যা লাগবে ওরাই চাঁদা তুলে দেবে। কিন্তু ড. বিশ্বম্ভর-বনলতা ছাড়া এ ডিসিশন কে নেবে? তাই টেনশন।

—ওঁদের ডিসিশন নিতে আটকাচ্ছেটা কে?

—রাখো তো তুমি! বাবু-বিবি এখনও আস্তানা থেকে নড়াচড়ার ফুরসত পান নি—তার আবার ডিসিশন!

—তা বলে এই ইন্দ্রপুরীতে এমন একজন বিনা চিকিৎসায়···

বিভাসের কথা থেমে যায়। ওপর থেকে নামে ভারী পায়ের শব্দ। ডাক্তার-যুগল সব শুনেটুনে ঢোকেন চেম্বারে। এর মধ্যে নার্সিং হোমে অ্যাটাচড ড. রক্ষিত, ড. লাহিড়ি, ড. বোসও এসে পড়েন। একের পর এক সবাই চেম্বারে। সেখানে যা কথা হয় তা বাইরের এই আয়ামহল-নার্স-রিসেপসনিস্ট কিংবা ভিজিটর্সদের আড়ালেই তো। তবু বিভাসের মনে-মনে কথাবার্তার ধাঁচটা বোধ হয় এইরকমই:

ড. রক্ষিত: আফটার অল শি ইজ আওয়ার এমপ্লয়ি। উই শুড ডু সামথিং···

ড. বোস: কী করতে চাও তুমি?

ড. রক্ষিত: কেন? ওকে কনসেসন-রুমে রেখে চিকিৎসা চলতে পারে। আর চার্জটা না হয় ফোরগো করলাম আমরা।

ড. লাহিড়ি: অ্যাবসার্ড টক···আমার ছ-জন পেশেনট এখনও ওয়েটিং লিসটে·· আই শুড হ্যাভ প্রাইমারি রেসপনসিবিলিটি টুওয়ার্ডস দেম।

ড. বোস+ড. রক্ষিত: আরে সে তো আমাদেরও ···গুচ্ছের পেশেনট লাইন দিয়ে···

এতক্ষণে মুখ খোলেন ড. (মিসেস) বনলতা—দেখো রক্ষিত, টেকনিকালি স্পিকিং, শি ইজ নট অ্যাট অল আওয়ার এমপ্লয়ি···ইউ নো, শি ইজ নট ইন আওয়ার পে-রোল। বরং বলতে পার, পেশেনট পার্টির ওর প্রতি কিছু দায়িত্ব বর্তায়।

এসব লক্ষ্যহীন কথাবার্তায় অসহিষ্ণু ড. বিশ্বম্ভর। দুপদাপ পায়ে নেমে আসেন রিসেপসনিস্টদের কাউনটারে। ফোন তোলেন—হ্যালো···বাঙ্গুর ড. ঘোষকে দিন তো···কে ঘোষ? শোনো ভাই, একটা পেশেনট পাঠাচ্ছি···প্লিজ টেক কেয়ার অফ হার···রোগটা কী···সাসপেকটেড ম্যালিগনানট গ্রোথ ইন ইউটেরাস···বায়োপসি স্ক্যানিং? ···থুর, অতসব হবে কোত্থেকে···শি ইজ আ রেডেড ওম্যান···আমাদের এখানে আয়া···বুঝতেই পারছ···একেবারে কেটে সাফ করে দিও···কেমন! ···পাঠাচ্ছি তাহলে···ফোন নামিয়ে বিশ্বম্ভর বনলতাকে ডাকেন—ড্রাইভারকে গাড়িটা রেডি করতে বলো···শি শুড বি ট্রানসফারড টু বাঙ্গুর ইমিডিয়েটলি···

এরই মধ্যে ফুলদিরও ছুটির কাগজপত্র তৈরি। ড. বিশ্বম্ভর অনলদাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশপত্তর দিতে থাকেন। ড্রাইভার গাড়ি তৈরি করে। আয়াকে নামানো হয়। ফুলদিকেও ধরে-ধরে নামায় নার্স আর ঊর্মি। দুজন ওঠে দু-গাড়িতে। বিভাসের চোখ ঘুরে-ফিরে ওপরের ব্যালকনিতে। ব্যালকনিতে ঝুঁকে

নীচের এই যাত্রার নীরব দর্শক ওই তন্বী-ডাক্তারনি। মুখচোখে কি কোনো বিপন্নতা! না কি এবারও বিভাসের দেখার ভুল। গাড়ি ছুটো ছেড়ে দেয় পরপর। অনলদার বিদায় নেওয়া—যথারীতি গাড়ির জানলা গলিয়ে ছাতা নাড়িয়ে।

টিক-টিক করে বিভাসের হাঁটা। ফেরার পথে। হাঁটতে-হাঁটতে কখন যে ঢুকে পড়ে কালীঘাট-পাতালে!

প্রেস কপি

১. প্রেস কপি বলপেনে না লিখে ফাউনটেনপেনে লেখাই ভালো—তাতে কমপোজিটরদের পড়তে সুবিধা হয়।

২. লাইনের দৈর্ঘ্য যেন ১৫ সেনটিমিটারের মধ্যে থাকে।

৩. দুই লাইনের মধ্যে অন্তত এক সেমি ফাঁক থাকা দরকার—'দাবী', 'দেরী' ইত্যাদি বর্জিত বানান কেটে 'দাবি', 'দেরি' ইত্যাদি লেখার জায়গা যাতে থাকে।

৪. পাতার বাঁ দিকে অন্তত তিন সেমি মারজিন থাকা উচিত। যা-কিছু সংযোজন, তা দুই লাইনের মাঝখানে না লিখে, মারজিনে লেখা ভালো।

৫. অনেক লেখায় কমা-দাঁড়ির তফাত বোঝা যায় না—দাঁড়ি কমার মতো মনে হয়। ড-ত ম-স—এসব অক্ষর স্পষ্ট হয় না। তাতে খুবই অসুবিধা হয়—বিশেষ করে বিদেশী ব্যক্তি-নাম-স্থাননামের ক্ষেত্রে। বিদেশী নামগুলি উপরন্তু মারজিনে রোমক লিপিতে বড়ো হাতের হরফে লিখে দেওয়া উচিত।

মহাভারতকথা

অরুণা হালদার

১. ভূমিকা—নিরবধিকাল এবং বিপুলা পৃথ্বীরসতত সঙ্করমাণ রূপের মধ্যে বাস করেও আমাদের মনে কোনো বৈজ্ঞানিক ধারণা দাগ কাটে না। আমরা পরমানন্দে এই দুদিনের বাসাকে মোটেও দুর্দিনের বাসা ধরি না—চিরকালের বাসা বলেই তার মাটিতে পা রাখি এবং নানা বিষয়ে লেখাপড়া করি, আলোচনা করি। এরও দীর্ঘ ইতিহাস আছে। মৌখিক কথকতা, চারণগীতি এবং লিপি আবিষ্কারের পর থেকে লিপিত উপাদান থেকে কোনো অমরতার দাবি পূর্বকাল থেকে আজকাল পর্যন্ত আমাদের মনে আছে। দক্ষিণ আমেরিকার ইনকা সভ্যতার যুগে সূত্রলিপি বা রজ্জু-লিপির দ্বারা রক্ষিত গীতের পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাণমুখ লিপিতে টালিতে খোদাই করা গিলগামেশ কাহিনী মেসোপটেমিয়াতে পাওয়া গেছে। চামড়ার পুঁথি ও কাগজের পুঁথি অনেক পরের কথা সেমেতিক-হেমেতিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে। সমস্ত পৃথিবীর ভাষার মূল বর্গীকরণ করলে পর সবকটিকে প্রাচীন-অর্বাচীন, পরিবর্তিত-অপরিবর্তিতরূপে প্রায় ৭-৮টি পরিবারের মধ্যে ভরে দেয়া চলে। ২-৪টি ভাষার বর্গীকরণ সম্ভব হয় নি—যেমন ককেসীয় এবং জর্জীয় ভাষা (ও লিপি)। তবে সমগ্র ইয়োরোপ-এশীয় মহাদেশে ইন্দো-ইয়োরোপীয় শাখাটিরই একটি সামগ্রিক এবং ঐতিহাসিক রূপ প্রায় অখণ্ডিত অবস্থায় আমরা পাই। সেই ভাষার মূল শরীর নানা পরিবারে জন্মলাভ করেছে। তবুও তাদের ব্যবহৃত অথবা বিস্মৃত শব্দসম্ভার পরিবর্তিতরূপে আজও চেনা যায়। তাদের শব্দজালে অন্যান্য বর্গের শব্দ ধরা পড়েছে—শব্দের অর্থান্তর ঘটেছে। শব্দব্যবহারে রূপতত্ত্ব বা ব্যাকরণও বদল হয়েছে। তবু চেনা যায় তাদের রূপ এবং স্বরূপে এসে মিলিত-মিশ্রিত অন্য বর্গীয় ভাষার মিলন-মিশ্রণ। তার থেকে অনুমান অসঙ্গত নয় যে **মিশ্রভাষাভাষীরা** অবশ্যই **মিশ্রজন**। এই মিশ্রজন খাদ্যের তাগিদে প্রাণ ধারণের তাড়নায় দেশ থেকে দেশান্তরে এসেছে-

গেছে। যা-কিছু চিহ্ন ফেলে গেছে তার মধ্যে প্রধান হল বীরগাথা। ইয়োরোপে এশিয়ায় এই বীরগাথা আর চারণগীত একটা জনমাধ্যম ছিল —এখনও আছে। এদেশেও রামায়ণ, শিবায়ন, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি গানের আসর যথেষ্ট জনপ্রিয়। আর আছে কথকতা—এগুলিকে জনপ্রিয় করার প্রয়াস ঘটেছে—পাণ্ডবানীর কথয়িত্রী তীজন বাঈয়ের সমাদর হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে "চাঁদবণিকের পালা" অথবা "নাথবতী অনাথবৎ" এবং "কথা অমৃত-সমান"। শেষোক্ত দুটি মহাভারত-আধারিত। বস্তুত মহাভারত, রামায়ণ পুরাণ হিসাবে ক্লাসিকরূপ পেয়েছে অনেক পরে। প্রথমে তা গীত হত রাজদরবারে। আমরা দেখি মহাভারতের এক রাজবংশীয় জন্মেজয়; তাঁর সর্পসত্রযজ্ঞে মহর্ষি সৌতি কথক হিসাবে তাঁর পিতৃপিতামহের কথা শোনাচ্ছেন। জন্মেজয়ের পিতা পরীক্ষিৎ। তাঁর পিতা অভিমন্যু। অভিমন্যুর পিতা অর্জুন (শব্দটির অর্থ শুক্ল)। তিনি মহাভারতযুদ্ধের একজন বীর অধ্যক্ষ। অর্জুন বিবাহাদি সূত্রে পাঞ্চাল-বংশজা দ্রৌপদীর, যাদববংশীয়া সুভদ্রার, নাগবংশীয়া (বিধবা) উলুপী এবং পূর্বপ্রান্তীয় মণিপুর দুহিতা চিত্রাঙ্গদার পতি এবং সেসব বংশের সঙ্গে সংযুক্ত। পুরাকালীন অথবা অর্বাচীন রাজবংশীয়দের বিবাহাদি সর্বদাই একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে চালিত হত। অর্জুন কুরুবংশীয়। প্রশ্ন জাগে, এ-বংশ কোথা থেকে এল? এইখানেই **মিশ্রজন** কথাটির তাৎপর্য লক্ষ করার মতো।

তথাকথিত জম্বুদ্বীপ বা ভারতবর্ষে কয়েকটি নুকুল ছিল। ভারতবর্ষও দীর্ঘকাল ধরে ভূস্তরে গড়ে উঠেছে, বাসযোগ্য হয়েছে। মনে করা যাক, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রত্নদ্রবিড় নগরসভ্যতাভিমানী এক নুকুল ছিল। মোহেন-জো-দারো, হরপ্পা সভ্যতার খননের ফলে এদের মধ্যে যে বিশিষ্টতা ছিল, তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। এ সভ্যতা সুদূর তেল এল অমরনা এশিয়া মাইনর পর্যন্ত ছিল। মেসো-পোটেমীয় সভ্যতার কোনো শাখা (অষ্টম ডাইনেস্টি-অ্যাসিরীয়) এখানে উপনিবেশ করে থাকবে—৪৫০০-৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে। ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ঘোড়ায় চড়া যে আর্যশাখার ইন্দোইয়োরোপীয় জাতি এসে এদের শান্ত জীবনধারাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয় তারা বর্বর আর পশুপালক সমাজের লোক ছিল। সুবিধার মধ্যে তাদের ছিল ঘোড়ার ব্যবহার এবং লোহার ব্যবহার। আর ছিল সংগঠনক্ষমতা এবং চমকপ্রদ কল্পনাশক্তি। মোহেন-জো-দারো-হরপ্পায় শিলীভূত প্রায় সর্বপ্রকার নৃ-করোটি পাওয়া গেছে—যথা দ্রবিড়োমুণ্ড লঙহেড, অলপাই শর্টহেড, নিগ্রইড, আল্পো-দিনারিক (এরাই বেশি)। অপর পক্ষে তথাকথিত আর্যরা লঙহেড, তীক্ষ্ণনাসা, গৌরদেহ। তাদের সেনাপতিরা ইন্দ্র (মহেন্দ্র-উপেন্দ্র)। হরপ্পা সভ্যতার শতটি সুরক্ষিত গড় বা পুর ধ্বংস করলে ইন্দ্রের নাম হয়েছিল পুরন্দর। হরপ্পা সভ্যতায় তামা ও ব্রোঞ্জ ছিল—লোহার কাছে তারা পরাভূত হল। তাদের মাতৃদেবতা ছিল। আর্যদের তা ছিল না। যাই হোক, আর্যরা স্ত্রীদেবতাও গ্রহণ করল। প্রত্ন-দ্রবিড়রা দক্ষিণভারতে বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে দীর্ঘকাল উপনিবিষ্ট হয়ে থাকল। অগস্ত্যের মতো কিছু উত্তরাঞ্চলীয় ব্রাহ্মণ সেখানে গিয়ে থাকবেন এবং পরবর্তী কালে রামায়ণের সংঘর্ষ আর্য-আর্যেতর সভ্যতার প্রবল সংঘর্ষ সূচিত করে। বস্তুত, দক্ষিণ ভারতে যাঁরা রামকে মানেন তাঁরা অনেকেই আদিতে উত্তরাঞ্চলীয়। সাধারণভাবে দক্ষিণীদের কাছে, বিশেষ অব্রাহ্মণের কাছে রাবণ মহত্তর কল্পনা। আর্যরা বর্বরতার প্রবলতায় আর্যেতর সভ্য এই জাতিকে দাস, দস্যু প্রভৃতি আখ্যা দিল। তবে বৈরিতা চাপা রইল।

ভারতীয়জন—এই আর্যরা কারা? কোথা থেকে এল? তত্ত্বতরে বলা যায় কাপেথিয়ন পর্বতমালা থেকে কাশপিয়ন সমুদ্র পর্যন্ত এক বিরাট ভূভাগ থেকে বিভিন্ন সময় মূল ইন্দো-ইয়োরোপীয় হিট্টিবর্গের

শাখারা প্রাণধারণের প্রয়োজনে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, এবং সেই পথে বিভিন্ন নুকুল-গোষ্ঠীর সম্পর্কে আসে। হিট্টি বা হিট্টাইটদের কথা ঈজিপ্টের ইতি-হাসে আছে—তাদের মধ্যে চলত ব্যবসায় ও রাজ-পরিবারে চলত বিবাহ। ঘোড়া ও ঘোড়ার ট্রেনিঙ এবং লোহার তরবারি ছিল ব্যবসার প্রধান উপাদান। ঘোড়ার ট্রেনিঙ সংক্রান্ত এদের ও ইরান-প্রান্তীয় মিটন্নীদের পুঁথি পাওয়া যায়। মিটন্নীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সাহিত্যে (?) শিমালা শিমালিয়া (তুষাররানী), দুঃরথ, তুশরথ (* দশরথ) নামগুলি মেলে। (শিমা→জিমা→হিম)। একদল ইরানে (তৎকালীন মগডিয়ানা এবং ইলম) উপনিবিষ্ট হয়। কোনো দল হিট্টাইটরা বর্তমান তুরস্কে বাস করে ও পরে অন্যদের সাথে মিশে স্বরূপে ও ভাষায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। একটা শাখা অইনু যায় জাপানে—তারা আদিতে সূর্যোপাসক ছিল। ভাষাগত বিভাগে 'স' ধ্বনি পরিবর্তিত হয় 'হ'-'ক'-'গ' প্রভৃতি ধ্বনিতে। এই ভাষাভাষীদের কেন্তুম বলা যাবে। এদের মূল শাখা-গুলি ঈটালো-কেলটিক, গের্মানিক-টিউটন ও ডরিক-গ্রীক। আধুনিক ইয়োরোপের সকল ভাষাকে ওতঃপ্রোত ভাষাভাষীকে আমরা এই তিন বৃহৎ শাখার মধ্যে ফেলতে পারি—তারাও মিশ্রজন মিশ্রভাষী। ভারতীয় মিশ্র আর্যদের ভাষা- এবং বংশগতি-সম্পর্কে তারা দূর জ্ঞাতি।

এদের বড়ো একটা শাখা ইরানে উপনিবিষ্ট হল। সেখানে দীর্ঘকাল থাকার পর তাদের মধ্যে মনে হয় প্রাণধারণের প্রয়োজনে আত্মকলহ দেখা দিল। তাদের দেবতা ও দেবতার নামও বদল হল। মূল ইন্দো-ইয়োরোপীয় নুকুল (বা সব নুকুলই) কোনো-না-কোনো ভাবে আলো সূর্য অগ্নি এগুলির উপাসনা করত। করত প্রাণেরই প্রয়োজনে (পরবর্তী কালের পূজনপদ্ধতি excess-জাত)। তাঁরা পশুপাল নিয়ে ঘাসজলের প্রয়োজনে সময় ঠিক করে ঘুরে বেড়াত। পশুই তাদের আহার্য জোগাত মাংস, দুগ্ধ ও পনীর। পশুর চর্মে হত পরিধেয় বা দ্রাপী। মেয়েরা শস্য-দানা সংগ্রহ করত (হয়তো নিয়মিত ভাবে রোপণ করত)। বীধীযব বা বার্লি। তা থেকে তৈয়ারি হত পুরোডাশ (বা পরোটাজাতীয় কিছু)। পুরোডাশ, অগ্নিপক্ক গোমাংস বা অশ্বমাংস তারা একত্র বসে খেত। প্রকৃতির নানা রূপ যেমন ঝড়, ঝঞ্ঝা, ন্যাচারাল গ্যাস, সূর্য, চন্দ্র, তারা প্রভৃতির উদ্দেশে সঙ্গীত বেঁধে একত্র গান করত। প্রচুর ভাং বা সোমরস পান করত এবং পাশা খেলত। অশ্ব ও রথের চালনার প্রতি-যোগিতা করত। স্ত্রীলোকের কোনো বিশেষ সম্মান তাদের কাছে ছিল না—এমন অনুমান হয়।

ইরানে উপনিবিষ্ট জন অগ্নি-উপাসক ছিল। প্রথমে 'দএব দেব' (ইয়োরোপে ডিভাইন—দিবা)। এসবের অর্থ ছিল উজ্জ্বল শক্তিমান কিছু। এখন এদের কাছে 'দএব' মানে দাঁড়াল অশুভ শক্তি। যারা বার হয়ে এল তারা দেব কথাটা গ্রহণ করল। ইরানীয়রা তার স্থলে অসুঃ (অসুর) শব্দটি মহাপ্রাণ অর্থে গ্রহণ করল। দেব-অসুসারীরা অসুর কথাটা অপার্থক হিসাবে অশুভ শক্তি হিসাবে নিল। দেবাসুরের এই লড়াইটা জাতি-জাতিতে সংঘর্ষের দ্যোতক—এর জের মহাভারত অবধি রয়ে গেল। এবার দেবাসুরসারীরা হিন্দুকুশ পেরিয়ে এবং পামীরের পথে গেদ্রোশিয়া (খানিকটা বালুচিস্তান) ও কাশ্মীর বাহ্লীক (বলখ) হয়ে ভারতে প্রবেশ করল—এরা আর্যনামটি নিয়ে-ছিল—(হয়তো কৃষি ও arable কথাটা একার্থক)। ভারতে আসার পথে তাদের নানা দল নানা স্থানে বসবাস করল। তবুও তারা সম্ভ্রান্ত আর্যবংশজ এবং একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে থাকল। এইভাবে কুরু (Cyrus—পারস্যরাজ), উত্তরকুরু, ক্রৌঞ্চদ্বীপ (হিমালয়), ব্রহ্মাবর্ত, কুরুক্ষেত্র, ইন্দ্রপ্রস্থ, খাণ্ডবপ্রস্থ, হস্তিনাপুর (জম্বুদ্বীপ প্লক্ষদ্বীপ শাল্মলী দ্বীপ), মদ্র প্রভৃতি স্থানের নাম দেখা দিল। মদ্র দেশটি উত্তর-পশ্চিম পনজাব বলে গৃহীত হলেও এ নুবর্গ সম্ভবত পারস্যের আদি মদ বা মিডীয়দের সঙ্গে সম্পর্কিত

ছিল। রামায়ণের কেকয় দেশ ককেশস হওয়া সম্ভব। (এদের সঙ্গে যোগাযোগ মোগলবংশ পর্যন্ত বিদ্যমান —বঙ্কিমচন্দ্রের গুণি খাঁ সম্ভবত জর্জীয়)।

বস্তুত মহাভারতে (এবং তৎপূর্বে বেদে) ভারতে উপনিবিষ্ট আর্যদের নানা বর্গের নানা শাখার নাম রয়েছে। এগুলি খুব চিত্তাকর্ষক। ইন্দো-ইয়োরোপীয় নানাশাখার নৃকুল যেমন ভৃগু, তৃৎসু, অসুর, দানব, গন্ধর্ব যদু তুর্বসু, দ্রুহ্য অসু পুরু ত্বষ্ট্র (তাভেষ্টী শাখার হদিশ পাওয়া গেছে বুলগারিয়া-চেকোশ্লোভাকিয়ার সীমান্তে উৎখনিত সামগ্রীতে) নাম মহাভারতে আছে। ভৃগু শব্দটি শব্দান্তরে ফ্রিজিয়া। গ্রীক পেরিক্লিস শব্দটি পুরুশ্রবা হলে আশ্চর্য হবার কিছু নাই। মহাভারতযুদ্ধ সংঘটিত হয় ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। এই সময়টাতে সলোমন ডেভিডেরও রাজত্বকাল মনে রাখা দরকার। ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে দলে-দলে সমাগত আর্যকুল ধীরে-ধীরে ৭০০ বৎসর ধরে সংহারপর্ব ও সর্বগ্রাসপর্ব শেষ করে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে স্থায়ী হয়েছে। বর্ণাশ্রমব্যবস্থা খানিকটা গড়ে উঠেছে। তখন মুশকিল এল আর-একটা দিক থেকে।

মিশ্রচরিত্র : এদিকে ব্রহ্মাবর্ত কুরুক্ষেত্র ছাড়িয়ে সেই একই খাদ্য তথা প্রাণের প্রয়োজনে আর্য নৃবর্গকে সৈন্য বা অনুচরসহ দৌড়তে হচ্ছে দক্ষিণে পূর্বে পূর্ব-দক্ষিণে তথা মধ্যদেশে। প্রত্যেক স্থানে নূতন লোক, নূতন সংস্কৃতি, নূতন আহার্য। বরঞ্চ পূর্বদেশ অধিক সমৃদ্ধ। সমগ্র পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণে এক বিরাট নৃকুল বর্তমান—তারা অস্ট্রালয়েড বা অষ্ট্রিক। এরা শান্ত, একটু অলস, আরামপ্রিয়, গ্রামীণ সভ্যতার লোক। ভারত তাদের কাছে পেয়েছে গ্রামীণ সভ্যতা, জুমচাষ, কার্পাস, হরিদ্রা, মরিচ, আদা, কলা, ধান, পান প্রভৃতির চাষ ও ব্যবহার। মধ্য ও পূর্ব দক্ষিণদেশে হাতি ছিল—এখনও আছে। আর্য যারা এদিকে এল এদের সাথে মিলে-মিশে আহার্যে ভাষায় বেশে একাকার হয়ে গেল। এদের থেকে পাওয়া গেল জন্মান্তর-দর্শন। মোহেন-জো-দারো দিয়েছিল স্ত্রী-দেবতা, পশুপতি, লিঙ্গ- ও যোনি-পূজা এবং যোগীমূর্তি। লক্ষণীয় বিষয় একটা পাওয়া যায় যে মহাভারতে অষ্ট্রিক সংস্কৃতির উল্লেখ তেমন স্পষ্ট নয়। রাক্ষস ইত্যাদির কথা আছে যেমন বকরাক্ষস, হিড়িম্বা-ঘটোৎকচ। সুনীতিকুমারের মতে, বৈদিক যুগেও প্রত্ন-আমহেরিক-ভাষী আবিসিনিয়া-রাজের সঙ্গে ভারতীয় আর্যদের যোগাযোগ ছিল। আবার পূর্ব-বিদেহরাজ জনকও যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই পূর্বদেশীয়গণ বর্ণাশ্রম মানলেও ক্ষত্রিয় রাজার ব্রহ্মবিদ্যানুশীলন সমর্থন করতেন—স্বয়ং বিশ্বামিত্র ও জনক এ বিষয়ে প্রমাণ। ভারতীয় আর্য যেমন-যেমন ভারতের চারদিকে এগিয়ে গেছে, কিছুটা তারা নিজস্ব ধারা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে এবং গ্রহণ করেছে জনবৃদ্ধির প্রয়োজনে নানা জাতের স্ত্রীলোক। সৃষ্টি হয়েছে বর্ণসংকরের এবং এগুলিকে সিদ্ধান্তানুযায়ী ব্যাখ্যা দিতে হয়েছে। কানীন পুত্র, ক্ষেত্রজ পুত্র, নিয়োগ-প্রথা, স্ত্রীর ঋতুরক্ষাকালে যদৃচ্ছ পুরুষের কাছে উপগমন ও প্রার্থনা—এগুলি দোষাবহ তো নয়ই, বরঞ্চ সমাজানুমোদিত। বরঞ্চ কুন্তীর কানীনপুত্র হিসাবে কর্ণের দুরবস্থা। আমাদের মনে লাগে। সে যুগে পলিগেমি ও পলিয়েনড্রি দুই ব্যবস্থাই সমাজানুমোদিত ছিল এও মনে হয়। তবে পুরুষের ক্ষেত্রে তা যত সহজ, স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে তা তত সহজ ছিল না বলে মনে করা চলতে পারে।

তাহলে, প্রত্নদ্রবিড়, নবাগত ইন্দো-আর্যকুল এবং অষ্ট্রিক নৃকুলের পরিচয় কিছু পাওয়া গেল। আর ছিল সমগ্র হিমালয়দৈর্ঘ্যব্যাপী ট্রাইবল সিনোটিবেটন (তুর্ক-মঙ্গোলমাঞ্চুসহ য়ুরাল অলতাই শাখার সুদূর শাখাগুলি) লোকদের বাস। হিমালয় অঞ্চলটাকে ক্রৌঞ্চদ্বীপ বলা হত। হিমালয়ের কোনো-কোনো অংশের পূজ্যদেবতা দুর্যোধন এবং কোথাও দ্রৌপদী। কোনো অঞ্চলের নাম স্বর্গারোহণী। বৈদিক শতপথ-ব্রাহ্মণের কথা মনে করিয়ে দেয় শতপন্থ। কুলু-মানালিতে হিড়িম্বার গুহা আছে। এমনই আছে নেফা অঞ্চলেও। সেদিকে দুর্গম পরশুরামতীর্থ ও বশিষ্ঠাশ্রমও আছে। এ পথ দিয়ে এবং শৈলেন্দ্র রাজাদের সময় জলপথে ইন্দোনেশিয়াতে মহাভারত-রামায়ণকথা এগিয়ে গেছে। সেখানে এখনও হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টাননির্বিশেষে এসকল পালাগান নৃত্য-সহ অভিনয় করে। রবীন্দ্রনাথও এজাতীয় কিছু শান্তিনিকেতনে প্রবর্তন করেন। আসমুদ্র ভারত ও সিংহলেও মহাভারতকথা গীত হয় এবং আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য স্বীকারও করে নিয়ে থাকে।

হিমালয় অঞ্চলে স্ত্রীলোক কম। সেই কারণে একটি স্ত্রীলোকের বিবাহ ঘটে সমগ্র একটি পরিবারের পর্যায়বাহী পুরুষদের সঙ্গে। এটি নিন্দনীয় প্রথা নয় —প্রয়োজনীয় প্রথা ও পদ্ধতি। প্রশ্ন জাগে দ্রৌপদী ও পাণ্ডুপুত্র পঞ্চজনার এভাবে বিবাহ হয় কেমন করে? আমাদের মনে রাখতে হয় ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়েই বিচিত্রবীর্যের দুই ক্ষেত্র বা পত্নী অম্বিকা, অম্বালিকার পুত্র। ব্যাসদেবের ঔরসে তাদের জন্ম। জেনেটিক্স দেখতে গেলে তাদের দেহে ব্যাসদেব কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এবং তার মাতা সত্যবতী মৎস্যগন্ধার রক্ত আছে। অথচ তারা কুরুকুলের সন্তান এবং পরস্পর প্রতিস্পর্ধী। এদের মধ্যে পাণ্ডু নামটিও তাৎপর্য-পূর্ণ—তিনি নির্বীর্য ও সন্তানোৎপাদনে অক্ষম। তাঁর এক পত্নী পৃথা বা কুন্তী। তিনি সহজভাবে দেখলে সৎপুরুষসঙ্গাভিলাষিণী। এ ভাবেই তিনি কানীন-তনয় কর্ণের মাতা হন—পিতা সূর্য না হন—সূর্যসদৃশ তেজস্বী হলে আপত্তি নেই। কর্ণের জন্ম তথা দ্রৌপদীর জন্মও রহস্যাবৃত। কুন্তীর আরও তিনটি পুত্র এবং সপত্নী মাদ্রীর দুটি পুত্র কেউই পাণ্ডুপুত্র নয়। পাণ্ডু চিরজীবন পত্নীদের নিয়ে হিমালয় অঞ্চলে ঘুরাফেরা করেছেন। হয়তো সেভাবেই কুন্তীর এই এক নারীর বহুপতিকতার কথা জানা ছিল। তাঁর সপত্নী মাদ্রী মদ্রদেশজা। শল্যরাজ তাঁর ভ্রাতা হলেও যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষাবলম্বন করেন। মদ্রদেশ বর্তমানে

উত্তর-পশ্চিম সীমার পনজাব ও তন্নিকটস্থ কিছু দেশ বলা যেতে পারে। পারসিক (পার্থব, পার্শ্বব)-দের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিল। ভারতে উপনিবিষ্ট এই পর্বতসানুদেশের মানুষেরাও ক্ষত্রিয় বলে গৃহীত হয়। ষষ্ঠ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সমাগত গৌতম বুদ্ধও এই সমাজের লোক—তাঁদের মধ্যে কৌলিক বিবাহপ্রথা ছিল অর্থাৎ কাজিনদের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত ছিল। আর্যরা নিজেদের স্থায়িত্বের জন্য যে কড়াকড়ি ব্যবস্থায় বর্ণাশ্রম সৃষ্টি করেছিল, তার স্পর্শও এখানে ছিল না।

এই চতুষ্প্রকারের নৃকুল ব্যতীত ভারতে ছিল নিগ্রইড গোষ্ঠীর লোক। দক্ষিণ ভারতে তারা (যেমন বেদ্দা) ধীরে-ধীরে অপরাপর নৃকুলসহ মিশ্রিত হয়ে যায়। এদের ভাষার অবদানও (বাতুর কথাটা ছাড়া) ভারতীয় ভাষায় নেই। স্থায়ী উপনিবিষ্ট আর্য সমাজ প্রবলপ্রতাপে অপরাপর নৃকুলকে গ্রাস করে রাখল—'দাস' বানাল। তাদের অর্থ বল স্ত্রী অন্যায়ভাবে গ্রহণ করে বলশালী হল। দাস-দস্যু-নিষাদ-শবর-আটবিক-কিন্নর-দানব-গন্ধর্ব-যক্ষ প্রভৃতি নামের মানুষদের তারা তুচ্ছ করত। অথচ তাদের একেবারে উপেক্ষা করা বা এড়িয়ে চলা সম্ভব হত না। তখন আর-একটা ব্যাপার ঘটতে লাগল। আর্যেতর জনের সঙ্গে অনিবার্য মিশ্রণ ও প্রয়োজনেই তাদের সহায়তা তথা সংস্কৃতি গ্রহণ করলেও গোঁড়া আর্যবাদীরা প্রান্তীয় আর্যবাসীদের ব্রাত্য বা স্খলিত বলত। এরা কিছু প্রায়শ্চিত্তবিধি পালন করে ব্রাত্যস্তোম করে আর্য স্টেটাস পেতেও বা পারত। তখনো ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের রেষারেষি ছিল —তবুও বাহুবলী ক্ষত্রিয়কে স্বীকৃতি দিতেই হত। কন্যাও বীর্যশুল্কা হয়ে যদৃচ্ছ পতিগ্রহণ করতে পারত। যেমন কৃষ্ণা দ্রৌপদী পার্থকে ব্রাহ্মণ জেনেই মাল্যদান করতে যান।

মনে হয়, যদুবংশ যদু নামটির সঙ্গে যুক্ত। যদু কুরু নৃপতি ক্ষত্রিয় ছিলেন। যদু তাঁর ব্রাহ্মণকন্যা পত্নী দেবযানীর গর্ভজাত। যদু বৃষ্ণি ভোজ সাত্বত

অন্ধক কুকুর প্রভৃতি সাতটি শাখাকে গোপালক ক্ষত্রিয় সমাজ বলা যেতে পারে. এ বংশের যাদব ক্ষত্রিয় বসুদেব কংসাসুরের ভগ্নী দেবকীকে বিবাহ করেন। কংস অসুর সমাজের লোক—তাঁর শ্বশুর জরাসন্ধ গিরিব্রজপুরের (বা আধুনিক রাজগৃহ) প্রতাপশালী রাজা। তিনি ক্ষত্রিয়বিরোধী এবং ক্ষত্রিয় রাজাদের বলি দেবেন বলে বন্দী করেন। কৃষ্ণ বাসুদেব কারাগারে ভূমিষ্ঠ হন। দৈবতনয় হিসাবে রক্ষা পান—নন্দগোপগৃহে বৃন্দাবনে লালিতপালিত হন। যাদব বাসুদেবের ব্রজলীলা আধুনিক যুগের বৈষ্ণবদর্শন সত্ত্বেও ঈভটিজিং-এর পর্যায়ে পড়ে। অসুর সমাজে মাতৃতন্ত্র সম্ভবত ছিল। সেকারণে কংস ভাগিনেয় এবং ভগিনীসন্তানদের বধ করে ফেলতেন। শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা পান। পরে মথুরায় আসেন, কংসকে বধ করেন। এতে করে তিনি জরাসন্ধকন্যা অস্তি ও প্রাপ্তির বিরাগভাজন হন। মথুরায় জরাসন্ধের জন্যই যাদবদের প্রতিপত্তি হারাতে হয়। তাঁরা দ্বারকা-প্রভাস-রৈবতক অঞ্চলে পুনর্বাসিত হন। বসুদেব-ভগ্নী কুন্তী পাণ্ডবজননী। উগ্রসেন-কন্যা সুভদ্রাসহ অর্জুনের পরিণয় হয়। হলধর বলদেব নিজে কুরুপতি দুর্যোধনের পক্ষপাতী ছিলেন। যাদবগণ নানারূপ দুর্নীতিপরায়ণ ছিল। লোভ, কদাচার, অত্যাহার, কামুকতা ও মাৎসর্য তাদের নীতিজ্ঞানকে কলুষিত করেছিল। এদের কেউ-কেউ কৌরব পক্ষে, কেউ-বা পাণ্ডব পক্ষে যোগ দেয়। বলদেবের বর্ণনা আছে তিনি গৌরবর্ণ। অথচ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কৃষ্ণবর্ণ। পাণ্ডব-পত্নী কৃষ্ণাও কৃষ্ণবর্ণা। এইখানে একটা বড়ো কথা এসে যাচ্ছে গৌরবর্ণ কৃষ্ণবর্ণ এবং আর্য ও আর্যেতর মিশ্রকুলের কথা। সমগ্র মহাভারতে এই প্রশ্নটা একটা খুব বড়ো প্রশ্ন বলে মনে হয়।

সচল চরিত্র : এই আর্যেতর জাতিকুলের মধ্যে মনে হয় স্বাভাবিকভাবে একটা সবল ও সচল প্রবণতা দেখা গেছিল। অনেকেই তারা অত্যাচারিত এবং ক্লিষ্ট (একলব্য কিংবা রামায়ণের শূদ্রক)। এদের মধ্যে যারা মিশ্রজন তাদের মধ্যে অনেকেই বিশিষ্ট গুণ-সম্পন্ন। যেমন কৃষ্ণ বাসুদেব অথবা ব্যাসদেব কিংবা ধর্মাত্মা বিদুর। বিশ্ব-ইতিহাসে তখনও এরূপ মিশ্রণ আর জাগরণ তো অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। আবশ্যিক না হলেও অবশ্যম্ভাবী ভাবে এই মিশ্রজন একটা কিছু করতে চেয়েছে। মহাভারত নাম যিনিই দিয়ে থাকুন, তিনিও একক না হওয়াই সম্ভব। মিশ্র-জনদের মধ্যে বিশিষ্ট এবং পদস্থদের সঙ্গেও কট্টর আর্যদের সদ্ভাব ছিল না। কুরু-পাঞ্চালের ঈর্ষাদ্বন্দ্ব প্রকটিত ছিল। দ্রোণ পাঞ্চালদের দ্বারা দারিদ্র্যবশত নিগৃহীত হয়ে কুরুপক্ষে আসেন। ব্রাহ্মণরা শুধু পুরোহিতই ছিলেন না—অস্ত্রগুরুও হতেন। অপর পক্ষে বিবেকনিষ্ঠা তাঁদের অনেকেরই ছিল না। কৃষ্ণ-বাসুদেব অথবা বলভদ্রকে খুব সদাচারী মনে হয় না যতই না কেন কৃষ্ণবাসুদেবের উপর ভাগবতী সত্তা আরোপিত করা হোক। কৃষ্ণবাসুদেবের অনুচরদের মধ্যে 'নাগ'কুলের সঙ্গে ঋক্ষ (জাম্ববান) কুলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এই নাগ-ঋক্ষকুল অবশ্যই টোটেমিক কুল। কৃষ্ণবাসুদেব নামে সত্য কেউ ছিলেন কিনা বলা শক্ত! কিন্তু মহাভারতের সচল চরিত্রের নির্মাণশিল্পী হিসাবে এই দুই কৃষ্ণ ব্যক্তির অর্থাৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও কৃষ্ণবাসুদেবের কথা স্মরণীয়। অন্যত্র এই কৃষ্ণবাসুদেব কাহিনীসহ পূর্বতন বৈদিক দেবতা বিষ্ণুকে বা নারায়ণ বিষ্ণুকে একত্র করে দেওয়া হয়েছে। বিষ্ণু সম্ভবত নাগরিক দেবতা। আরও একটা কথা স্মরণে রাখা দরকার। বিষ্ণু থেকে বিণহু (বা নীলকান্ত দেবতা) হয়েছে না বিণহু থেকে বিষ্ণু? বিণহু কিন্তু প্রত্নদ্রবিড় দেবতা এবং এখনও দ্রবিড় সমাজে পূজ্য ও গ্রাহ্য।

মহাভারতে জন্মজন্মান্তর পুনর্জন্ম কল্পনা খুব বেশি। এর জন্যও বেশি অপ্রাকৃত জগতে না গিয়েও আমরা বলতে পারি এই জননান্তরকল্পনা, স্ত্রী-সম্বন্ধীয় পার্মিসিভ সমাজ—এগুলি (সত্যবতী, শকুন্তলা ও অনেকে) আর্যেতর অষ্ট্রিক, শবর, গদব, নিষাদ,

আঙ্কেটিক, আটবিক প্রভৃতিদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এরূপ একটা সবল সতেজ চলমান সামাজিক অবস্থার নানারূপ ভাঙাগড়া-পরিবর্তনের চিত্র মহাভারতের আদিরূপ কিনা ঠিক আমরা জানি না। বরং এমনই মনে হওয়া সম্ভব যে এই সমাজে পুরাতন ছাঁচ রয়ে গেছে—প্রাচীনতর আর্যকুল একটু গোঁড়া ভাবে থাকতে চেয়েছেন। ছোটো-ছোটো নানা রাজ্য সমগ্র উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম ভারতে ব্যাপ্ত হয়েছে। সেসব রাজ্য চালনা যাঁরা করেছেন তাঁরা আর্য-আর্যেতর মিশ্রজন, আদিম অধিবাসী এবং আরো অনেকেই। ভুলে গেলে চলে না যে মোহেন-জো-দারো, হরপ্পায় এনজিনিয়ারিং বিদ্যা উন্নত মানের ছিল। ময়দানব যেখানকার লোক হন তাঁকে দিয়ে যুধিষ্ঠিরের সভা ও রাজ্য পত্তন করা হয়েছিল। রাজ্যহারা পলাতক, আশ্রয়কামী বহুজনা একটু পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টায় সাম-দান-ভেদ ও দণ্ডের সহায়তা গ্রহণ করেছেন। তাঁদের অনেকেই কৃষ্ণের পক্ষচ্ছায়াতে আশ্রিত। সাথে-সাথে দ্রৌপদীর পঞ্চপতিত্ব আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় পার্বত্য অঞ্চলেও মহাভারতের মানুষের গমনাগমন ছিল। স্বয়ং শিবদেবতা নিজে একটি আর্য, শিশ্নদেব প্রত্নদ্রবিড়, অষ্ট্রিক, ভূতকল্প এবং আদিদেব লিঙ্গমূর্তি তথা যোগেশ্বর পশুপতি হিসাবে আর্য প্রজাপতি দক্ষের জামাতা হয়েও প্রতিযোগী এবং তাঁর পত্নী পার্বতী উমা চম্পকগৌরী এবং হিমালয়-কন্যাও। অর্জুন কিরাত-মহাদেবের কাছে অস্ত্রলাভ করেন।

২. **ইতিহাস-পুরাণ :** সাধারণত পুরাণের মধ্যে কিছু কাহিনী থাকে, কিছু ইতিহাসও মেলে। কাহিনী সাধারণত হয় রাজকাহিনী বা রাজন্যদের উত্থান-পতনের কাহিনী। পুরাণও ইতিহাসের মতো নিউ ক্লয়াস নিয়ে শুরু হয়ে বেড়ে-বেড়ে চলে। পুরাণে ইতিহাসের উপাদান তাই কিছু মিলতেও বা পারে। কিন্তু সোজাসুজি পুরাণ ইতিহাস নয়। ভারতবর্ষ যে কারণে হোক ইতিহাসবিস্মৃত দেশ। ভারতীয় মস্তিষ্ক কোনো অজ্ঞাত কারণে ইতিহাসবিমুখ। একারণে প্রকৃত ভারতেতিহাস ৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ বা আলেক-জানডারের আক্রমণের আগে তৈরি হয় নি। একথা আমাদের মেনে নিয়ে অগ্রসর হতে হয়। সুতরাং পুরাণ বলে যা চলে তাতে আমরা যে-কালে তা লেখা তত্তৎ কালের কিছু ব্যবস্থা-অবস্থা ও সমাজজীবন পেতে পারি। তা হল বাস্তবের কিছু রিফ্লেকশন। এতদ্ব্যতীত বাস্তবানুগতা থাকলেও তা প্রতিপদে কল্পনায় ব্যাহত হয়। পুরাণসত্য ততটাই সত্য—যুক্তিবিদ্যায় গোল্ডেন মাউনটেন যতটা সত্য। আমরা স্বর্ণ জানি, পাহাড় দেখি এবং সোনার পাহাড় কল্পনা করি। সুতরাং বাস্তবিক স্বর্ণ ও পর্বত না হলে স্বর্ণপর্বত কল্পনা সম্ভব হয় না। মনে করা যায়, মহাভারতকারও কল্পনা করেছেন এবং এইভাবে সেটা বাস্তববর্জিত হয় নি। সেই বাস্তব সত্যতা যে কেউ সততাসহ বর্ণনা করেছিলেন এমন কথা বলার মতো সাক্ষ্যপ্রমাণ আমাদের হাতে নাই। কিন্তু প্রজেকশন বা রিফ্লেকশন হিসাবে সেসময়কার খণ্ডদেশ খণ্ডকালের কিছু কথামালা-চিত্রমালা আমাদের হাতে এসে যায়। আজকের দিনেও একই কারণে পট হাতে নিয়ে মহাভারতের নানা কাহিনী গীত অভিনীত ও পঠিত হতে পারে। আর সেই উপস্থাপনা ভালোও লাগে। (এই লেখার সময় পর্যন্ত পিটার ব্রুকের পরিচালিত মহাভারত দেখা সম্ভব হয় নি আমার)।

তাহলে মহাভারত ঠিক ইতিহাসের জ্ঞাপক নয়। ইতিহাস কতকগুলি ডেটা আর সাক্ষ্যপ্রমাণের সাহায্যে রচিত হয়। এসব সাক্ষ্যপ্রমাণ পূর্বকাল থেকে খুব বেশি দিন আগে পর্যন্ত রাজা বা বিশিষ্ট লোকদের সম্পর্কেই মিলত। সুতরাং ইতিহাস হয়ে থাকত রাজরাজড়াদের উত্থান-পতনের ইতিহাস। যাদের কথা বলা হত না, ইতিহাস নীরবতা দিয়েই তাদের অবস্থা প্রকট করত। মহাভারতে যারা যুদ্ধ করেছে, প্রাণ দিয়েছে, শতসহস্র সংখ্যায় আঠারো দিনের যুদ্ধে মরেছে, তারা সকলেই কিন্তু কুরুরাজ,

পাণ্ডুপুত্রগণ এবং তাঁদের সম্পর্কিত আত্মবন্ধু হিসাবে যুদ্ধে অংশভাক এবং প্রাণত্যাগকারীদের সঙ্গে যুক্ত। অগণিত প্রাণী, পরিচারক-পরিচারিকা-নর্তকী প্রভৃতি-দের কথা এখানে বাদই দিলাম। যে যখন সুবিধা পেয়েছে বড়ো হয়েছে এবং দাবি করেছে। যারা পারে নি তারা উৎখাত হয়েছে। এই বাস্তব সত্য বর্তমানের যুদ্ধেও প্রকট। তিন হাজার বর্ষ আগেও দুই যুযুধান কুল যুদ্ধ স্থগিত রাখার কথা ভেবেছেন, আবার আত্মীয়-বন্ধু দ্বারা প্ররোচিত হয়ে এগিয়েছেন। মহাভারত থেকে যে সত্য বার হয়, আজকের দিনের "অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রনট" কিংবা "থার্ড রাইখ" পড়লেও কিছু বাস্তব স্বতঃ-ফূর্তভাবে বার হয়ে আসে। আমাদের মনে রাখা দরকার—মহাভারত একটা সমগ্র সাহিত্য। সাহিত্যের সত্য শুধু ঘটনা নিয়ে নয়, সাহিত্যের কাজ হল ঘটনা-প্রতিবিম্বিত মানুষ নিয়ে। (এই আলোচনাপ্রসঙ্গে আমি শ্রীগোপাল হালদার এবং শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে কৃতজ্ঞ)। মহাভারত-কথাও ঠিক গ্রন্থ হিসাবে রচিত হয় নি। দফায়-দফায় তা রচিত, সঞ্চিত ও বর্ধিত হয়ে থাকবে। ঘটনাপরম্পরা অনেক সময় এলো-মেলো মনে হয়। একেবারে অতি বাস্তব ঘটনার সঙ্গে পাশাপাশি আবার এসে গিয়েছে কোনো ধর্মদেশনা (বনপর্ব) নয়তো ভীষ্ম-শরশয্যার পরেরকার অনুশাসনপর্ব শান্তিপর্ব। অষ্টাদশ অধ্যায়ের শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতা তাতেই সংগৃহীত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে বিশেষ ভাবে মহাভারতে পরে সংলগ্ন করে দেওয়া হয়েছে বলা হয়। কিন্তু, একথা প্রমাণ করার মতো উপাদান আমরা পাই না। ভবিষ্যতে হয়তো কমপিউ-টর প্রণালীতে ভাষার প্রকৃতি বিচার করলে এসত্যের উপর খানিক আলোকপাত হতে পারে। হয়তো, ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার ফলে জয়াখ্য-সংহিতা এবং মহাভারতের বিভিন্ন অংশেরও স্তরীভূত অবস্থার অংশ-গুলি পৃথকভাবে বোধগম্য হতে পারে। নীলকণ্ঠের টীকা সমগ্র মহাভারতের উপর আধারিত ব্যাখ্যা। দেখার মতো কথা হল যে মহাভারতেরও অষ্টাদশ পর্ব বিদ্যমান।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্পর্কে বলা হয়েছে—'সর্বো-পনিষদঃ গাবো, দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ। পার্থভক্তঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ'। এখানে ঈশোপ-নিষৎ এবং আরো দুই-একটি উপনিষদের ভাবনা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তার চাইতেও যা বেশি আছে তা হল বৌদ্ধ ত্রিপিটকের সূত্রপিটকের অন্তর্ভুক্ত ধর্মপদমের ভাবাদর্শ এবং বিশ্বাসও, মহাভারত যখনই লেখা হোক, চতুর্থ শতাব্দীতে (খ্রীষ্টাব্দ) হওয়াই সম্ভব বলে আধুনিক পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন, অর্থাৎ নিশ্চয়ই ধর্মপদের পরে। মহাভারতে মাত্র দুই স্থানে গৌতমের নাম আছে। ঋষি গৌতম অবশ্য ন্যায়সূত্রের প্রবক্তা। ২য় শতক খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তাঁর অধিষ্ঠান বলে বর্তমানে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন। (উইনটার-নিৎস—দাশগুপ্ত)। আর তথাকথিত হিন্দুধর্ম এই সময় থেকে অগ্রসর হয়ে আর্যধর্মশাস্ত্র সূত্রসাহিত্য তথা মহাকাব্য সাহিত্য আত্মসাৎ করে নেয়। বুদ্ধকে অবশ্য কৃষ্ণের বা শ্রীভগবানের অবতার বলে স্বীকৃতি দিতে আরো কয়েক বৎসর লেগেছিল। চতুর্থ শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্যে হিন্দু অভ্যুদয় ঘটে। গুপ্ত, পাল ও সেন রাজারা বৌদ্ধবিরোধী না হলেও হিন্দুধর্মের পোষকতা করেন। দশাবতার স্তোত্র রচিত হয় দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দে রাজা লক্ষ্মণ সেনের সময়। তখন ভারতে ইসলামও এসে গেছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পড়লে বোঝা যায় যে সম্পূর্ণ গ্রন্থটি সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সে সদুদ্দেশ্য হল ব্যক্তিগত অধিকারভেদের আধারে ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তির কুল শীল জন্মকর্ম মোক্ষ নির্ভর করে। মহাভারতের রচনা যদি ক্রমে-ক্রমে খণ্ডে-খণ্ডে হয়েও থাকে, তাহলেও ভাবা যায় যে কিছু লোক বা কোনো লোক দেব-মাহাত্ম্যের দোহাই দিয়ে বা সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েছেন। স্পষ্টভাবে না হলেও কখনো বলা হয়েছে ধর্মযুদ্ধের কথা; কখনো লোকক্ষয়কৃতি বলে উল্লেখ

করা হয়েছে; কখনো আমাদের মনে হয়েছে আর্য-আর্যেতর জাতিসত্তা এবং জাতিমত্তা মিলিয়ে কৃষ্ণ বাসুদেব নামধেয় কিছু ঐক্য আনার সম্ভাবনা চেয়েছেন। কৌরব-পাণ্ডবরা পাশা খেলেছে এবং নিজেরাও যেন ভাগ্যচক্রে পাশার ঘুঁটি হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণবাসুদেব যেন মায়াধর ঐন্দ্রজালিক—মনুষ্যদেহে ভগবান বলে তাঁকে প্রতিভাত করা হয়েছে।

স্বভাবত প্রশ্ন জাগে: উক্ত বাসুদেব কৃষ্ণ কি সত্য ঐতিহাসিক ব্যক্তি? এ প্রশ্নের উত্তর মহাভারতের বিশ্লেষণে নাই। এখানে মহাভারত মহাকাব্য। সে-মহাকাব্যের কবি যিনিই হন, তাঁর মস্তিষ্কই কৃষ্ণ-বাসুদেব আর কৃষ্ণদ্বৈপায়নের গর্ভগৃহ। রচনা এবং রচনার আদর্শ তাঁর কল্পনাপ্রসূত। একথা মানলেও মনে করতে বাধা নেই যে মহাভারতকারের যুগের রাজনীতি কিছু কম প্রাগ্রসর ছিল না। তিনি নিশ্চয়ই এরূপ কোনো না কোনো কৌটিল্য বা প্রাচীনরূপের কোনো মেকিয়াভেলির কাছাকাছি এসেছিলেন অন্তত। রাজনীতি করার যে দুরাশা ও উত্থান-পতন এবং সেই সূত্রে উপলব্ধ তীক্ষ্ণ বৈশ্লেষিকী বুদ্ধি মনে হয় সে যুগের মানুষেরও ছিল। আর, তা ছিল বলেই মনে করতে পারি যে ওই মহাভারতের কল্পযুগেও (জানি না বর্ষগণনা কতটা সম্ভব) বুদ্ধির এরূপ বিকাশ ঘটার মতো অবস্থাও তখন হয়েছিল। এইখানে আরো একটা জিনিস চোখে পড়ে। সেটা হল যুক্তি এবং নীতির বা শুভবোধের অনিবার্য সংঘর্ষ। সামগ্রিক চিত্র হিসাবে মহাভারতের কুশলী বীরগণ, স্বার্থান্বেষণে পাশবশক্তিকে সমর্থন করেছেন—অর্থের প্রাধান্য স্বীকার করেছেন, ছলে-বলে-কৌশলে কার্যসিদ্ধি করে গেছেন। বলা হয়েছে, সর্বনাশাভাবে বলা হয়েছে—এগুলি ভগবানের সর্বজ্ঞতার অনায়াস লীলা।

আমাদের মনে হয় ৫ম ৬ষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ভক্তি-বাদের প্রাধান্যে মহাভারতীয় পরিকল্পনা কিছুটা প্রভাবিত হয়ে থাকবে। আঁথরিয়া বা লিপিকরের হাতে তাঁর মতবাদ অনুযায়ী দু-চার ছত্র সংযোজিত হওয়াতে আপত্তিজনক কিছু পাওয়া যাবে না। প্রমাণ অবশ্য করা যাবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও মহাকাব্যের হিসাবে মহাভারতের উৎকর্ষ আমরা স্বীকার না করে পারি না। "যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ" কথাটি বার হয় গান্ধারীর মুখে। গান্ধার দেশ সেদিনে ভারতের অঙ্গ। যুদ্ধশেষে, বিপুল বৈরিতার অবসানে লক্ষ-লক্ষ মানুষের ও পশুর দেহসমন্বিত কুরুক্ষেত্রের শ্মশানে সেদিন পাণ্ডবের জয় পরাজয় হিসাবেই ধরা গিয়েছিল। মানবমঙ্গল-নীতি তা-ই বলে। দুর্জয় আর দুরজ্ঞেয়-কাম-ক্রোধ লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য নামক ষড়রিপুর তাড়নায় এবং পরিপোষণে কৃষ্ণ-বাসুদেবের বিচারযুক্তির ভুল ধরা পড়েছিল। বিজয়ীদের যেতে হল আবারও সেই মহা-প্রস্থানের পথে। তাঁদের পূর্বজ পিতৃগণ-মাতৃগণ বান-প্রস্থাবলম্বন করলেন। ইতিহাস থাক আর নাই থাক, সমাজচিত্রণ সমাজের যে অবস্থাই বিশদ করুক, অবশেষে কাব্যের উৎকর্ষ সূচিত হয় এই পোয়েটিক জাস্টিস সুরক্ষিত হওয়াতে। আমরা স্বস্তিবোধ করি এই ট্রাজিডির রসধারায় অবগাহন করে। এইখানেই বোধ করি জয়াখ্যসংহিতার বিজয়াভিযান পরিপূর্ণ হয়ে থাকবে। আধুনিক কাব্য-সাহিত্যবিচারেও তাই মহাভারত রসোত্তীর্ণ কাব্য। সার্থক ইতিহাস বা ঐতিহাসিকতা মহাভারতের উদ্দেশ্য নয়।

সমগ্র ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাসাহিত্যের জগতে এ-জাতীয় মহাকাব্য-খণ্ডকাব্য আরো আছে। হোমারের ইলিয়দ ও ওদিসী অষ্টম খ্রীষ্টপূর্বে রচিত। নর্ডিক বীরগাথা, টিউটনিক বীরগাথা, কেলটিক বীর-গাথাগুলি, শ্লাভ-বীরগাথাগুলির কথা উল্লেখ করি। এগুলিও চারণকবিরা গেয়ে বেড়াতেন। মনে হয় এই ইন্দো-ইয়োরোপীয় সংস্কৃতি আর সাহিত্যের জগতে এরূপ প্রবণতা ছিল। হেল্লেনিক দেবদেবীগণ মানুষের কাছাকাছি থাকতেন, প্রয়োজনে তাঁরাও যুদ্ধে-বিগ্রহে স্ব-স্ব ভক্তের পক্ষ গ্রহণ করতেন। এসব লক্ষণসমন্বিত মহাভারত কাব্যকথাও—কিন্তু তা সত্ত্বেও তার প্রধান

উৎকর্ষ হচ্ছে তার গম্ভীর ট্রাজিক পরিণতি দিয়ে। এটি তাকে সর্বকালের রুচির সাহিত্যের পরিণতি দিয়েছে। ইতিহাসদর্শন হলেও তার বিশিষ্টতা হল সাহিত্যকৃতিত্বে।

মহাভারতকথার অন্যতম প্রাণপুরুষ কৃষ্ণবাসুদেব একথা স্বীকার করি বলেই মহাভারতসহ আরও দু-খানি পুরাণের নাম এখানে করতে হয়। এ দুটি হল ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ আর খিল হরিবংশ। খিল হরিবংশকে মহাভারতের পরিশিষ্ট বলেও বলা হয়। অষ্টাদশ পুরাণএবং দ্বাদশ উপপুরাণ নিশ্চয়ই অর্বাচীন যুগে ক্রমে-ক্রমে রচিত হয়ে থাকবে। প্রাচীনতর বিষ্ণুপুরাণেও কৃষ্ণবাসুদেবের কথা আছে। সেখানে রাসনৃত্যের বা নরনারীর সমবেত নৃত্যের বর্ণনা আছে। "মাধব-মাধব-অন্তরে অঙ্গনা, অঙ্গনা-অঙ্গনা অন্তরে মাধবঃ ইত্থমাকল্পিতমণ্ডপমধ্যগঃ বেণুনা সংজগৌ দেবকীনন্দনঃ।" শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত এই শ্লোক আমাদের শারদরাসের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। রাজারা যেতেন মৃগয়ায়। পশুপালক যাযাবর আর্যজাতি যেত স্থানান্তরে পালিত পশুদের ঘাসজলের জন্য। তাদের সঙ্গে থাকত কাঠের নয়তো মাটির গাড়ি। তাতেই তাদের চলন্ত সংসার। তারই পাশে-পাশে তারা নৃত্য করত এবং নিদ্রাও যেত। বিষ্ণুপুরাণের এরূপ বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায় জিপসিদের গতিপ্রকৃতি। আজকের দিনেও তারা সুস্থিত সর্বত্র হয় নি। এই যাযাবরত্ব প্রাচীন আর্যজাতির মধ্যে ছিল। তাদের এই শারদঋতুতে স্থানান্তরযাত্রাকে এদেশে ঘোষ-যাত্রা বলা হয়েছে। এমন ছোটোখাটো যাত্রার কথা যাদবদের সম্পর্কে মহাভারত এবং হরিবংশে উল্লেখিত আছে। আদিম পশুপালক ইন্দো-ইয়োরোপীয়দের একটা প্রাচীন ইতিহাস এই ব্যবস্থার মধ্যে তাৎপর্য-লাভ করতে পারে। সেদিক দিয়ে রামায়ণকথায় এত প্রাচীন উপাদান পাওয়া যায় না। অথবা পুরাতন রামায়ণ এবং তার অবস্থা-ব্যবস্থা বহুলাংশে বিস্মৃত হয়ে রামকে রামায়ণের কবি সৃষ্টি করেছেন। অবশ্য ভুলে গেলে চলবে না যে রামও পূর্বী ক্ষত্রিয়—এবং বিদেহরাজার জামাতা। তাঁরও বর্ণ কৃষ্ণ। তাঁর বিমাতা কৈকেয়ী কেকয়-(ককেশস কি) রাজকন্যা। সে দেশ মদ্রদেশেরও পশ্চিমোত্তরে। অপরপক্ষে রাবণমাতা নিকষার নামও কৈকসী। তিন রাক্ষসী হলেও বিশ্রবা ঋষির পত্নী। দুটি মহাকাব্যের অন্যতম প্রধান মর্মকথা হল আর্য-আর্যেতর জাতিদ্বন্দ্ব এবং কৃষ্ণবর্ণ আর্যেতর মানুষদের গুরুত্ব বৃদ্ধি। এই জিনিসটারই সরল রূপ উত্তরোত্তর জটিল থেকে জটিল হয়ে উঠেছে এমন কথা মনে করার অবকাশ আছে। মহাভারত নামের অন্যতম তাৎপর্য হয়তো এই নানা-বর্ণের নানা-সংস্কৃতির মানুষের সংঘর্ষ ও সমন্বয়ে নিহিত আছে। দুই-একটা নামের কথা ইচ্ছাপূর্বক প্রসঙ্গত উল্লেখ করছি। শ্লাঙ ভাষায় কৃষ্ণ কথাটি চ্যোরনি হয়। ধ্বনিতত্ত্ব অনুসারে এমনটি হয়। একজন জিপসি নটকে দেখেছিলাম মুগ্ধ হয়ে—কালোবরন নৃত্যগীতবাদ্যবিশারদ—নামটি চ্যোরনি নিকলাই। এটা ২৫ ৩০ বৎসর আগের কথা। অপর দিকে যাঁরা ওড়িষার হথীগুম্ফাতে রাজা খারবেলের লিপিটি দেখেছেন তাঁদের অবগতির জন্য নিবেদন করি, খারবেল কথাটার সংস্কৃতানুবাদ হবে কৃষ্ণযষ্টি বা কৃষ্ণ যষ্টি বা লাঠি যাঁর। খারবেল কথাটি দ্রাবিড়-ভাষা থেকে প্রাপ্ত।

এদেশে আর্যদের আসা থাকা নিয়ে কিছু মতভেদ আছে। কোনো-কোনো নৃতাত্ত্বিকের মতে, ও ভাষা-বিদের মতে (হার্নলে যেমন—হেবেশী যেমন) আর্যরা এদেশে আগে-পরে এসেছিল। যারা গোপালক আর্য তারা আসে প্রথমে। গোগ্য (কাউ) শব্দটি আসিরীয় শব্দ। এখান হতেই তারা গোপালন শিক্ষা করে। এই গোপালক আর্যদের এদেশে স্থিতির সময়ের অনুমান আমরা এখনও জানি না। এদের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই ভারতসহ নানা প্রত্ন-দ্রাবিড় জাতির, দ্রাবিড় জাতির পূজা ও ভক্তিমূলক সংস্কৃতির যোগ ঘটেছিল। অপর দিকে নাগ, ঋক্ষ, কপি,

সিংহ, বরাহ, মৎস্য প্রভৃতি টোটেমের মানুষ; নিষাদ শবর প্রভৃতি তথাকথিত নীচ জাতির মানুষের সঙ্গেও তাদের যোগ ছিল। এক্ষেত্রে আমরা মনে করতে পারি বহিরাগত আর্যরা ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আসে। এই বাহিরি এবং ভিতরি আর্যদের মধ্যে সকল দিকে ব্যবধান ছিল। তাদের অন্তর্নিহিত গ্রহণ-অগ্রহণ আর বিভেদ দিয়ে আমরা মহাভারতের বিষয়বস্তুর দ্বন্দ্ব মীমাংসার সমাপতন খানিকটা বুঝতে পারি কিনা এবিষয় আমরা ভেবে দেখতে পারি। তবে এখনও এ বিষয়ে নিশ্চিত হবার প্রমাণসহ উপায় নাই কিছু।

৩. আমরা বলে এসেছি যে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা মহাভারতের বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট এবং পরিণত সংযোজন। দার্শনিকতাকে যুক্তি, ভক্তি এবং মুক্তি—তিন পথে প্রসারিত করা হয়েছে। যিনিই তা করে থাকুন তাঁর উপস্থাপনব্যবস্থা সুনিপুণ তাতে সংশয় নাই। অপর দিকে এ গ্রন্থে আধুনিক মনোভাবনাসম্মত অধিকারী ভেদের কথা আছে। জ্ঞান, ভক্তি আর কর্ম বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। (তুলনীয় বৌদ্ধদর্শনে মৃদু মধ্য ও তীব্র স্তরের অধিকারিভেদের স্বীকৃতি এবং তদনুযায়ী উপদেশনা-বিধি)। এই ভগবদ্গীতাকে, গীতোক্ত নিষ্কামকর্মকে মহাভারতের শেষ কথা বলা হয়েছে। 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' শ্লোকটি দূরদর্শনের মাধ্যমে এদেশের মানুষ শুনেছেন। কান্টের নীতিদর্শন বা এথিক্স আমরা 'ডিউটি ফর ডিউটিজ শেক' কথাটিকে "ক্যাটেগরিক্যাল ইমপারেটিভ" এবং "ডিকটেট অব রিসন" বলে অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দে পাই। তা সত্ত্বেও এমন কথা বলা সম্ভব নয় যে ভগবদ্গীতার দার্শনিকতা হিউম্যানিজম, বিবেক বা কনশ্যানসের সমার্থক অথবা সেখানে ব্যক্তি বা ইনডিভিড়য়ালের স্বীকৃতি আছে। দৈব এবং পুরুষকারের তুলনায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শেষ কথা—'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ —অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ'। আলোচনাকালে ব্যক্তভাবে প্রকট এই নীতিই মহাভারতের নীতি বলে আমরা বুঝতে পারি।

পূর্বোক্ত নীতির পোষকতাসূত্রে এখানে একটা কথা বলা দরকার। এতদ্দেশে প্রস্থানত্রয় পাঠের ব্যবস্থা আছে। বেদ, উপনিষদ এবং শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতাকে একত্র বলা হয় প্রস্থানত্রয়। অর্থাৎ তিনটার ধারাই যেন সমার্থক। কার্যত বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয়। বেদসহ উপনিষৎ আর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও সেই পর্যায়ে পড়ে। উপনিষৎগুলির কয়েকটি তো কোনো-কোনো বেদান্তর্গত ব্রাহ্মণ সংহিতা অথবা আরণ্যকাংশ বলে গৃহীত। আর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণবাসুদেবের মুখনিঃসৃত। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষসূক্তের বিরাট পুরুষের কল্পনার সঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রবক্তা কৃষ্ণবাসুদেবকে এবং তাঁর বিশ্বরূপদর্শন আর বিভূতিকথনের মধ্যে চিহ্নিত করা যায়। তদনুসারী যুক্তিতে মহাভারতক্ষেত্রেই হল এই অতিকথনের স্থান এবং কৃষ্ণবাসুদেবের গূঢ় কূট-বুদ্ধির নাকি যুক্তির ও কোনো মহদভিপ্রায়ের প্রকাশ-লীলাভূমি। বেদকে প্রমাণিত করা হয় 'শব্দ' দিয়ে। শব্দপ্রমাণই বেদ আর বেদই শব্দ। পরবর্তী যুগের শব্দব্রহ্মবাদ তথা স্ফোটবাদ এই একই অন্যোন্যাশ্রয়-নির্ভরতাদোষে দুষ্ট বলে যুক্তিসহ নয়। বেদ অপৌরুষেয় অতএব তা নিত্য। আবার বেদ শব্দাশ্রিত ও শব্দ-শক্তিযুক্ত বলে এটিও অস্তিবাদী দর্শনের একটা প্রমাণ বা সত্যের সাধন বা উপায়। ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্যযোগ মীমাংসা-বেদান্ত শব্দপ্রমাণ মানে। চার্বাক এবং বৌদ্ধ মত মানে না। জৈনমত যে কারণেই হোক "আগম"কে প্রমাণ মানে এবং এটি শব্দ-প্রমাণ-সমতুল্য।

চার্বাকমতে শব্দের প্রত্যক্ষ যখন হয়, তখনই তা শব্দ (অনাহত ধ্বনি কাল্পনিক)। ধ্বনি বা শব্দ উৎপন্ন হয়। উৎপত্তিশালী বস্তুর কার্যকারণতা থাকে। অতএব বেদই যখন শব্দপ্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না—সেখানেই যখন সিদ্ধসাধ্যতা-দোষ বর্তমান থাকে,

যুক্তিতে তখন বেদকে অপৌরুষেয় বলা বা স্বীকার করা একপ্রকার কষ্টকল্পনা মাত্র। বেদোক্ত যজ্ঞকালে যজ্ঞীয় পশুর স্বর্গবাস কল্পিত হয়। চার্বাকমত প্রশ্ন করে, তবে এই সিধা উপায়ে বৃদ্ধ পিতাকে বলি কেন দেয়া হয় না সুনিশ্চিত স্বর্গবাসের জন্য। বলা বাহুল্য, চার্বাকমতের প্রশ্নগুলি অসমীচীন নয়। শব্দ-প্রত্যক্ষকে তাই প্রমাণ স্বীকার করা বৃথা। তাই যদি হয় তবে বেদের অপৌরুষেয়তা খণ্ডিত হয়। উপনিষদ এবং শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা একই অস্ত্রে ছিন্ন হয়ে যায়। 'সর্বোপনিষদঃ গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ' বলার সার্থকতা থাকে না। কারণ গোপালনন্দন হিসাবে যাঁর আত্মপ্রকাশ সেই স্বয়ং কৃষ্ণবাসুদেব, বিশ্বস্ত কর্তা ভর্তা বা গোপ্তা ও হর্তা হবার কোনো সুযুক্তিই পাওয়া যায় না। গুপ্ত সাম্রাজ্যের দীর্ঘস্থায়ী কালে, পঞ্চোপাসনা (শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য) প্রবর্তিত হয়। কৃষ্ণবাসুদেব কালক্রমে সূর্য- ও বুদ্ধ-মূর্তিগুলিকেও ক্রমে গ্রাস করে ফেলে। কৃষ্ণবাসুদেবের পূজা- উপাসনায় দ্রাবিড়মণ্ডল তথা দক্ষিণভারত উত্তরভারত একত্র হয়ে ওঠে। উত্তর-ভারতের প্রধান-প্রধান বৌদ্ধস্থানগুলি যেমন মথুরা, বৃন্দাবন বৈষ্ণবপ্রধান হয়ে গেল। সময়ের সঙ্গে দক্ষিণে তিরুপতি, মদুরা, কাঞ্চী, বেঙ্কটেশ্বর (সুন্দরেশ্বর), বিঠঠলদেব এঁরা এবং নীলাচলের জগন্নাথধাম (স্তূপ বিশেষ) অচিরে বৈষ্ণবকেন্দ্রের মধ্যেও প্রাধান্যলাভ করল। আমরা বলে এসেছি যে মহাভারতকাহিনীতে সুপ্রাচীন এক জাতির উত্থান- পতনের ক্রমান্বয় বিধৃত। তার পরিণত লিপিবদ্ধ রূপ পাই চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দে। অপর দিকে, রামায়ণের কাহিনীর কতকাংশ সুপ্রাচীন হলেও তার মর্মকথা পরবর্তী যুগের অর্বাচীন সমাজব্যবস্থার একপ্রকার স্থায়ী আদর্শের কল্পনা মাত্র। মহাভারতের যুধিষ্ঠির দুর্যোধন স্বরূপত স্বাভাবিক। রামায়ণের রামসীতা, দশরথ এমনকী রাবণও (শত্রু হিসাবে) যেমনটি হওয়া উচিত তাই। তা নাহলে এ কাহিনীও প্রাগুক্ত ইন্দো-ইয়োরোপীয় সংস্কৃতি-সাহিত্যেরই অন্তর্গত। মর্মার্থ সেই একই—নারীহরণ, রাজায়-রাজায় যুদ্ধ, উলুখড়ের প্রাণ যাওয়া এবং সামাজিক ধার্মিক অনুশাসনের বলে বহুর অত্যাচার অল্পের প্রতি। সবলের অত্যাচার দুর্বলের প্রতি। মহাভারতে তবু প্রতিবাদ আছে। তা রামায়ণে নাই। এ থেকে অনুমিত হয়, রামায়ণ কাহিনীর পরিণতরূপ তৈয়ারি হয়েছে পরে যদিও তা লিপিবদ্ধ হয়েছে আনুমানিক ২য় খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে। এও চারণগীতি। সুতরাং মহাভারত, রামায়ণ কোনোটির মধ্যেই কোথাও অপৌরুষেয় বাঙ্ময়ত্ব প্রকাশ পায় নি। দুটি কাহিনীর নামই কোনো না কোনো ব্যক্তির কল্পনায় নিউক্লিয়াসরূপে। পরে-পরে তার ব্যাখ্যা, অঙ্গ-উপাঙ্গ যোগ দিয়ে বাড়িয়ে তোলার প্রয়াস আর কলেবর বৃদ্ধি করা হয়েছে। অর্থাৎ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার আধারীভূত মহাভারত একটি পূর্ণাঙ্গ ট্রাজিক মহাকাব্য হিসাবেই স্বীকার্য। তাকে এক অবতারপুরুষের বিচরণক্ষেত্র বা অলৌকিকতার লীলাভূমি বলা অসঙ্গত। তাতে কৃষ্ণবাসুদেবও ভাগবতী সত্তা হারান আর মহাভারত কাব্যও তার কাব্যরসের পূর্ণ মর্যাদায় স্বীকৃতি পায় না। দুটিই মিশে যায় কিছু অযৌক্তিক তথা অলৌকিক ফাঁকিতে।

অলৌকিক কথাটা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি, লৌকিক অনেক কিছু যা বুঝতে পারি না তাকে বা তার দূরত্বকে ঐরূপ নাম দেবার প্রবণতা আমাদের মধ্যে আছে। এ কথাটা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত নয়। আবার এটা সাধারণ ভাবের মানুষেরও বোধগম্য হয় না। এই অলৌকিকত্ব আরোপ করা হয় ভাগবতী সত্তার উপর। তাঁকে সর্বশক্তিমান বলা হয় অদ্বিতীয় বলা হয়। সর্বভূতান্তরাত্মা বলা হয়। কৃষ্ণবাসুদেব মহাভারতের প্রাণপুরুষ হিসাবে যা ঘটেছে যা ঘটমান এবং যা ঘটবে এ সকলেরই কর্তা-ভোক্তা এবং হর্তা সবই। প্রশ্ন জাগে এটি তাঁর লীলা নাকি। মহাভারতের যুক্তিতে লীলা কথাটা বলা হয় নি। তবে সর্বপ্রকার

"সুখদুঃখে সমীকৃত্বা" যে নিটুট প্রসন্নতা আমরা কৃষ্ণবাসুদেবের মধ্যে অবলোকন করি তা কিন্তু এই লীলারই স্বধর্মী বা সমধর্মী বলা চলে। দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে অনুগঠিত গৌতম ন্যায়শাস্ত্রে এবং তারপরে বহুকাল অবধি প্রচারিত বাৎসায়নভাষ্যে, উদ্যোৎকরের ন্যায়বার্তিক, উদয়াচার্যের ন্যায়কুসুমাঞ্জলি এবং আরো পরেরকার নব্য ন্যায়ের মুখ্য গ্রন্থ সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে যুক্তির অবতারণা দিয়ে এই ঈশ্বরকে নিত্যপদার্থ হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে। পৃথিবী যদি কার্য হয় তবে ঈশ্বরই কারণ এবং তাঁর পক্ষে অদ্বিতীয় এবং কার্যকারণপরম্পরাবহির্ভূত হওয়াও প্রয়োজন। তা নাহলে তিনিও ঈশ্বর থাকেন না—কর্মফলদাতাও হন না; কারক ও দয়াময়ও হন না ইত্যাদি।

৮ম খ্রীষ্টাব্দে লেখা (?) শান্তিরক্ষিতের প্রামাণ্য গ্রন্থ "তত্ত্বসংগ্রহ"। (গায়কোয়াড় সিরিজ বড়োদা—অধ্যাপক বিনয়তোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সম্পাদনা)। তাতে অস্তিবাদ এবং স্থিরবাদ খণ্ডন আছে আর সেই প্রসঙ্গে ঈশ্বরকারণতা তথা ঈশ্বরখণ্ডনও বিস্তমান। নামরূপবাদী বৌদ্ধ হিসাবে তাঁর মতে ঈশ্বর শব্দটি কিছু অন্বয়যুক্ত হয়ে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। নরসিংহ, শশশৃঙ্গ এসব কথাও তো আমরা বুঝতে পারি। যদিচ তাদের বাস্তব অস্তিত্ব নাই। ঈশ্বরও তাই নামমাত্র হিসাবে বোধ্য। দ্বিতীয়ত এই ঈশ্বরের ঈশ্বরকারণতা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। প্রথমত দেখা যায় বৌদ্ধ মতে কার্যকারণভাব একটা নিত্যসাহচর্যের কল্পনা—কারণ শেষ হলে সতত সঞ্চরমাণ কার্যসহ তার সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। অতএব জগৎ-কার্য ঈশ্বরকারণতাসঙ্গাত—এটা কষ্টকল্পনা। দ্বিতীয়ত, জগতে এত অসম্পূর্ণতা আর দুঃখকষ্ট যে তার দ্বারা ঈশ্বরহানি ঘটতে বাধ্য। হয় ঈশ্বর এগুলি দূর করার মতো শক্তি ধরেন না আর না হয়তো তিনি দেখে-শুনেও চুপ করে থাকেন। যদি দেখে-শুনেও চুপ করে থাকেন তবে তাঁকে সর্বশক্তিমান বলার কারণ নেই, আর তা না হলে তিনি জড়বৎ এবং অক্ষম। সেক্ষেত্রে তাঁকে ঈশ্বর বলে লাভ কী? তৃতীয়ত, ঈশ্বর যদি অদ্বিতীয় শক্তিমান হন এবং তাঁর সৃষ্ট জগতের অসম্পূর্ণতা নিবারণ করার শক্তি তাঁর না থাকে, তাহলেও তিনি স্রষ্টা হিসাবে প্রায় অক্ষম এবং একজন অত্যাচারী শক্তিমান ব্যক্তির তুল্য হয়ে পড়েন। এমন ভয়াবহ এক শুভাশুভ-দায়িত্ববর্জিত শক্তিধর কি ঈশ্বর হিসাবে হওয়া প্রার্থিত? উত্তর অবশ্যই নঞর্থক। চতুর্থত, বলা হয় এসবই হল ঈশ্বরের ইচ্ছা বা লীলা অথবা দুইই। তদুত্তরে শান্তিরক্ষিতের যুক্তি হল মানুষ তার পুরুষকার এবং দায়িত্ব সতত হারিয়ে কেন এই স্বেচ্ছাচারী ভাগবতী লীলায় অংশ নেবে? এবং তা ছাড়াও বালক অপরিণত-মতি বলে লীলাখেলায় আনন্দ পেতে পারে। তাঁর শুভাশুভকুশলাকুশলচেতনা নাই বলে বা বুদ্ধি পরিপক্ক হয় নি বলে। কিন্তু ঈশ্বর প্রসঙ্গে এই বালকত্ব আরোপ করাতে ঈশ্বর হাস্যকর অবস্থা প্রাপ্ত হন মাত্র। পক্ষমত, শুভাশুভবোধ যদি লীলাদ্বারা চালিত হয় এবং দয়ালু ঈশ্বর হিসাবে যদি শ্রীভগবান সর্বদোষ ক্ষমা করেন (কর্মফলদাতা), ভজনা দ্বারাই মুক্তি লভ্য হয় তাহলে ঈশ্বরত্বের কল্পনা নিতান্ত পক্ষপাতদুষ্ট অসম্মানের হয়ে ওঠে এবং মানুষের কুশলবোধ বা কার্ডিনাল ভারচু সম্বন্ধে কখনো চরিতার্থতা আসতে পারে না। অতএব এরপ্রকার ঈশ্বরত্ব কল্পনাতেও অসার।

শান্তিরক্ষিতের সব যুক্তিগুলিই মহাভারতের প্রায় সর্বত্র প্রকটিত কৃষ্ণবাসুদেবের চরিত্রে আর কার্যে প্রতিফলিত বলে অনুভব হয়। তখন স্ববিরোধী কল্পনায় কখনও তাঁকে অপৌরুষেয় দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বর এবং কখনও বা তাঁকে মানুষী ও একান্ত অসহায় বলে ধরা হয়েছে। তাতে তাঁর সম্মান গৌরব খর্বিত এবং মহাভারতকারের বিচারও দোষাবহ হয়েছে।

[ক্রমশ

উপাদান : জয়াখ্য সংহিতা-জৈমিনীয়। মহাভারতম্ নীলকণ্ঠ টীকোপেত। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীমহাশয়ের সটীক অনুবাদ। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত বঙ্গানুবাদ। কাশীরাম দাসের মহাভারত। গোপাল হালদার-অনন্তলাল ঠাকুরের ভূমিকা সংবলিত। History of Indian Literature Collected Papers on Mahabharat—Prof. S. K. Chatterji.

Paper on Mahabharat : Dr. D. Kosambi. MiddleIndo Aryan & Hindi : Prof. S.K. Chatterji. মহাভারত—বুদ্ধদেব বসু। দ্রৌপদী—নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী। পাঞ্চজন্য : গজেন্দ্র মিত্র। মহাভারতের সত্য : জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি ইত্যাদি—

ছায়াবাজি

করবী দাশগুপ্ত

১

বয়স্কদের সাহিত্য শিশুরা আত্মসাৎ করে নিয়েছে এমন নজির পৃথিবীতে কম নয়। রামায়ণ-মহাভারত বা ইলিয়াড-অডিসির মতো মহাকাব্য, ডন কিহোটে বা গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্ত তার উদাহরণ। আবার কিছু শিশুসাহিত্য আছে যা নেহাতই বালগোপালের বাল্যভোগ হয়ে ফুরিয়ে যায় নি। ত্রৈলোক্যনাথের "কঙ্কাবতী", অবনীন্দ্রনাথের "বুড়ো আংলা" বা সুকুমার রায়ের "হ-য-ব-র-ল", "আবোল তাবোল" প্রভৃতি সেই পর্যায়ের রচনা। পটলার দাদার* মতে বয়স হলে মানুষ 'হোঁৎকা' হয়ে যায়। অতি প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক জগতের বাইরে সব কিছুকেই 'বাজে স্বপ্ন' বা অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেয়। এটা কিন্তু "হ-য-ব-র-ল"র অনামা নায়কের কানমলা খাওয়ার দরুন রাগের কথা। বয়স যতই হোক, মানুষ নিজের মধ্যেকার সেই শিশুটিকে ছাপিয়ে যেতে পারে না। তবে শিশুর মতো নিছক আনন্দটুকুতে সন্তুষ্ট না থেকে কুমিরের মতো ব্যাপারটির 'মূল পর্যন্ত' যেতে চেষ্টা করে। ওকালতির জোরে কচুর মতো বস্তু সারবান ও উপাদেয় বলে প্রমাণ হয়। গোড়াতেই সবিনয়ে স্বীকার করি "হ-য-ব-র-ল"র তাৎপর্যব্যাখ্যা তেমনি একটি অকাজ, বইটির উপভোগ্যতায় নূতন মাত্রাযোজন নয়।

২

আমার মনে হয় "কঙ্কাবতী", "বুড়ো আংলা" বা হ-য-র-ব-ল—বাঙলা শিশুসাহিত্যের এই তিনটি ভিন্ন স্বাদের বইয়ে কল্পজগৎ গড়ে তোলার ক্ষমতায় একটা সাধর্ম্য লক্ষ করা যায়। তিনটি বইয়ে কাহিনীর বাস্তব উৎসকে কল্পনার প্রাচুর্য এমনভাবে ঢেকে ফেলেছে যে চট করে তা নজরে আসে না। "কুলীনকুলসর্বস্ব" থেকে "বামুনের মেয়ে" পর্যন্ত কুলীনকন্যার দুর্গতি নিয়ে বাঙলা সাহিত্যে কাঁদাকাটা কম হয় নি।

শ্রোত্রীয় কন্যার দুঃখও যে কম ছিল না, একটি সেকেলে ছড়ায় তার রেশ রয়ে গেছে।

আলতাছড়ি গাছের গুড়ি জোড় পুতুলের বিয়ে,
কত টাকা নিলে বাবা দূরে দিলে বিয়ে
এখন কেন কাঁদছ বাবা গামছা মুড়ি দিয়ে।

একথলি মোহর কন্যাপণ পেয়ে কঙ্কাবতীর বাবা বাঘকে সুপাত্র বিবেচনায় কন্যা সম্প্রদান করেছেন। সমাজদেহের সেই ক্ষতটি Skull & Skeleton Company, নাকেশ্বরী ডাইনী, কাঁকড়া বাবু, ব্যাঙ সাহেব, মশক সখী 'পচাজল', খোক্কসের ছানা, চাঁদের শিকড় মিলে পরতে-পরতে ঢেকে একটি অনিন্দ্য-হাস্যকরোজ্জ্বল মুক্তা উপহার দিয়েছে।

গ্রীষ্মে যাযাবর হংসের মানসহ্রদে প্রত্যাবর্তন জীববিজ্ঞানের সত্য। রিদয় নামে একটি দুষ্টু ছেলের 'যক্ষ' হবার কাহিনীর সঙ্গে মিশে 'ছবিলেখা ওবিন ঠাকুরে'র হাতে সে কাহিনী অপরূপ কথা হয়ে উঠছে। ঘুচে গেছে বাস্তব-অবাস্তবের সীমারেখা। এ হল কল্পবিজ্ঞানের উলটো প্রক্রিয়ায় রচনা। কল্পনার পেছনে মাঝে-মাঝেই বাস্তবের উঁকিঝুঁকি। বুড়ো আঙুলের মতো ছোট্ট যকৃটি সুবজনীর খোঁড়া হাঁসের আকাশযানে সওয়ার, কিন্তু দূরপাল্লার আকাশ ভ্রমণের 'travel light' মন্ত্রটি শিখতে পারে নি। যাযাবর হাঁসের যা স্বভাবসিদ্ধ। মানুষের সঞ্চয়ী স্বভাবে সে ফুলপাতার এক পোঁটলা বেঁধে বসেছে। কোনো ঋষি নাকি মহাপ্রস্থান যাত্রার মোটঘাট দেখে, যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'লঘুর্ভব মহারাজ',[৭] নির্মমতার সেই শিক্ষা নেই বলে মানুষ বিলাপ করে, 'হায়রে হৃদয়/তোমার সঞ্চয়/দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।'

কল্পলোকে পাখা মেলে উড়তে গেলে চাই লঘুতা। এদিকে বড়ো মামা প্রমুখ গুরুজনেরা কান পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে মনে বসিয়ে দিচ্ছেন জগৎটা 'নিয়মের রাজত্ব' —বিশ্বজগৎ অমোঘ কার্যকারণশৃঙ্খলে বাঁধা—এক পা এদিক-ওদিক হবার জো কি! নিয়মও হরেক—অঙ্কের, বিজ্ঞানের, ব্যাকরণের, আইনের, সমাজের, আরো কত কী। গল্পের যে নায়ক, আট বছর তিন মাস তার বয়স। (Alice-এর বয়সও সাড়ে সাত)। গ্রীষ্মতাপে আর ব্যাকরণের চাপে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে সে প্রবেশ করেছে সুষুপ্তি এবং জাগরণের মাঝামাঝি মগ্ন-চৈতন্যের সৃষ্ট এক স্বপ্নের জগতে। সেখানে বাস্তবের ভারাকর্ষণ হারিয়ে নিয়ম প্রত্যক্ষের নাকের সামনে তুড়ি মেরে হয়ে উঠেছে বেনিয়ম। একটা হালকা সাদা রুমাল রূপান্তরিত হয়েছে মোটাসোটা লাল টকটকে বেড়ালে। ফিজিক্সে বলে, পদার্থের রূপান্তর আছে, ক্ষয় নেই—ওদিকে মেটাফিজিক্সেও 'appearances and reality'র[৮] তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত। 'ছিল একটা ডিম, হয়ে গেল একটা প্যাঁকপ্যাঁকে হাঁস, এ তো হামেশাই হচ্ছে।' অণু থেকে পাখি, বীজ থেকে বৃক্ষ, দুধ থেকে দই, জল থেকে বরফ, গুটিপোকা থেকে প্রজাপতি নানান ধরনের রূপান্তরের ভুরি-ভুরি দৃষ্টান্ত চারপাশে ছড়িয়ে। ক্ষীণদৃষ্টির সহায়ক চশমা পরলেই সব বিভ্রান্তি ঘুচে যাবে।

রুমাল বনাম বেড়াল বনাম চশমা বনাম চন্দ্রবিন্দু (স্বর বা ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হলে তবেই নিজের অস্তিত্ব জানান দিতে পারে) আমাদের এনে ফেলল আপেক্ষিকতার জগতে। সেখানে নিউটনি তত্ত্ব টেকে না।[৯] স্বপ্নে দ্রুতগতি পেয়ে ছোট্ট পাতলা সাদা রুমাল মোটাসোটা বেড়াল হতে পারে—The apparent increase of mass in swiftly moving particles has been observed. (*The ABC on Relativity* by Bertrand Russell). কলকাতা, ডায়মনড হারবার, রানাঘাট পেরিয়েই তিব্বত পৌঁছে যাবার সিধে রাস্তাটি জানেন 'গেছোদাদা'। তিনি গাছেই থাকেন কিন্তু কোন্ জায়গাকার কোন্ গাছে তাঁকে মিলবে, সেটা অত্যন্ত জটিল হিসাবসাপেক্ষ। তাই বেড়াল কাঠি দিয়ে দাগ টেনে-টেনে আপাত-অসংলগ্ন প্রকল্পের এক দুর্বোধ অঙ্ক ফেঁদেছে—যার প্রতিটি বাক্যই শুরু 'এই মনে কর' দিয়ে। এমনি বহুতর 'মনে করা' কি উচ্চতর গণিত বা পদার্থবিদ্যায়ও প্রয়োজন হয় না? শূন্য বা বিন্দুর মতো অসম্ভব কল্পনার ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আছে সেসব শাস্ত্র। তার কাছে রূপকথাও শিশু। পলাতক আর পশ্চাদ্ধাবকের দুই গতির আপেক্ষিকতার উপর নির্ভর করছে বস্তুর তাৎক্ষণিক সম্ভাব্য অবস্থান। সাত দুগুণে চোদ্দ আর ধ্রুবসত্য নয়। কাকেশ্বর নব বিজ্ঞানের 'বেহিসাবী' হিসাবে পাকা। সে অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছে 'তোমাদের দেশে সময়ের দাম নেই বুঝি?' ত্রিমাত্রিক পরিসরের সঙ্গে সময়ের চতুর্থমাত্রা যোগ করে তবে তো space-time-এর unified field-এর তত্ত্বে ঢুকতে পারব।

সুকুমার রায় তা বলে রূপক রচনা করেন নি কিংবা ফাঁকি দিয়ে শটকে শিখিয়ে দেখার মতো বিজ্ঞান শিখিয়ে দেবার চেষ্টা করেন নি। তিনি মনের একটি বিশেষ ধর্মের উপর ঝোঁক দিয়েছেন—পূর্ব-সংস্কারমুক্তি এবং সজীব কল্পনা। খোলা মন আর খোলা চোখ নিয়ে অনেক রহস্যের মর্মোদ্‌ঘাটন করা যাবে—উত্তর মিলবে বহু প্যারাডকসের। পরিভাষার গুরুগম্ভীর মোড়ক খুলে প্রাত্যহিকের ভাষায় পরিবেশনাতেই এই অংশে কৌতুক সৃষ্ট হয়েছে। আমাদের চিরপলাতক গেছোদাদাটি কে? $E=mc^2$ তত্ত্বের উদ্ভাবক, না তত্ত্বটি? ঠিক করে কিছুই বলতে পারি না। মনে করি গেছোবৌদি যিনি কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে রেঁধে যাচ্ছেন—তাঁর রান্নাঘরে কোনো-না-কোনো সময়ে তাঁকে ধরা যাবেই। গেছো-বৌদি কি আলোকগতির ধ্রুবক হতে পারেন? সুধীরা কী বলেন? প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে: মারি ক্যুরি আর আইনস্টাইন সপরিবারে সুইটজারল্যানডে হাওয়া বদলাতে গিয়েছিলেন। তখন আইনস্টাইন আপেক্ষিকতার তত্ত্ব নিয়ে ভাবছিলেন কিন্তু সম্পূর্ণ সমাধান পান নি। তিনি মারি ক্যুরির হাত ধরে আবেগভরে বলেছিলেন, 'শূন্যে একটা lift পড়লে কী হয় আমি জানতে চাই।' তখন বড়োদের এই ছেলেমানুষি শুনে তাঁদের ছেলেমেয়েরা হেসে কুটিপাটি হয়েছিল। তারা তো ওই কথার গূঢ়ার্থ বোঝে না। এতে ধাঁধা লাগে, কৌতুকের পাত্র আমাদের মতো অজ্ঞ সাধারণ মানুষ নয় তো? নীরস বিষয় নিংড়ে এমন হাস্যরসের মধু পাওয়া যায় কে জানত?[১০]

উদো নামে যে দেড়হাতি বুড়োটি উদয় হয়েছে তার মতো আমাদের সকলেরই মরতে বড়ো অনিচ্ছা। কাল বা সময় এখানে অন্য অর্থ নিয়েছে। যুধিষ্ঠির বলেছেন কালগ্রাসে পতিত হওয়াকে মানুষ অমোঘ পরিণাম বলে জানে কিন্তু মানে না—এ বড়ো আশ্চর্য। সেই অনিবার্য পরিণাম ঠেকাতে মানুষের কত না চেষ্টা —কায়কল্প সাধনা, alchemy-তে elixir of life-এর সন্ধান, আত্মার অমরত্ব কল্পনা, জরা-মৃত্যু আর পুনর্জন্মের দুঃখ এড়াতে নির্বাণ, কালের অধীশ্বর হবার সাধনার শেষ নেই। উদোর চল্লিশে, অর্থাৎ যৌবনের শেষপ্রান্তে এসে বয়েস ঘুরিয়ে দেওয়া তেমনি একটি হাস্যকর অথচ মানবিক প্রচেষ্টা। Tweedledum ও Tweedledee-র চেয়ে উদোবুধোর কাহিনী গভীরতর তাৎপর্য পেয়েছে মনে করি। পদার্থতত্ত্ববিদ বলেন, যদি অতি-আলোকীয় গতি পাওয়া যেত তবে অতীতে পৌঁছানো যেত। আলোকগতিতে চললে বর্তমান কালেই থাকা যেত। অব-আলোকীয় গতিতে চললে পৌঁছানো যেত ভবিষ্যতে। তিনটেই অধিকারে থাকলে ত্রিকালজ্ঞ হতে বাধা কী? এই প্যারাডক্স ধরা আছে একটি লিমারিকে—

There was a young lady Bright,
Who could travel much faster than light,
She started one day,
In the relative way,
And returned on the previous night.
("Relativity": Anon.)
Faber Bk. of Comic Verse, 328.

টেকো লম্বাদাড়িওয়ালা বুড়ো নিজেকে তেরো বছরের ঘোষণা করলেও ও কথায় ভবি ভোলে না।

সুদূরবর্তী বলে বালক মৃত্যুকে স্বাভাবিক পরিণাম মানে কিন্তু তার কারুণ্য তার উপলব্ধিতে ধরা পড়ে না। নেড়ার কবিতায় কত হালকা চালে, প্রায় সোল্লাসে রোগজীর্ণ বৃদ্ধকে পৃথিবী থেকে সরে পড়তে বলা হয়েছে :

খুসখুসে কাশি
ঘুষঘুষে জ্বর
ফুসফুস ছাঁদা
বুড়ো তুই মর।
মাজরাতে ব্যথা
পাঁজরাতে বাত
আজরাতে বুড়ো
হবি কুপোকাৎ।

পদান্তের বদলে পদাদ্য অনুপ্রাসের প্রয়োগে পুরোনো রোগের লেগে থাকা দ্যোতিত হয়েছে লক্ষণীয়।

মানুষের আরেকটি দুর্বলতা অন্যকে ধরে পড়ে নিজের বক্তব্য শোনানো। নেড়া, উদো, ব্যাকরণ শিং—তাদের গল্প, বক্তৃতা বা গান শোনাবেই শোনাবে। না শোনাতে পারলে তাদের শিল্প মাঠে মারা যাবে। রূপকথার গল্পে বহু শব্দদ্বৈত রাজৈশ্বর্যের অনুভূতি রচনা করে। পাত্রমিত্র-লোকলশকর দিয়ে শুরু করে অনুপ্রাসের বাষ্পে দ্রুতি পেয়ে শব্দদ্বৈত আর থামতে পারছে না—ডাক্তার-মোক্তার, আক্কেল-মক্কেলে গিয়ে পৌঁছেছে। অর্থাৎ শব্দেরও একটি গতিবেগ আছে—তা স্বতন্ত্র। রূপকথার চরিত্ররা হাজির—রাজা, মন্ত্রী, রাজকন্যা, রাক্ষস, পক্ষিরাজ—কিন্তু তাদের যোগাযোগ অসংলগ্ন। রাক্ষস, হুড়মুড় করে খাট থেকে পড়ে যাওয়ায় তার হাঁউ-মাউ-কাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ ডাক ভয়াবহতা হারিয়ে হাস্যকর হয়ে পড়েছে। আর চূড়োয় বসে আছে চূড়ান্ত অযৌক্তিক প্রশ্নটি 'পক্ষিরাজ ঘোড়া যদি হবে—তাহলে ন্যাজ নেই কেন?'

কেন হাসি? হাসি অযৌক্তিকতায়, অসংলগ্নতায়, হাসি অপ্রত্যাশিতের চমকে, হাসি প্রত্যাশার ব্যর্থতায়, হাসি অভাবনীয়ের আবির্ভাবে, হাসি উদ্ভট, কিম্ভূতকে দেখে। হিজিবিজবিজ তেমনি একটি কিম্ভূত—না মানুষ, না বাঁদর, না পেঁচা না ভূত। 'What profit in that ridiculous monstrosity, a marvellous kind of deformed beauty and beautiful deformity?'[৬] গির্জার গায়ে gargoyle প্রভৃতি উৎকীর্ণ করার বিরোধিতা করে প্রশ্ন করেছিলেন St. Bernard। কুমড়োপটাশ, ট্যাঁশগরু, হুঁকোমুখো হ্যাংলা, রামগরুড়ের ছানা প্রভৃতি 'অবস্তু' রচনাতে[৭] সুকুমারের প্রতিভা স্ফূর্তিলাভ করেছে। তিল-তিল করে তিলোত্তমা রচিত না হয়ে 'বিদঘুটে জানোয়ার কিমাকার কিম্ভূত' (কিম্ভূত —"আবোল তাবোল") দেখা দিয়েছে, অথচ মনকে মোহাকৃষ্ট করার ক্ষমতা এদের তিলোত্তমার চেয়ে তিলমাত্র কম নয়।

'গেল গেল নাড়িভুঁড়ি সব ফেটে গেল' বলে হিজিবিজবিজ বেদম হয়ে পড়ছে দেখে বালক তাকে সুবুদ্ধি দিয়েছে—'কেন তুমি এইসব অসম্ভব কথা ভেবে খামখা কষ্ট পাচ্ছ?' উত্তরে সম্ভাব্য বলে 'হিজিবিজবিজ যে ঘটনার কথা উল্লেখ করেছে তা আরো অসম্ভব—'একটি লোক টিকটিকি পোষে। রোজ তাদের খাইয়ে-নাইয়ে শুকোতে দেয়। একদিন একটা রামছাগল এসে সব টিকটিকি খেয়ে ফেলেছে।' হাসি সর্বথা সুখের নয়—রবীন্দ্রনাথ বলেন তা অল্পমাত্রার পীড়া। তবু মানুষ হাসতে চায়।

অ্যালিসের কুইনের মতো ছটি[৮] না হোক তিনটি অসম্ভব জিনিসে বিশ্বাস করেছে যে জীবটি তার পরিচয় প্রসঙ্গে আরেকটি গোড়ার কথা উঠে পড়েছে—তা নামরূপের। বেড়ালের হিসেবের মতো 'মনে করো' দিয়ে শুরু করা গল্পগুলি অবিশ্বাস্য হতে পারে, কিন্তু হিজিবিজবিজ নামটি সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য। মুশকিল এই, একটু বাদেই নিজের নাম বলছে তকাই। এই নামগুলি আবার যৌথ—তাও এলোমেলোভাবে পিতৃকুল, কুটুম্বকুল দুই কুলের অর্থাৎ ব্যক্তিনাম নয়, আবার পদবী হতেও বাধা। 'কতকগুলি কৃত্রিম অযৌক্তিক

ধ্বনির সংযোগে' বিশ্বের যাবতীয় জিনিস অভিধানজাত করা গেছে অথচ 'অভিধা' বা 'নামে'র সঙ্গে নামীর সাদৃশ্য বা সম্পর্ক যে কোথায় তাহা আজ পর্যন্ত কেহ নির্দেশ করিতে পারে নাই।' ("বর্ণমালাতত্ত্ব" —ভাষার অত্যাচার, সুকুমার রায়)। আমাদের মতো নাম আর নামীর সাযুজ্য স্বীকার করে না বলে হিজিবিজবিজের নাম সকালে আলুনারকেল, বিকেলে রামতাড় হয়ে যেতে বাধা নেই। শত অবস্থায় শত রকমের মেজাজের জন্য দেবতাদের মতো আমাদেরও শতনাম থাকবে না কেন? সার্থক নাম রেখেছে হিজিবিজবিজের গল্পের লোকটি। ফস করে প্রয়োজনের সময় খুলে গিয়ে ছাতা রোদবৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচায়, কাজেই তার নাম 'প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব'। কোনো বিচার-বিবেচনা না করে পায়ে-পায়ে নিজেকে পদদলিত হতে দেয় যে জুতো, তার নাম 'অবিমৃষ্যকারিতা' বই কী হবে? গাড়ু কেন 'পরমকল্যাণবরেষু' ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। ভুক্তভোগীমাত্রই জানেন। নামই যে 'fate', তার আরেকটা নিদর্শন : পথের ধারে ইট-কাঠের বোঝা নিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িটা 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' নাম রাখাতেই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। এর প্রত্যেকটি শব্দ বালকটিকে একপদে পরিণত করার সময় শিখতে হয়েছে এবং অনেক দুঃখে এসব বানান রপ্ত করতে হয়েছে। স্বপ্নের মধ্যে বাস্তব এভাবেই দেখা দিয়েছে।

বিশ শতকের আধুনিক বিজ্ঞান সাধারণের কাছে দুর্বোধ। আধুনিক রোমানটিক কাব্যও কম দুর্বোধ ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অস্পষ্টতার অভিযোগ এনেছিলেন—বিশেষ করে "সোনার তরী"র বিরুদ্ধে। শব্দগুলি অচেনা নয় বরং খুবই সহজ—নেড়ার গানের 'নাইনিতালের নতুন আলু'র মতো মুখে মিলিয়ে যায়। মানে বোঝার বেলা স্ফটিকের স্বচ্ছ দেওয়ালে মাথা ঠুকে মরতে হয়। হয়। কালোয়াতি গানের ঢঙে যে পদটি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নেড়া গেয়েছে, তার ভেতরে নূতন কাব্য-নির্মিতির কৌশল লুকিয়ে আছে। এক ইন্দ্রিয়ের ধর্ম অন্য ইন্দ্রিয়ে সঞ্চারিত হয়েছে (synasthesia) গান এবং সুরে অর্থাৎ শব্দে রঙ লেগেছে—চোখে দেখার আর কানে শোনার জিনিসে আরোপিত হয়েছে গন্ধ। পরবর্তী কালে জীবনানন্দ ঘুমের ঘ্রাণ, ঝিঁঝির গন্ধ পেয়েছেন। 'শিখিপাখা'র গানের ছন্দ, কিছু-কিছু শব্দ শুনলে রবীন্দ্রনাথ আর তাঁর অনুকরণকারীদের কথা মনে হয়—যেমন, 'আকাশের কানে-কানে', 'গানে-গানে', 'বাঁকা আলো', 'সাদা কালো', 'সরু মোটা', 'ছলছল'—ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হয়, এ গানের 'নাম জানিনে সুর জানি।' কখনো চিত্ররূপে, কখনো ধ্বনিময়তায়, কখনো বিপরীতের মেলবন্ধনে বিচিত্র কলাপবিস্তারে ভাব জাগানো রোমানটিক কাব্যের কাজ। 'অর্থের' দাবির অঙ্কুশের ঘায়ে পাগল হয়ে রবীন্দ্রনাথ গীতা থেকে "অব্যক্তাদীনি ভূতানি" শ্লোক তুলে যে ব্যাখ্যা 'সোনার তরী' কবিতার দিলেন, তার চেয়ে বেশি অনর্থপাত আর কিছু হতে পারে বলে আমি মনে করি না। ভরা নদীর খরস্রোত, সোনার ধানে ভরা খেত, কালো মেঘে ভরা আকাশের ছবি মিলিয়ে মনে যা জাগিয়ে তুলেছে তা পূর্ণতার মধ্যে অপূর্ণতার বেদনা। এর ব্যঞ্জনা আভিধানিক অর্থকে ছাপিয়ে যায়। সাত দুগুণে চোদ্দ অর্থাৎ অঙ্কের সোজা হিসাব কবিতাতে খাটে না—ফলশ্রুতির হিসাবে তা ষোলো আনা। অপর্ণা-জয়সিংহের কথোপকথনে এ কবিতার ভাব কিছুটা ধরা পড়েছে মনে হয়।

জয় । জান কি একেলা কারে বলে?
অপর্ণা। জানি, যবে বসে আছি ভরা মনে—
দিতে চাই, নিতে কেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথের অনুকরণকারীরা তাঁর ভাষাকে তখন "বুলি" (cliche) বানিয়ে তুলেছেন। নেড়ার গানে সে ইঙ্গিত নেই তা বলতে পারি না। অস্পষ্টতার অভিযোগ যারা এনেছে তাদের চেয়ে ভয়াবহ কাব্যের ব্যাখ্যাতা আর বোদ্ধারা। 'শিশিবোতলে'র জায়গাটা

ছাড়া কিছুই তাদের শক্ত ঠেকে না।

আরো একটা কথা—এই বইটির অনামা নায়ক 'আমি'—নাম নয় সর্বনাম - একা বাদী প্রতিবাদী দুইই। নিজের সৃষ্ট স্বপ্নজগতের বিরুদ্ধে পদে-পদে প্রতিবাদ জানিয়ে চলেছে। অ্যালিসের ক্ষেত্রেও তাই। এতক্ষণ "হ-য-ব-র-ল"র পেছনে তত্ত্ব এবং তথ্যানুসন্ধান যা চলল সুকুমার তাকে বলবেন 'ছায়াবাজি'।[৪] এতক্ষণে আমার শুধু নয় পাঠকদেরও গা ব্যথা হবার উপক্রম হয়েছে। 'Everything has got a moral, if you can find it' ("Alice in wonderland", ch. 9)। "হ-য-ব-র-ল"র moral যদি বার করতেই হয় সংক্ষেপে তা হল ড. জনসনের ভাষায়—Clear your *mind* of Cant. (Boswells *life*, Vol. iv, p. 22, 15 May 1783).

টীকাপঞ্জী

(ক) 'আমি বললাম, সেকি, পটলার ওজনই তো একুশ সের, সে আমার চাইতে দেড় বছরের ছোট'। (হ-য-ব-র-ল)

ভারতে আমরা স্বনামে নয়—কারো দাদা, কাকা, মা, বাবা হিসাবে খ্যাত। 'আমি' পটলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রত্যয়িত হয়েছে।

(খ) মহাভারতে কোন্‌খানে আছে দেখিয়ে দিতে বললে পারব না। পরিব্রাজক শ্রদ্ধেয় শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মুখে শোনা।

(গ) বৃক্ষ ও বীজ, দুধ ও দই এক কিনা এ প্রশ্ন উঠেছে ক্ষণবাদী বৌদ্ধদের 'মিলিন্দ পন্‌হ'-তে।

(ঘ) 'এই বর্তমান যুগে দৈববাদের এক নূতন আশ্রয় জুটিয়াছে, তাহার নাম বিজ্ঞান।···এই বৈজ্ঞানিক অদৃষ্টবাদ কার্যকারণের সকল সম্বন্ধকে অঙ্কের হিসাবে মিলাইয়া দেখায় যে প্রত্যেক কার্য, প্রকারে ও পরিমাণে, উপযুক্ত কারণ হইতে প্রসূত।' (দৈবেন দেয়ম্—"বর্ণমালা-তত্ত্ব"—সুকুমার রায়)

(ঙ) বিশ্বরহস্যের ভাষাকারদের আর পদার্থবিদ্যা নিয়ে কয়েকটি কৌতুকজনক ছড়া উদ্ধৃত করছি :

১. Nature, and Nature's laws,
lay hid in night,
God said, Let Newton be !
and there was light Einstien.
—Alexander Pope

২. It did not last : the Devil Rowling Ho,
Let Einstien be, restored the status quo.
— J. C. Squire
(*Comic Verse*, Faber, p. 341)

৩. I have learnt something new
about matter
As my speed was so great
Much increased was my weight
Yet I failed to become any father,
—Anond.

৪. There was a young fellow
from Trinity
Who took $\sqrt{\omega}$
But the number of the digits
Gave him the fidgets
He dropped Maths and took up divinity.
Anond.

(চ) মা আর দিদির মুখে be´be´ square ও be´be´ prime-এর আলোচনা শুনে ইভ ক্যুরি ওইসব "be´ be´" (অর্থাৎ শিশু) সম্পর্কে অনেক জল্পনা-কল্পনা করেছিলেন—গাণিতিক সঙ্কেত বলে ধরতে পারেন নি। ধারাপাতকে অঙ্করূপে না দেখে চিত্ররূপে দেখলে সংখ্যাগুলি সারি-সারি নিমন্ত্রণ খেতে বসেছে মনে হওয়া শিশুর পক্ষে আশ্চর্য নয়।

(ছ) আরিস্তোতলের মতে (*Poetics*, 5 1) যা হাস্যকর (laughable) তা কুরূপ বা অসুন্দর (ugly)-এরই অঙ্গ। যেহেতু তা কর্মেডির বিষয়বস্তু। তা অবশ্যই চারুকলার (fine art) অন্তর্ভুক্ত এবং তার মূলে আছে সৌন্দর্য (the beautiful)। এই কথাটি অযুক্ত, কিন্তু অনুমেয়। আরিস্তোতল অবশ্যই বারবার

বলেছেন যা অনুকৃতির (imitation-এর) বিষয়বস্তু তা অপ্রীতিকর হলেও শিল্পকৃতিতে আনন্দদায়ক (দ্র *Poetics*, 4)। এই আনন্দের উৎস বিষয়-বস্তুটি নয়, সেটিকে চিনতে পারা। কুরূপের রূপবোধ, বুদ্ধি দ্বারা তাকে গ্রহণই প্রীতি-উৎপাদক। দ্র: Bosanquet, *History of Aesthetic*, London, 1892, পৃ ৫৯।

(জ) রম্যং জুগুপ্সিতম্ উদারম্ অথবা নীচম্
উগ্রং প্রসাদি গহনং বিকৃতং চ বস্তু।
যদ্ বাপ্যবস্তু, কবিভাবক-ভাব্যমানং
তন্নাস্তি যন্ন রসভাবম্ উপৈতি লোকে॥
—দশরূপক, ৪।৮৫

(রম্য, জুগুপ্সিত, উদার কিংবা নীচ, উগ্র, চিত্ত-প্রসাদকর, গহন অথবা বিকৃত যে সকল বস্তু, এমন কি অবস্তু—এরূপ কিছুই নাই, কবির ভাবনাশক্তি দ্বারা ভাব্যমান হইলে যাহা লোকে রসভাব প্রাপ্ত না হয়।

অনুবাদ : সুধীরকুমার দাসগুপ্ত—"কাব্যালোক")

যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ থেকে 'অবস্ত' যোগে কাব্যের যে উদাহরণ তোলা হয়েছে

'কূর্মলোমপটাচ্ছন্নঃ শশশৃঙ্গধনুর্ধরঃ।
এষ বন্ধ্যাসুতং যাতি অপুষ্পং কৃতশেখরঃ।'

তার তুলনায় সুকুমারের 'অবস্ত' রচনা কত উচ্চস্তরের রসিক মাত্রেই বুঝবেন। এই 'অবস্ত' রচনা প্রতিভা দুর্লভ।

(ঝ) "Why, sometimes I've believed as
many as
Six impossible things before breakfast."
(Queen in *Through the Looking Glass*)

(ঞ) আজগুবি নয়, আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা
ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে গাত্র হল ব্যথা।
(ছায়াবাজি—আবোলতাবোল)

প্রসঙ্গ : মন ও মস্তিষ্ক—ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে

দেবব্রত ঘোষ

ফিনিয়াস গেজের সত্যকাহিনী ...

একটি বিশালাকৃতি লৌহশলাকা তীরবেগে ছিটকে এসে ফিনিয়াস গেজের মুখমণ্ডলে আঘাত করে। আঘাত বললে অবশ্য কম বলা হয়। এক গজেরও বেশি লম্বা রীতিমতো ভারী লোহার দণ্ডটি তাঁর বাম চোখের নীচ দিয়ে প্রবেশ করে মগজ ফুঁড়ে প্রায় ব্রহ্মতালু দিয়ে বেরিয়ে যায়। ফলে, গেজ মাটিতে ধরাশায়ী। প্রথমে তার হাতে-পায়ে অসম্ভব খিঁচুনি হতে থাকে, এবং তারপর সে অচেতন হয়ে পড়ে। আশ্চর্য, গেজ কিন্তু মারা গেল না! বরং, ধীরে-ধীরে সে জ্ঞান ফিরে পায়। এবং, আরো অবাক করে দিয়ে সে কিছু সময় পরে কথাও বলতে শুরু করে। ছাকরা-জাতীয় গাড়িতে চড়ে সে অন্যান্যদের সামান্য সাহায্য নিয়ে বেশ কিছু দূরে ডাক্তারখানায় পৌঁছায়, এবং সিঁড়ি ভেঙে উঠে ডাক্তারের কাছে উপস্থিত হয়। দিনটা—১৩ সেপটেমবর ১৮৪৮। স্থান—নিউ ইংল্যানড। গেজের বয়স তখন পঁচিশ বছর। এই ঘটনার পর অবশ্য তার বেশ কিছুদিন চিকিৎসা চলে, বিশেষত ক্ষতদূষণ, শারীরিক দুর্বলতা, রক্তাল্পতা ইত্যাদির জন্য। তা ছাড়া, ফিনিয়াসের জ্ঞান-গম্যি, কথাবার্তা, স্মৃতি, কল্পনাশক্তি ইত্যাদি মোটের উপর ভালোই ছিল। নভেমবর মাসের মাঝামাঝি থেকে এমনিতে সুস্থ ফিনিয়াস গেজ তার নতুন ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু করে। এইটেই এ গল্পের চমকপ্রদ অংশ। ফিনিয়াস গেজের নতুন ভবিষ্যৎ! কেননা, এই গেজ একেবারে অন্য মানুষ। দক্ষ-কর্মক্ষম, সহান্য-উদার, বন্ধু মেজাজের গেজকে সরিয়ে এসেছে বালখিল্যতা, বুনো স্বভাব আর বদরাগি মেজাজ। শারীরিকভাবে গেজ সামলে উঠলেও, বেমালুম পালটে গেছে তার মন। ফলে, পরিচিত বন্ধুবান্ধব, সবাইয়ের কাছেই সে হয়ে দাঁড়াল এক অন্য মানুষ। এরপর, গেজ আমেরিকারই এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরতে থাকে—নিজেকে এবং সেই অভিশপ্ত লৌহদণ্ডটি প্রদর্শন করিয়ে। এমনিভাবে ঘুরতে-ঘুরতে ফিনিয়াস গেজ অবশেষে সানফ্রান্সিসকোয় পৌঁছায় এবং সেখানেই সে মারা যায়।

ফিনিয়াস গেজের এই সত্যি গল্পটি শুনিয়েছেন কেমব্রিজের প্রখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ অধ্যাপক কলিন ব্লেকমোর। আর গল্পটির সারাংসার হল—হৃদ্‌বৃত্তি, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত হয় মগজের নির্ধারিত অংশ-বিশেষের কার্য, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিবর্তের ফলে। আজকের দিনে এটি কোনো নতুন তথ্য বা তত্ত্ব নয়। এমনকী ১৮৪৮-এও এসব কথা মোটের উপর জানা ছিল। প্রশ্ন সেখানেই। কত আগে থেকে মানুষের এসব ধারণায় ছিল?

যদিও হিপোক্রেটিস এবং ...

বেশির ভাগ গবেষক এবং ঐতিহাসিক একমত যে এই ব্যাপারে মূল কৃতিত্বের দাবিদার—হিপোক্রেটিস। কারো-কারো মতানুসারে, হিপোক্রেটিক গোষ্ঠী। সত্যিই, তাঁরা খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০ বছর আগে যে ধারণা আর তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করে গেছেন তা সে সময়ের তুলনায় একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির এবং আশ্চর্যভাবে, আধুনিক ধারণার লাগসই। তাঁদের মতে—মস্তিষ্ক এবং একমাত্র মস্তিষ্কই হল উৎসকেন্দ্র যেখানে নিয়ন্ত্রিত হয়, সংশ্লেষিত হয় আনন্দ আর কষ্ট, সুখ আর দুঃখ, হাসি আর কান্না, সুন্দর আর অসুন্দরের নন্দনচেতনা। অধিকন্তু, আমাদের যাবতীয় যুক্তিপ্রয়াস, বুদ্ধিবৃত্তি, ধ্যান-ধারণা এবং অনুভূতির তারতম্য সমস্তই মস্তিষ্ক-জাত। হিপোক্রেটিক গোষ্ঠী এইসব কথা যখন বলে-ছিলেন, তখন মূল বিতর্কটা এ ছিল না যে মনের একটা শারীরিক উৎসকেন্দ্র আছে কিনা! বরং, প্রশ্নটা ছিল—সেটা কোথায়! যার কোনো পরিষ্কার চূড়ান্ত উত্তর জানা ছিল না সে সময়ে। এবং, তখন হিপো-ক্রেটিসের বক্তব্য একেবারে অভিনব।

পরে প্লেটোও (খ্রীষ্টপূর্ব ৪২৭-৩৪৭) মস্তিষ্ককে দেহের সর্বাধিক সম্পন্ন আর স্বর্গীয় অংশ বলেছেন। বলেছেন, আধ্যাত্মিক সত্তা এবং জ্ঞানবৃত্তির আধার হল মস্তিষ্ক। কিন্তু, সে কোনো বৈজ্ঞানিক অভি-নিবেশের ফলে তিনি বলেন নি। বরং, তাঁর এই ধারণা এসেছিল—তাঁর নিজস্ব সমাজ-রাজনৈতিক তথ্য-ব্যাখ্যার তত্ত্বের আধার (paradigm) থেকে। বাস্তবিক, প্লেটো পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ-ভিত্তিক বিজ্ঞান-চর্চাকে কার্যকর বলে মনে করতেন না। তবু তিনি লক্ষ করেছিলেন মস্তিষ্ককোষ এবং পুরুষবীর্যের মধ্যে (আপাত!) সাদৃশ্য। পুরুষ-প্রাধান্যের ধারণা থেকে উদ্ভমাংশ হিসাবে প্লেটোর তাই মস্তিষ্কের ধারণা। অবশ্য এটি তাঁর অনেক যুক্তির একটি।

তারও পর অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রীপূ)। তিনি বললেন—চেতনা এবং প্রাণের চালিকা হল হৃৎপিণ্ড। হিপোক্রেটিসের পরে এসেও মগজ আর চেতনার কার্যকারণসম্পর্ক অ্যারিস্টটলের কাছে অধরাই থেকে গেল। কারণ, উন্মুক্ত মস্তিষ্কে তিনি কোনো উদ্দীপনা বা সাড়া দেখতে পান নি। অথচ, হৃৎপিণ্ডের গতিময়তা এবং তার ফলে রক্তপ্রবাহ তাঁর অভিনিবেশে ধরা পড়েছিল। ফলত, পরবর্তী কালে—প্লেটোনিক ধারণা, অ্যারিস্টটলীয় পর্যবেক্ষণ আর বাইবেলের নির্দেশ—এ সবকিছুর মিশ্রণ গালেনের (খ্রীষ্টাব্দ ১৩১-২০০) মস্তিষ্কবর্ণনার আধারে একটি চমকপ্রদ তত্ত্বের জন্ম দিয়েছিল।

সেই অর্থে—হিপোক্রেটিসই প্রথম দিশারি যিনি পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রকে হৃৎকেন্দ্রিকতার (cardiocentric) পরিবর্তে শিরোকেন্দ্রিকতার (encephulocentric) বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড় করিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও, হিপোক্রেটিস বা তাঁর গোষ্ঠীই মস্তিষ্কের গুরুত্ব প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন—তা নয়। তা সন্ধানের জন্য আমাদের আরো পিছনের দিকে তাকাতে হবে। এ প্রসঙ্গে দুটি কথা বলার আছে। হিপোক্রেটিসের কিছুটা পূর্ববর্তী ছিলেন অ্যলক্মেয়ন। প্রায় ৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব। তিনি

ছিলেন আদপে পিথাগোরাসের ছাত্র। তিনি মনে করতেন—হৃদ্‌যন্ত্র নয়, অনুভূতি এবং বুদ্ধিবৃত্তির আধার হল মস্তিষ্ক। দ্বিতীয় কথাটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডুগলাস গুথ্রির ভাষায়—'কেমন করে গ্রীক চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্মেষ ঘটল এবং তা বিকশিত হতে স্বর্ণময় হিপোক্রেটিক যুগের অভ্যুত্থান ঘটল—তা একটি চমকপ্রদ অধ্যায়।…এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে 'Babylonia and Egypt, and even Persia and India, handed on to Greece the torch of learning....'।

তবু আরও পিছনে, কিন্তু…

হিপোক্রেটিসের জন্মকাল সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব ৪৬০। এশিয়া মাইনরের লাগোয়া একটি ছোটো দ্বীপে। তার থেকেও প্রাচীনতর মানুষের সভ্যতার ইতিহাস আমরা মোটামুটি জানলেও, বিশেষ প্রশ্নটি প্রসঙ্গে সরাসরি লিখিত বা সাক্ষ্যতথ্য খুব প্রতুল নয়। আরো একটি জরুরি কথা হল—যে-কোনো নতুন ভাবনা বা ধারণা শুরুতে খানিকটা আদো-আদো, গোল-গোল থাকে, তাতে সূক্ষ্মতার অভাব থাকতে পারে। কিন্তু, মৌলিকত্বের সম্মান তাতে তার কম পাওয়া উচিত নয়। দার্শনিক রাসেলের ভাষায়—Beginnings are apt to be crude, but their originality should not be overlooked on this account—ভুলে গেলে চলবে না যে কোনো সৃজনাত্মক প্রকল্পের বা বিকল্প দর্শনের শুরুই হচ্ছে তার কঠিন পর্ব। উপরন্তু, কোনো একটি নতুন ধারণা সমাজ গ্রহণ করতে কিছু সময় নেয়। এই 'সময় নেওয়া' কথাটার অবশ্য একটা আপেক্ষিকতা আছে। সে সাধারণত, বেশ কিছুটা সময় নেয় বিশেষ করে যদি তা প্রচলিত ভাবনা-ধারণার অনুসারী বা পরিপূরক, অথবা অন্তত পরোক্ষ উপজাতও না হয়। এই দ্বিধা-দোদুল্যমানতার ফাঁকে প্রাচীন সভ্যতার মানবের কত ধ্যান-ধারণা হয়তো হারিয়ে গেছে। কিন্তু, এখন আমরা একটি বিশেষ প্রসঙ্গে ইতিহাসের পাতা নাড়াচাড়া করছি : মানুষ কখন প্রথম ধারণা করেছিল, ভেবেছিল বা চর্চা করেছিল মস্তিষ্কের গুরুত্ব—এমনকী মানসিক ক্রিয়াকাণ্ডের পিছনেও॥—

প্রাচীন সভ্যতায়…

প্রাচীন সুমেরীয়, হিন্দু বা ব্যাবিলনীয় সভ্যতার মানুষেরা এ ব্যাপারে কী ভাবত—তা খুব একটা জানা যায় না। খুব সম্ভবত তাঁদের এ ধারণা ছিল যে মনেরও একটা বাস্তব দৈহিক অবস্থান আছে, কিন্তু তা কোথায় সে সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা তাঁদের ছিল না। প্রাচীন ঈজিপ্ট আর আসিরীয় সভ্যতার মানুষেরা মনে করতেন স্পিরিট-এর অবস্থান যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড বা অন্ত্রে। কারণটা পরিষ্কার। এই দেহাংশগুলির উল্লেখযোগ্য, আপেক্ষিক আয়তন, ভর, গতিময়তা এবং কার্যশীলতা খুব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাস্তবিক, আমরা আগেই দেখেছি, খ্রীষ্টোত্তর কালেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত মনে করা হত যে স্বাভাবিক শক্তি (natural spirit) আর প্রাণশক্তি (vital spirit) ওই দেহাংশগুলিতেই উৎপন্ন এবং কেন্দ্রীভূত হয়। এই স্পিরিট কথাটি অবশ্যই অনেক অর্থে আর তাৎপর্যে ব্যবহৃত হত। যেমন, প্রাচীন ঈজিপ্ট প্যাপিরাসে নানা স্পিরিট-এর সংজ্ঞার্থ পাওয়া যায়, যার মধ্যে Ka-, Ba-, Khu- আর Sekhem-ইত্যাকার স্পিরিট-এর রূপভেদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন সুমেরীয় গাথা বা ইস্রায়েলী ঈশ্বরবন্দনায় বলা হয়েছে : 'তব (ঈশ্বর) উদ্দেশে আমার যকৃতে প্রশস্তিসংগীত গীত হবে নিরন্তর।' এর মানে কোনো-কোনো গবেষক করেছেন যে এঁরা বিশ্বাস করতেন আধ্যাত্মিক মনস্কতার উৎসস্থল হল যকৃৎ।

পাশ্চাত্য গবেষকরা অন্য উদাহরণও দেন। প্রাচীন ঈজিপটীয় চিকিৎসকরা মৃতদেহ মামি করার জন্য

প্রথমেই তাড়াতাড়ি মগজের নরম অংশ নাসারন্ধ্রের মধ্য দিয়ে শলাকার সাহায্যে নিষ্কাশন করে নিতেন। অথচ, হৃৎপিণ্ড সংরক্ষণ করা হত। অর্থাৎ, ঈজিপ্ট-বাসীরা খুব সম্ভবত মস্তিষ্ককে কোনো গুরুত্বপূর্ণ দেহাংশ বলে মনে করত না। এটিও একটি অনুমান মাত্র! হেরোডোটাসের সুবিবরণ অনুযায়ী ঈজিপ্টে মূলত তিনরকমভাবে মৃতদেহের মামি করা হত। তার মধ্যে—প্রথম দুটি পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত কম খরচের এবং কম মুন্সিয়ানার। তাতে হয় মৃতদেহের অভ্যন্তরে সেডারউড তেল (cedar-wood oil) জাতীয় সংরক্ষক ঢুকিয়ে, নতুবা লবণের সাহায্যে আচার করার মতো করে, পরে উত্তাপপ্রয়োগে দেহ শুষ্ক করে মামি করা হত। তৃতীয় যে পদ্ধতির কথা আমরা বিশেষ জানি সেটি ছিল যথেষ্ট খরচ-সাপেক্ষ। তাতে দরকার হত দেহের ভিতরে এবং বাইরে নানা রকমের মূল্যবান সংরক্ষকের প্রলেপ। ভিসেরা বাদ যেত, নতুবা বাইরে এনে সংরক্ষক রাসায়নিকে সিক্ত করে, মলম-প্রলিপ্ত মোড়কে আবৃত করে আবার দেহের অভ্যন্তরে ফেরত রাখা হত। কিন্তু, মস্তিষ্ক প্রথমেই ধাতব আঁকশি-জাতীয় কিছুর সাহায্যে বার করে নিয়ে, পরে খুলির অভ্যন্তর ভালোভাবে সংরক্ষক দ্রবণে ধুয়ে নেওয়া হত। এমনটি কি হতে পারে না যে, মগজ নিষ্কাশন ঈজিপ্টবাসীরা এইজন্য করত যে মস্তিষ্কসংরক্ষণের কলা-কৌশল তাঁদের অজানা ছিল। অথবা, এমন ধারণা যে, 'মুড়োর দিক থেকেই খারাপ হয় প্রথম।' ঠিকই, এটিও একটি বিকল্প অনুমান মাত্র! বাস্তবিক, Papyrus of Ani মোতাবেক মানুষের Ba-Spirit বা আত্মা বা সত্তার তুল্য অর্থে ব্যবহৃত হত—সেই Ba-Spirit-এর অবস্থান হৃদ্‌যন্ত্রে।

তবু ও স্মিথ প্যাপিরাস
অন্য কিছু বলে…

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েনটাল ইনস্টিটিউটের জেমস ব্রেস্টেড একটি প্যাপিরাসের লিপি উদ্ধার করেছেন। আবিষ্কর্তার নামানুসারে প্যাপিরাসটির নাম এডুইন স্মিথ প্যাপিরাস। এর মূল প্যাপিরাসটি খুব সম্ভবত ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বে লেখা। এতে মাথায় আঘাতজনিত বেশ কিছু ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এই বিশেষ প্যাপিরাসটির বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন। ঐতিহাসিক গুথ্রির কথায় তা ধরা পড়ে : 'বাস্তবিক, ঈজিপটীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের মান তাঁদের সাংস্কৃতিক মানের তুলনায় খানিকটা নীচু বলেই মনে করা হত। কিন্তু কয়েক বছর আগে, অন্য আরেকটি প্যাপিরাসের অনুবাদ থেকে অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি যুক্তিসিদ্ধ এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া গেছে। তার নাম এডুইন স্মিথ প্যাপিরাস…!'

সেই প্যাপিরাসে উল্লিখিত একটি বিশেষ ঘটনায় দেখা যায় যে, মাথায় আঘাতের ফলে হাতেপায়ের সঞ্চারণশীলতা অযথাযথ হয়ে পড়ে এবং দৃষ্টিতে গোলযোগ দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে প্রতিবেদক উক্ত তথ্যটি বারবার বলেছেন—যে এই-জাতীয় সমস্যাগুলি শুধুমাত্র মাথার খুলিতে আঘাতের ফলে হয়েছিল। নিঃসন্দেহে, এইভাবে বারে-বারে উল্লেখ করে প্রতিবেদক বিষটির উপর গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। কিন্তু কী? তাঁর বিস্ময়, না এই অভিজ্ঞতার মূল তাৎপর্য? মনে রাখা দরকার যে, এই প্যাপিরাসের অন্যত্র, খুলির নীচে মস্তিষ্কের কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। পাওয়া যায় এই ধারণা যে মস্তিষ্ক নানা অনুভূতি, কথা বলা, চলা-ফেরা ইত্যাকার ক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। এ প্রসঙ্গে কোনো-কোনো গবেষক-ঐতিহাসিক পরামর্শ দিয়েছেন যে, এইজাতীয় টুকরা-টাকরা লিখিত ঘটনাবলীকে অতিরিক্ত ব্যাখ্যা না দেওয়াই ভালো। যথার্থ পরামর্শ। কিন্তু, সঠিক ব্যাখ্যা যদি না জানা থাকে, তবে কোন্‌টা অতিরিক্ত আর কোন্‌টা যথার্থের থেকে কম হল—সে কিসের ভিত্তিতে ঠিক হবে! রাসেলের সতর্কবাণীটি বোধহয় আরেকবার মনে করা যেতে পারে—'Beginnings

are apt to be crude, but their originality should not be overlooked on this account…', এবং সে হবার সম্ভাবনা খুবই বেশি যদি তা আবার ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বের ঘটনা হয়।

এবং একটি ঘোরতর বিস্ময়:
প্রাগৈতিহাসিক ট্রেফাইনিং…

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রাচীনতম শল্য-চিকিৎসার অন্যতম হল ট্রেফাইনিং (trephining)। মাথার খুলির উপর ছেঁদা করা। এযাবৎকালীন প্রাপ্ত, অনেকগুলি প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মাথার খুলিতে ট্রেফাইনিং-এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। তা থেকে এটা পরিষ্কার যে প্রাগৈতিহাসিক শল্যচিকিৎসক এই কাজটিতে যথেষ্ট দক্ষতা আয়ত্ত করেছিলেন। বলা বাহুল্য, সেই সময়ের মানুষের কাছে এটি একটি রীতিমত বিপজ্জনক চিকিসাপদ্ধতি ছিল, এবং মৃত্যুর সম্ভাবনাও ছিল প্রচুর। এটিকে চূড়ান্ত বিচারে আমরা একটি চিকিৎসাপদ্ধতিই বলব, তা সে ritual হিসাবে বা magical rites-এ ব্যবহৃত হলেও। কেন এই ট্রেফাইনিং করা হত? প্রাগৈতিহাসিক মানুষ খুব সম্ভবত ব্যাধি বা অসুস্থতাকে মনে করত 'শয়তানে বা দানোয় পাওয়া'। মাথার খুলিতে ছেঁদা করে সেই অশুভ শক্তিকে তাড়িয়ে দেবার প্রয়াস। মাথায় আঘাতজনিত অসুস্থতা ছাড়াও তড়কা, মানসিক ব্যাধি, মস্তিষ্কের টিউমার ইত্যাকার রোগেও প্রাগৈতিহাসিক কালে ট্রেফাইনিং করা হত বলে মনে করা হয়। বুঝতে অসুবিধা হয় না এইজাতীয় রোগগুলির লক্ষণকে 'দানোয় পাওয়া' বা 'শয়তানের কারবার' বলে মনে হতেই পারে। প্রাগৈতিহাসিক ট্রেফাইনিং নিয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক সু-দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। কিন্তু, একটি প্রাথমিক আর সরল প্রশ্ন বিশেষভাবে অনুল্লেখিত থেকে গেছে। সেটা হল এই যে কেন মাথার খুলিতে ছেঁদা করত প্রাগৈতিহাসিক মানুষেরা, অত ঝুঁকি নিয়েও? যুক্তিটা কী? যদি আত্মা হৃৎপিণ্ডে বা যকৃত, প্লীহা বা অন্যে স্থিত, তবে তো দানো সেই জায়গাগুলিতেই 'কব্জা' করবে। তাহলে নব-প্রস্তর যুগের শল্য-চিকিৎসকটি মাথার খুলিতে ট্রেফানিং করে কেন? মন ব্যাধি বা তড়কায়? সে তো বরং হৃৎপিণ্ডে বা যকৃতে নিরাময় সন্ধান করবে, বা যেখান থেকে 'দানো নিকাশে' সচেষ্ট হবে। কেন তাহলে প্যাপিরাসের প্রতিবেদক চিকিৎসকটি পরিষ্কার এবং বারংবার উল্লেখ করেন—মাথায় আঘাতের ফলে ব্যক্তি বিশেষের মূক হয়ে যাবার ঘটনাটি!

* * *

ফলে এ সম্ভাবনা থেকেই যায় যে মন-ব্যক্তিত্ব-সত্তার প্রশ্নে মস্তিষ্কের ক্রিয়াশীলতার গুরুত্ব অন্তত কিছু মানুষের ধারণাতে ছিল, এমনকী প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই, হয়তো ভাসাভাসা ভাবে। হিপোক্রেটিস তাকে বৈজ্ঞানিক বস্তুমুখিতার শক্ত জমিতে দাঁড় করিয়েছেন: একটা ধারণাকে জ্ঞানে রূপান্তর ঘটিয়েছেন। ইতিহাসের এই অধ্যায়টি ঐতিহাসিক-গবেষক-বিজ্ঞানীর গভীরতর অন্বেষণের অপেক্ষা রাখে॥—

গ্রন্থপঞ্জী

১. Hone, J. F. (1894) : *Trephining in its Ancient and Modern Aspects.*
২. Singer, C. (1931) : *A Short History of Biology.*
৩. Guthric, D. (1960) : *A History of Medicine.*
৪. Bernal, J. D. (1971) : *Science in History.*
৫. Meyer, A. (1971) : *Historical Aspects of Cerebral Anatomy.*
৬. Blakemore, C. (1977) : *Mechanics of the Mind.*

চীফের নিমন্ত্রণ

ভীষ্ম সাহনী

আজ মি. শামনাথের বাড়িতে অফিসের চীফের নিমন্ত্রণ।

শামনাথ আর তাঁর বউয়ের ঘাম মোছারও সময় নেই। বউ কোনোমতে ড্রেসিং গাউন পরে, অগোছালো চুল বেঁধে আর শুকনো মুখে সামান্য পাউডার লাগিয়ে সকাল থেকে কাজ করে চলেছেন—আর মি. শামনাথ তো একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে, জিনিস-পত্রের ফর্দ হাতে নিয়ে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে ছোটাছুটি করছেন।

শেষ পর্যন্ত বিকেল পাঁচটার দিকে সব কাজ মোটামুটি সারা হয়ে গেল। চেয়ার, টেবিল, শতরনজি, ন্যাপকিন, ফুল—সবকিছুই বারান্দায় সাজানো হয়ে গেল। ড্রিঙ্কসের ব্যবস্থা হল ড্রইং রুমে। আর যখন ঘরের অনাবশ্যক জিনিসপত্র আলমারির পেছনে, নয়তো খাটের নীচে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে তখুনি শামনাথের সামনে একটা সমস্যা উপস্থিত হল—মায়ের কী ব্যবস্থা হবে?

ব্যাপারটা আগে তাঁর বা তাঁর সুদক্ষ গৃহিণীর মাথায় আসে নি। শামনাথ শ্রীমতীর দিকে ঘুরে ইংরেজিতে বললেন, 'মায়ের কী ব্যবস্থা হবে?'

শ্রীমতী কাজ করতে-করতে থমকে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, 'ওনাকে ওঁর বান্ধবীর বাড়িতে পাঠিয়ে দাও না! আজ রাতটা না হয় সেখানেই থাকবেন। কাল সকালে ফিরে আসবেন।'

শামনাথ সিগারেট মুখে নিয়ে আড়চোখে শ্রীমতীর দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপর মাথা নেড়ে বললেন, 'না, আমি চাই না, ওখানে আবার বুড়িটার যাতায়াত শুরু হোক। সেবার অনেক কষ্টে যাতায়াত বন্ধ করেছি। বরং মাকে গিয়ে বলো, তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে সন্ধ্যার মধ্যেই নিজের ঘরে চলে যান। অতিথিরা আটটার দিকে আসবে, তার আগেই মা নিজের সব কাজকর্ম সেরে নিন।'

উত্তম প্রস্তাব। উভয়েরই পছন্দ হল। কিন্তু শ্রীমতী হঠাৎ বলে উঠলেন, 'উনি যদি ঘুমিয়ে পড়েন আর যদি ঘুমের ঘোরে নাক ডাকতে শুরু করে দেন, তবে কী হবে? পাশেই তো বারান্দা, সেখানে খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছি।'

'তাহলে মাকে বলে দেব যাতে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। আমি বাইরে তালা লাগিয়ে দেব। না হয় মাকে বলে দেব যে ভিতরে গিয়ে যেন শুয়ে না পড়েন, বসে থাকেন, ঠিক তো।'

'যদি ঘুমিয়েই পড়েন, তাহলে কী হবে? ডিনার কত রাত পর্যন্ত চলবে, কে জানে! এগারোটা পর্যন্ত তো ড্রিঙ্কস্‌ই চলবে।'

শামনাথ হাত ঝাড়া দিয়ে রেগে বললেন, 'মা ভালোয়-ভালোয় ভাইয়ের কাছে চলে যাচ্ছিলেন। তা না, তুমি নিজে ভালোমানুষ সাজার জন্য মাঝখান থেকে ব্যাগড়া দিলে।'

'বা রে! তোমাদের মা-ছেলের মধ্যে আমি অপ্রিয় হতে যাব কেন? সে তুমি জান, আর মা জানেন…।'

মি. শামনাথ অগত্যা চুপ করে গেলেন। এটা ঝগড়া-ঝাঁটি করার সময় না, সমস্যার একটা সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। ওঁরা ঘুরে দাঁড়িয়ে মায়ের দিকে তাকালেন। মায়ের ঘরের দরজাটা বারান্দার দিকে। সেদিকে তাকিয়ে ঝট করে বললেন, 'একটা বুদ্ধি পেয়েছি', আর ছুটে গিয়ে মায়ের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। মা দেয়ালের সঙ্গে লাগানো একটা চৌকিতে বসে, দোপাট্টায় মাথা ঢেকে মালা জপ করছিলেন। সকাল থেকে প্রস্তুতি দেখে-দেখে তাঁর

বুক কাঁপছিল। ছেলের অফিসের বড়ো সাহেব আজ বাড়িতে আসছেন। সবকিছু যেন ভালোয়-ভালোয় মিটে যায়।

'মা, তুমি আজ একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে নিও। অতিথিরা সাড়ে সাতটায় আসবেন।'

মা ধীরে-ধীরে মুখের উপর থেকে দোপাট্টা সরিয়ে বললেন, 'আজ আমি কিছু খাব না। তুই তো জানিস, মাছ-মাংস রান্না হলে আমি কিছু খেতে পারি না।'

'যাই হোক, তাহলে নিজের সব কাজগুলো তাড়াতাড়ি সেরে নিও।'

'ঠিক আছে, বাবু।'

'আর শোনো মা, আমরা প্রথমে বৈঠকখানায় বসব। তুমি ততক্ষণ এই বারান্দাতে বসে থেকো। তারপর আমরা এখানে চলে এলে, তুমি তখন বাথ-রুমের দিক থেকে সোজা বৈঠকখানায় চলে যাবে, বুঝলে!'

মা অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর অত্যন্ত মৃদু-স্বরে বললেন, 'ঠিক আছে।'

'আর মা, আজ আবার তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পোড়ো না যেন! তোমার তো নাক ডাকার শব্দ অনেকদূর পর্যন্ত শোনা যায়।'

মা অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বললেন, 'তা কী আর করব বাবু! ইচ্ছে করে তো এসব করি না। অসুখ থেকে ওঠার পর আর নাক দিয়ে ঠিকমত শ্বাস নিতে পারি না।'

মি. শামনাথ ব্যবস্থাপনা তো ভালোই করেছেন, তা সত্ত্বেও নিশ্চিত হতে পারছেন না। চীফ যদি হঠাৎ করে এদিকে চলে আসেন, তাহলে কী হবে? আট-দশজন সঙ্গে থাকবেন। দেশী অফিসার, তাদের বউরা—যে কেউ বাথরুমে যেতে পারেন। ক্ষোভে-দুঃখে তাঁর শরীরটা জ্বলতে লাগল। একটা চেয়ার নিয়ে মায়ের ঘরের বাইরে রেখে বললেন, 'শোনো মা, এখানে একটু বোসো তো দেখি।'

মা জপের মালা সামলে, আঁচল ঠিক করে উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে-ধীরে চেয়ারটাতে এসে বসলেন।

'এভাবে নয় মা, পা তুলে বোসো না। এটা খাট না।'

মাপা দুটো নীচে নামিয়ে নিলেন।

'আর দোহাই, খালি পায়ে ঘুরবে না। ওই খড়ম পায়েও হেঁটো না···আমি একদিন তোমার ওই খড়ম দুটো ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দেব।'

মা চুপ করে থাকলেন।

'কোন্ কাপড়টি পরবে মা?'

'বাড়িতে যা আছে তাই পরব, বাবু। না হয় যেটা বলবি, সেটা পরে নিচ্ছি।'

মি. শামনাথ একটা সিগারেট ধরিয়ে ভুরু কুঁচকে মায়ের দিকে তাকিয়ে তাঁর পোশাকের কথা ভাবতে লাগলেন। শামনাথ সবকিছুই নিজের মনের মতো করে চান। বাড়ির সমস্ত ব্যবস্থা তাঁর হাতেই ছিল। ঘরের ঠিক কোথায় হ্যাঙ্গার লাগানো যেতে পারে, বিছানা কোথায় পাতা হবে, কোন্ রঙের পরদা ঝোলানো হবে, শ্রীমতী কোন্ শাড়ি পরবেন, টেবিল কোন্ সাইজের হবে···শামনাথ ভাবছিলেন—চীফের সঙ্গে যদি মায়ের সাক্ষাৎ হয়েই যায়, তাহলে যাতে তাঁকে লজ্জিত না হতে হয়। মা-কে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে বললেন, 'মা, তুমি সাদা সালোয়ার কামিজ পরে নাও···ওটা একটু পরে এসো তো দেখি।'

মা কাপড় পরতে নিজের ঘরে চলে গেলেন। 'মায়ের এই ঝামেলা থাকবেই, কোনো উপায় নেই।' উনি আবার বউকে ইংরাজিতে বললেন, 'কোনো বলার মতো কথা বললে তো ক্ষতি নেই। যদি, কোনো উলটো-পালটা কথা বলে ফেলেন, চীফের যদি খারাপ লাগে, তাহলে সব মজাই মাটি হয়ে যাবে।'

মা সাদা সালোয়ার কামিজ পরে বেরিয়ে এলেন। ছোট্ট-খাটো শরীর সাদা কাপড়ে ঢেকে গেছে,

ধোঁয়াটে দু চোখ। মাথায় সামান্য ক-গাছি চুল, তা আঁচলে ঢাকা পড়েছে। তাঁকে আগের তুলনায় সামান্যই ভালো দেখাচ্ছে।

'বেশ, ঠিক আছে। চুড়ি টুড়ি কিছু থাকলে পরে নাও। তাতে ক্ষতি নেই।'

'চুড়ি কোত্থেকে পাব, বাবু? তুই তো জানিস, সব গয়না তোর পড়াশুনোর পিছনে খরচ হয়েছে।'

শেষের বাক্যটি শামনাথের মনে তীরের মতো বিঁধল। চটে গিয়ে বললেন, 'এ আবার কোন্ কথা তুললে, মা! সোজাসুজি বললেই পার যে গয়না নেই, ব্যস! এর সাথে পড়াশুনোর কী সম্পর্ক? গয়না বেচতে হয়েছে, তা তার বদলে কিছু হয়ে উঠতেও পেরেছি। একেবারে জলে তো যায় নি!··· যতটা দিয়েছিলে, তার দ্বিগুণ ফেরত নিয়ে নিও।'

'আমার জিভ খসে যাক! তোর কাছ থেকে গয়না নেব? মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে গেছে। থাকলে, হাজারবার পরতাম।'

সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। এবার মি. শামনাথকে স্নান করে তৈরি হতে হবে। শ্রীমতী তো অনেক আগেই নিজের ঘরে চলে গেছেন। শামনাথ যেতে-যেতে মাকে আরেকবার বুঝিয়ে বলে গেলেন, 'মা, রোজকার মতো জড়োসড়ো হয়ে বসে থেকো না। সাহেব যদি এদিকে চলে আসেন আর তোমাকে কোনো প্রশ্ন করেন, তাহলে সব কথার ঠিকমতো উত্তর দেবে।'

'আমি তো লেখাপড়া কিছু জানি না। আমি আর কী কথা বলব! তুই বলে দিস, মা নিরক্ষর, কিছু জানে-টানে না।···উনি আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।'

সাতটা বাজার সঙ্গে-সঙ্গেই মায়ের বুক কাঁপতে লাগল। চীফ যদি তাঁর কাছে এসে কিছু জিজ্ঞেস করে বসেন, তাহলে তিনি কী উত্তর দেবেন। ইংরেজদের তো দূর থেকে দেখেই ঘাবড়ে যেতেন, ইনি তো আমেরিকান! কে জানে কী জিজ্ঞেস করে বসবেন! আমি কী বলব? মায়ের ইচ্ছে হল, লুকিয়ে বান্ধবীর বাড়িতে চলে যান। কিন্তু ছেলের আদেশ কিভাবে অমান্য করবেন! তাই চেয়ারে পা ঝুলিয়ে চুপচাপ সেখানেই বসে থাকলেন।

সফল পার্টি তাকেই বলে, যেখানে সাফল্যের সঙ্গে ড্রিঙ্কস পরিবেশিত হয়। শামনাথের পার্টি সাফল্যের চূড়া স্পর্শ করতে লাগল। কোথাও কোনোরকম সঙ্কোচ ছিল না। শামনাথের হুইস্কি সাহেবের পছন্দ হয়েছে। বাড়ির পরদা, সোফা-কভারের ডিজাইন, ঘর সাজানোর ধরন—মেম-সাহেবের সবই ভালো লেগেছে। এর বেশি আর কী চাই! সাহেব তো ড্রিঙ্কসের দ্বিতীয় পর্যায়েই জোকস্ বলতে আরম্ভ করলেন। অফিসে যতটা গম্ভীর হয়ে থাকেন, এখানে উলটে ততটাই বন্ধু হয়ে উঠেছেন। ওদিকে তাঁর স্ত্রী, কালো রঙের গাউন পরে, গলায় মুক্তোর হার ঝুলিয়ে, সেনট ও পাউডারের সুগন্ধে মাখামাখি হয়ে উপস্থিত অন্যান্য মহিলার প্রতিটি কথায় ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাচ্ছেন আর শামনাথের বউয়ের সঙ্গে তো এমনভাবে কথা বলছেন, যেন তাঁর কত কালের পুরনো বান্ধবী!

দেখতে-দেখতে সাড়ে দশটা বেজে গেল। সময় যে কিভাবে কেটে গেল, বোঝাই গেল না।

শেষে সবাই নিজ-নিজ গেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে ডিনার খেতে বেরিয়ে এলেন। আগে-আগে শামনাথ সবাইকে রাস্তা দেখাচ্ছেন, পিছনে চীফ আর অন্যান্য অতিথিরা চলেছেন। বারান্দায় পৌঁছেই শামনাথ হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। চোখে যে দৃশ্য দেখলেন, তাতে তার পা দুটো কাঁপতে লাগল, মুহূর্তের মধ্যেই যেন সমস্ত নেশা ছুটে গেল। বারান্দার সেই ঘরের বাইরে, মা নিজের চেয়ারে আগের মতোই বসে আছেন। আর তাঁর পা-দুটো চেয়ারে তোলা। মাথাটা একবার ডানদিক থেকে বাঁয়ে অন্যবার বাঁদিক থেকে ডাইনে ঝুঁকে যাচ্ছে। মুখ দিয়ে ক্রমাগত নাকডাকার শব্দ বেরিয়ে আসছে। মাথাটা কিছুক্ষণের জন্য

একদিকে কাত হয়ে থেমে গেলে, নাকডাকার শব্দ আরো তীব্র হয়ে উঠছে। আর যে মুহূর্তে ঝাঁকুনি খেয়ে ঘুম ভেঙে যায়, তখন থেকে মাথাটা আবার ডানদিক থেকে বাঁয়ে ঝুঁকে পড়ছে। মাথা থেকে আঁচলটা আগেই সরে গিয়েছিল। মাথার ক-গাছি চুল অবিন্যস্তভাবে ছড়িয়েছিল।

দৃশ্যটা দেখেই শামনাথ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তাঁর ইচ্ছে হল, মাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে সোজা সেই ঘরের ভিতরে ঢুকিয়ে দেন। কিন্তু এখন কিছু করা সম্ভব ছিল না, চীফ এবং অন্যরা পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

মাকে এ অবস্থায় দেখেই দেশী অফিসারদের বউরা হেসে উঠলেন। তখুনি চীফ আস্তে করে বললেন, 'পুওর ডিয়ার!'

শুনে মা শশব্যস্ত হয়ে উঠে বসলেন। সামনে এতগুলো লোককে দেখতে পেয়ে এমন ঘাবড়ে গেলেন যে তাঁর মুখ দিয়ে একটিও কথাও বেরুল না। তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় তুলে দাঁড়িয়েই মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে নিলেন। তাঁর হাত-পা কাঁপতে লাগল।

'মা, তুমি গিয়ে শুয়ে পড়ো। তুমি কেন এত রাত পর্যন্ত জেগে আছ?' শামনাথ কথা কটি বলেই ভয়ে-ভয়ে চীফের মুখের দিকে তাকালেন।

চীফের মুখে হাসি। তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, 'নমস্কার।'

মা ভয়ে-ভয়ে হাত বের করলেন। কিন্তু একটা হাত দোপাট্টার ভিতরে মালা ধরেছিল, অন্যটা বাইরে, তাই ঠিকমতো নমস্কারও করতে পারলেন না। শামনাথ এতেও মনঃক্ষুণ্ণ হলেন।

ইতিমধ্যে চীফ তাঁর ডানহাত মায়ের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন। মা আরো ঘাবড়ে গেলেন।

'মা, হাত মেলাও।'

'কিন্তু কিভাবে হাত মেলাবেন? ডান হাতে তো তো জপের মালা ধরে রেখেছেন। ঘাবড়ে গিয়ে সে বাঁ হাতটাই সাহেবের হাতে রেখে দিলেন। শামনার্থের সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। দেশী অফিসারদের বউরা খিলখিল করে হেসে উঠলেন।

'এভাবে নয় মা, তুমি তো জানই ডান হাত এগিয়ে দিতে হয়। ডান হাতটা মেলাও।'

কিন্তু ততক্ষণে চীফ মায়ের বাঁ হাতটাই বারে-বারে ঝাঁকিয়ে বলছেন, 'হাউ ডু ইউ ডু?'

'বলো মা, আমি ভালো আছি। খুব ভালো আছি।'

মা বিড়বিড় করে কিছু বললেন।

'মা বলছেন "আমি ভালো আছি।" বলো মা "হাউ ডু ইউ ডু?"

মা অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে বললেন, 'হাউ ডুডু···।'

পুনরায় সবাই হেসে উঠলেন।

পরিবেশ হালকা হতে লাগল। কিন্তু সাহেব পরিস্থিতি সামাল দিলেন। সবাই হাসাহাসি করছে। শামনাথের মনের ক্ষোভও কিছুটা কমে এল।

সাহেব এখনো মায়ের হাত ধরে রেখেছিলেন। এদিকে মা ক্রমশ সঙ্কুচিত হচ্ছিলেন। সাহেবের মুখ দিয়ে মদের দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসছিল।

শামনাথ ইংরাজিতে বললেন, 'মা গ্রামের মেয়ে। প্রায় সারাটা জীবন গ্রামেই কাটিয়েছেন। সেজন্যই আপনাকে দেখে লজ্জা পাচ্ছেন।'

কথাটা শুনে সাহেব খুব খুশি হলেন। বললেন, 'তাই নাকি! আমার আবার গ্রামের লোকদের খুব ভালো লাগে। তাহলে তো তোমার মা নিশ্চয় গ্রামের নাচ-গান জানেন?' চীফ খুশিতে মাথা নেড়ে মাকে একদৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন।

'মা, সাহেব কোনো গান শোনাতে বলছেন। যে কোনো পুরনো গান হলেই হবে, তোমার তো অনেক মনে আছে।'

মা ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'কী গান গাইব! আমি কি কোনোদিন গান গেয়েছি?'

'ও মা···। অতিথির অনুরোধ কি কেউ অমান্য

করে না কি! সাহেব এত আগ্রহ করে বলছেন, না গাইলে সাহেব হয়তো খারাপ মনে করবেন।'

'আমি কী গাইব রে! আমার কি কিছু মনে আছে?'

'কোনো একটা ভালো টপ্পা শুনিয়ে দাও না।··· সেই "দোপত্তর অনারা দে"···।'

দেশী অফিসার আর তাদের বউরা প্রস্তাব শুনে করতালি দিলেন। মা করুণ চোখে কখনো ছেলের দিকে তাকাচ্ছেন, কখনো বা বউয়ের দিকে।

ছেলে হঠাৎ গম্ভীরভাবে আদেশের সুরে বলল, 'মা!'

এরপরে আর হ্যাঁ বা না করার প্রশ্নই ওঠে না। মা বসে পড়ে অত্যন্ত ক্ষীণ এবং কাঁপা-কাঁপা গলায় সেকালের একটা বিয়ের গান গাইতে লাগলেন:

হরিয়া নী মায়ে, হরিয়া নী ভেনে
হরিয়া তে ভাগী ভরিয়া হ্যায়।

শুনে দেশী বউরা খিলখিল করে হেসে উঠলেন। তিন পংক্তি গান গেয়েই মা চুপ করে গেলেন। বারান্দা যেন করতালিতে ফেটে পড়ল। সাহেব তো তালি দেওয়া বন্ধই করছেন না দেখে শামনাথের রাগ খুশি আর গর্বে বদলে গেল। মা পার্টিতে নতুন আমেজ এনে দিয়েছেন।

সাহেব তালি থামিয়ে বললেন, 'পানজাবের গ্রামের হস্তশিল্প কী?' শামনাথ খুশিতে অস্থির হয়ে বললেন, 'সে অনেক কিছু, স্যর। আমি আপনাকে একসেট ওসব জিনিস উপহার দেব। দেখে আপনি খুশি হবেন।'

কিন্তু সাহেব মাথা নেড়ে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'না, আমি ঠিক দোকানের জিনিসের কথা বলছি না। বলছিলাম, পানজাবিদের বাড়িতে কী-কী তৈরি হয়, মেয়েরা নিজেরা কী-কী বানায়?'

শামনাথ একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'কম বয়সের মেয়েরা পুতুল বানায়। মহিলারা ফুলকারি (নকশি কাঁথা) বানায়···।'

'ফুলকারি কী জিনিস?'

শামনাথ ফুলকারির অর্থ বোঝাতে ব্যর্থ হলে, মাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন মা, বাড়িতে কী কোনো পুরনো ফুলকারি নেই?'

মা চুপচাপ ঘরের ভিতর গিয়ে একটি পুরনো ফুলকারি তুলে আনলেন।

সাহেব খুব আগ্রহে ফুলকারির কাজ দেখতে লাগলেন। কাঁথাটা বেশ পুরানো, নানা জায়গায় সুতো ছিঁড়ে গেছে। সাহেবের রুচি দেখে শামনাথ বললেন, 'স্যার, এটা ছিঁড়ে গেছে। আমি আপনাকে নতুন বানিয়ে দেব। আমার মা বানিয়ে দেবেন। কী মা, ফুলকারিটা সাহেবের খুব পছন্দ হয়েছে, ওঁকে এরকম একটা বানিয়ে দেবে না?'

মা চুপ করে থাকলেন। পরে ভয়ে-ভয়ে বললেন, 'এখন আমার কি আর সেই চোখ আছে! ছানিপড়া চোখে যে ঠিকমতো দেখতে পাই না···।'

কিন্তু মায়ের কথা শেষ হবার আগেই শামনাথ সাহেবকে বললেন, 'মা ঠিক বানিয়ে দেবেন। দেখে আপনার ভালো লাগবে।'

সাহেব ঘাড় নেড়ে ঢুলতে-ঢুলতে ডিনার টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন। অন্য অতিথিরাও তার পিছন-পিছন গেলেন।

অতিথিরা সবাই যখন খেতে বসে গেলেন আর মায়ের দিক থেকে সবার চোখ সরে গেল, মা তখন ধীরে-ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। অবশেষে সবার অলক্ষ্যে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

কিন্তু ঘরে গিয়ে বসতেই দু চোখ বেয়ে ছলছল করে জলের ধারা নেমে এল। যেন বহু বছরের পুরনো বাঁধ ভেঙে পড়েছে। মা বহুবার নিজেকে বোঝালেন, দোপাট্টা দিয়ে বারেবারে চোখ মুছলেন, অথচ অশ্রু বৃষ্টির জলের মতো যেন থামতেই চায় না।

মধ্যরাত। অতিথিরা ডিনার খেয়ে একে-একে সবাই চলে গেছেন। মা চোখ বড়ো-বড়ো করে চুপচাপ

দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বাড়ির পরিবেশে টানটান ভাব কমে আসছিল। পাড়ার নিস্তব্ধতা শামনাথের বাড়িতেও ছড়িয়ে পড়েছিল, শুধুমাত্র রান্নাঘর থেকে প্লেটের শব্দ কানে আসছিল। ঠিক এমন সময় হঠাৎ মায়ের ঘরের বন্ধ দরজায় আঘাত পড়ল।

'মা, দরজা খোলো।'

মা ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। আমি কি আবার কোনো ভুল করে বসেছি? এতক্ষণ নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিলেন, কেন যে তখন তাঁর ঘুম পেয়েছিল! কেন তিনি অমন করে ঝিমুচ্ছিলেন। ছেলে কি তাঁকে এখনো ক্ষমা করে নি? মা ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে দরজা খুলে দিলেন।

দরজা খুলতেই শামনাথ নাচতে-নাচতে এগিয়ে এসে মাকে দু হাতে জড়িয়ে নিলেন। 'ও মা! তুমি আজকে যা করেছ না!···সাহেব তোমার উপর এত খুশি হয়েছেন যে কী বলব!···ও মা! মা আমার···।'

মায়ের ছোটো-খাটো শরীর সঙ্কুচিত হয়ে ছেলের আলিঙ্গনে ঢাকা পড়ে গেল। তাঁর দু চোখে আবার জল এসে গেল। চোখ মুছতে-মুছতে ধীরে-ধীরে বললেন, 'বাবু, তুই আমাকে হরিদ্বারে পাঠিয়ে দে। আমি কতদিন থেকে তোকে বলছি।'

শামনাথের নাচানাচি সহসা বন্ধ হয়ে গেল, তাঁর মুখ আবার থমথমে হয়ে গেল। মায়ের কাছ থেকে দূরে সরে এলেন।

'এ কী বলছ মা? তুমি আবার এ কোন্ প্রসঙ্গ তুললে?' শামনাথের রাগ বাড়ছিল, 'তুমি কি চাও লোকে আমার বদনাম করুক!···সবাই বলবে ছেলে মাকে নিজের কাছে রাখতে চায় না।'

'তা নয়, বাবু। এখন তুই বউয়ের সাথে যেমন মন চায় সেভাবে থাক। আমি তো আমার খেয়ে-পরে নিয়েছি। এখানে থেকে আর কী করব। আর যে কটা দিন বেঁচে আছি, সে কটা দিন ভগবানের নাম নেব। তুই আমাকে হরিদ্বারে পাঠিয়ে দে।'

'তুমি চলে গেলে ফুলকারি কে বানিয়ে দেবে? সাহেবকে যে তোমার সামনেই ফুলকারি করে দেবার কথা দিয়েছি।'

'আমার তো আর সেই চোখ নেই যে ফুলকারি বানিয়ে দেব! তুই অন্য কোনো জায়গা থেকে বানিয়ে নে। না হয় তৈরি-করা জিনিস এনে দে।'

'মা, তুমি আমাকে এভাবে ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে? আমার ভবিষ্যৎ নষ্ট করবে? জান না, ওটা পেলে সাহেব খুশি হবেন আর তাহলে চাকরিতে আমার উন্নতি হবে।'

মা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোর কি পদোন্নতি হবে? সাহেব কি তোর পদোন্নতি করে দেবেন? উনি তোকে সেকথা বলেছেন?'

'বলেন নি। কিন্তু দেখছ না, কত খুশি হয়েছেন। বলছিলেন, তোমার মা যখন ফুলকারি বানাতে শুরু করবেন, তখন আমি একদিন দেখতে আসব যে ওসব কিভাবে বানায়। সাহেব খুশি হলে হয়তো আমি এর থেকেও বড়ো চাকরি পেয়ে যেতে পারি, আমি বড়ো অফিসার হয়ে যেতে পারি।'

ধীরে-ধীরে মায়ের জরাগ্রস্ত মুখে হাসি ফুটে উঠল। তাঁর দু চোখ যেন চকচক করতে লাগল। 'তাহলে কি সত্যি চাকরিতে তোর উন্নতি হবে?'

'উন্নতি কি আর এমনি-এমনি হবে? সাহেবকে খুশি রাখব, তবে না কিছু করবেন। নইলে ওঁকে তোয়াজ করার মতো লোকের তো অভাব নেই।'

'তাহলে আমি বানিয়ে দেব' যে রকমই পারি, বানিয়ে দেব।'

মা মনে-মনে ছেলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করতে লাগলেন। এদিকে মি. শামনাথ 'এবার তাহলে শুয়ে পড়ো মা' বলে টলতে-টলতে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন।

হিন্দি থেকে অনুবাদ : **অনিন্দ্য সৌরভ**

ভীষ্ম সাহনী : জন্ম ৮ই অগস্ট, ১৯১৫, রাওয়ালপিণ্ডি। শিক্ষা এম. এ. পি. এইচ. ডি। ৯টি গল্পসংকলন, ৫টি উপন্যাস ও ৩টি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের নাটক ছাড়াও স্বর্গত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অভিনেতা বলরাজ সাহনীর জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীয় ও বিদেশী ভাষা মিলে প্রায় ১৮টি ভাষায় তাঁর রচনা-অনূদিত হয়েছে। দুটি উপন্যাস চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। "মোহন জোশী হাজির হো" ছবিতে নাম ভূমিকায় ও "তমস" ছবিতে একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। "নয়ী কহানিয়া" ও "লোটাস ইনডিয়া" পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। ১৯৭৫ সালে "তমস" উপন্যাসের জন্য সাহিত্য অকাদেমী ও প্রেমচন্দ পুরস্কার পেয়েছেন। এছাড়া প্রাপ্ত পুরস্কারের মধ্যে শিরোমণি লেখক (পানজাব সরকার), সাহিত্যকলা পরিষদ, লোটাস সোভিয়েত ল্যানড নেহরু উল্লেখযোগ্য। রুশ সাহিত্যের বহু ক্লাসিক রচনা মূল থেকে হিন্দিতে অনুবাদ করেছেন।

মহারাষ্ট্রের লোকনাট্য তামাশা

কিরণশঙ্কর মৈত্র

যুবতী এবং প্রাপ্তযৌবনা ছজন রমণী বিভিন্ন ভঙ্গিমায় কাঠের স্টেজের উপরে। তাদের পেছনে গাঢ় রঙের পরদা। ছজনের পরনে মহারাষ্ট্রের ধরনে বিচিত্র বর্ণের উজ্জ্বল শাড়ি। পায়ে সুপ্রচুর ঘুংরু, মুখে গাঢ় প্রসাধন। স্টেজের একদিকে একজন বাজাচ্ছে হারমোনিয়াম, অন্যদিকে আরেকজন ঢোলক। ঢোলক-বাদক কখনও উঠে দাঁড়িয়ে তার কলানৈপুণ্য প্রকাশ করছে। বাদ্যবৃন্দের মধ্যে এ ছাড়া রয়েছে অর্গান, ক্ল্যারিওনেট আর হালগি (ছোটো ড্রাম)।

অপেক্ষাকৃত বর্ষীয়সী রমণীরা গান গাইতে শুরু করতেই অন্য যুবতীরা লাস্যভরে নৃত্যতরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়। ছজন নারীর নৃত্য-গীত দর্শকদের মধ্যে সঞ্চারিত করে প্রবল হর্ষের প্রবাহ। পরে সুন্দরী এক নর্তকী-যুগল নৃত্যভঙ্গিমায় মঞ্চের সামনে আসে, লীলায়িত ভঙ্গিমায় দর্শকদের কাছে এগিয়ে যায় তাদের উৎসুক হাত থেকে টাকার নোটগুলি গ্রহণ করবার জন্যে। ক্রমে অন্য গায়িকারাও এগিয়ে আসে দর্শকদের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহের জন্যে। দর্শকরা টাকা দেবার অছিলায় নর্তকী-নায়িকাদের ঘনিষ্ঠ সংসর্গে একটু স্পর্শসুখও আদায় করে নেয়। গ্রাহীতারা এটাকে স্বাভাবিকভাবে অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে মেনে নেয়। সংগৃহীত অর্থ একজন বর্ষীয়সী মহিলার কাছে জমা দেওয়া হয়, পরে যথোচিতভাবে ভাগ করে দেবার জন্যে। এর মধ্যে চলতে থাকে গান—ফিল্মের, মারাঠি বা হিন্দি; কখনও বা 'লাবাকি'—জনপ্রিয় মারাঠি লোকসংগীত।

আধঘণ্টা এইভাবে অনুষ্ঠান চলতে থাকে। অবশ্য এর আগেই অন্য প্রধান অংশগুলির অভিনয় সমাপ্ত হয়ে গেছে। তারপর হুইশল্ বেজে ওঠে। শেষ হয় একটি দলের "তামাশা"র অনুষ্ঠান, এবার অন্যদল আসরে আসবে তাদের "তামাশা" প্রদর্শনের জন্যে। মহারাষ্ট্রের গ্রামে-গঞ্জে-শহরে এইভাবে লোকনাট্য "তামাশা"র অনুষ্ঠান জমে ওঠে।

বিশেষ করে মহারাষ্ট্রের "গ্রামে-গঞ্জে" তামাশা অত্যন্ত জনপ্রিয়। এর সঙ্গে তুলনীয় হিমাচলের লোকনাট্য "কারিয়ালা", উত্তর ভারতের "শৌটাঙ্কি" এবং বাঙলা আর উড়িষ্যার "যাত্রা-অপেরা" প্রকৃত-পক্ষে আগেকার দিনের যাত্রার যঙ্গেই "তামাশা"র সবচেয়ে বেশি।

প্রায় চার শ বছর ধরে মহারাষ্ট্রের লোকজীবনে তামাশা-অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তার অব্যাহত প্রবাহ। ষোড়শ শতাব্দীতে এই লোকমনোরঞ্জনের মাধ্যমটি শুরু হবার পর থেকে দাক্ষিণাত্যের জনজীবনে এটি বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

"তামাশা" মূলত একটি পারসি শব্দ যার অর্থ "কৌতুক।" কথ্য মারাঠি ভাষায় এই শব্দটির প্রচলন

করে উর্দু-ভাষী মোগলসেনারা। ফলত, ষোড়শ শতকে শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ দ্যোতিত হয়—'আম্যমাণ মোগলসেনার মনোরঞ্জনের একটি বিশেষ জনপ্রিয় অনুষ্ঠান।' সাধারণত তখন এর মধ্যে থাকত উষ্ণ আবেগস্পন্দিত উর্দু গান আর পুরুষ-শিল্পীদের দ্বারা উদ্দীপক নৃত্য। এই জন্যেই তামাশার কথা-বস্তু এবং অঙ্গভঙ্গির মধ্যে অনেক সময় গ্রাম্য, অশালীন আর অশ্লীল শব্দ-প্রয়োগ দেখা যায়।

মহারাষ্ট্র ভারতের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হবার ফলে তামাশার নৃত্যের মধ্যে উত্তর-ভারতের কথকের ক্লাসিক নাট্যভাব, দক্ষিণ ভারতের ভারতনাট্যম এবং কথাকলি নৃত্যশৈলীর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।

পেশোয়া রাজত্বের সময়ে তামাশা পরিপূর্ণ বিকশিত রূপ লাভ করে। দ্বিতীয় বাজী রাও সর্বপ্রথম তামাশা-অনুষ্ঠানে পেশাদার গায়িকা নিযুক্ত করেন। হাস্যকৌতুক-পরিবেশনকারী "সঙ্গাড্যা" চরিত্রটিও এই সময়ে সংযোজন করা হয়—সমস্ত অনুষ্ঠানকেই যে ব্যক্তি প্রধানভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। তার উপস্থিতবুদ্ধিমণ্ডিত রস-কৌতুক মন্তব্য দর্শকদের অপরিসীম আনন্দ দেয়। এই চরিত্রটি নায়কের মিত্র। সংস্কৃত নাটকের বয়স্য চরিত্রের কথা এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। তামাশায় এই চরিত্রটি অবশ্য আরো কৌতুককর কাণ্ড করে—নায়িকার সামনে সর্বদা নায়ককে অপদস্থ করে আর 'বুদ্ধু' বানিয়ে হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। সেই সঙ্গে থাকে তার দ্ব্যর্থবোধক অশালীন মন্তব্য।

এই চরিত্রটির জনপ্রিয়তা যে আজও অব্যাহত তার প্রমাণ কোনো জায়গায় তামাশার অনুষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তির প্রচারকালে প্রধান নর্তকীর সঙ্গে-সঙ্গে তার নামের উল্লেখে।

"তামাশা" মূলত লোকমনোরঞ্জনের উপকরণ হলেও শিল্পবিপ্লবের ফলে লোকেরা যখন গ্রাম ছেড়ে কর্ম-সন্ধান ও সংস্থানে শহরে আসতে শুরু করল—তখন তামাশার দলও তাদের অনুসরণ করল। অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন শ্রমিক-কলোনিতে তামাশার দল গজিয়ে ওঠে। আহার-বাসস্থানের পরেই তো মানুষ তার মনের খোরাক খোঁজে।

একটি উল্লেখযোগ্য দল "হনুমান তামাশা থিয়েটারে"র মালিক মধুসূদন নিরালের কাছে জানা যায়—পঞ্চাশের দশকে বম্বে শহরে উনিশটি পাবলিক থিয়েটার ছাড়াও প্রতিটি মিল এলাকায় তাদের নিজস্ব "তামাশা থিয়েটার" ছিল। বম্বের "হনুমান থিয়েটার", পুনার "আর্যভূষণ থিয়েটার" এবং কোলাপুরের "স্ত্রী থিয়েটারে" প্রায় প্রত্যেক রাতেই তামাশার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

তামাশার জন্যে যেমন-তেমন স্টেজ হলেই চলে যায়। নর্তকীদের অঙ্গ-ভঙ্গিতেই অভিনীত বিষয়ের স্থান এবং সময় নির্দেশিত হয়। সব নর্তকী সর্বদা উজ্জ্বল রঙের ন-গজি মহারাষ্ট্রীয় শাড়ি পরে, সেই সঙ্গে আনুষঙ্গিক বেশ-ভূষণ। তবে আধুনিক কাহিনীর অভিনয়ে মেয়েরা জিন্‌স্, টপ্‌স, কালো চশমা আর বাহারি পোশাক পরে। পুরুষ অভিনেতাদের পরনে কুর্তা-পাজামা, গাঢ় রঙের জ্যাকেট এবং মাথায় ফেতা (পাগড়ি)। সাধারণ তামাশার দলে ছজন মহিলা এবং এক বা ছজন পুরুষ অভিনেতা, সেই সঙ্গে ছ-তিনজন যন্ত্রসংগীতশিল্পী—ঢোলকি, অর্গ্যান, ক্ল্যারিওনেট ও হালগি (ছোটো ড্রাম)।

প্রথাগতভাবে তামাশা দুভাগে বিভক্ত—"সঙ্গীত-বারি" ও "ঢোলকি বারি।" সঙ্গীত-বারিতে নৃত্য আর গীতের প্রাধান্য এবং ঢোলকি-বারিতে থাকে নাচ, গান আর সংলাপ। দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানে মানব-অস্তিত্ব বিষয়ক দার্শনিক প্রসঙ্গ উত্তাপিত হয়। নৈতিক এবং অনৈতিকতা সম্বন্ধে দর্শকদের সচেতন করা হয় বিভিন্ন সংলাপের মাধ্য।

মহারাষ্ট্রে দুটি ঐশী-ভাবনা প্রসার লাভ করেছে—"কালগি" এবং "তুরা"। কালগিরা শক্তি বা মায়ার উপাসক, অন্যপক্ষে তুরারা শিবের। তামাশার আসরে কালগি আর তুরা—এই দুই পক্ষের মধ্যে চলে

উপস্থিতবুদ্ধিসঞ্জাত বাকচাতুর্যের প্রতিযোগিতা। প্রশ্ন তোলা হয়—কে বড়ো, মন অথবা বস্তু? রাতের পর রাত দর্শকরা দুই পক্ষের বাক্-প্রতিযোগিতা ঔৎসুক্য এবং উৎসাহের সঙ্গে উপভোগ করে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রধান ভূমিকা নেয় দুই দলের "শাহীর"—কবি-গায়ক। তারা পরস্পরকে তাৎক্ষণিক রচিত গানের মাধ্যমে পরাজিত করার চেষ্টা করে। এটি বাঙলাদেশের কবিলড়াইয়ের সঙ্গে তুলনীয়। উল্লেখযোগ্য, "শাহীর"দের মধ্যে রয়েছেন পথে বাপুরাও, সগন ভাউ, রাম যোশী, হোমাজী বালা, পরশুরাম, অনন্ত, ফান্তি।

তামাশার আরেকটি প্রধান উপাদান "দৌলৎ জ্যায়দা।" যার আক্ষরিক অর্থ 'তোমার ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাক।' এটি হল তামাশার শিল্পীদের দর্শকদের অর্থপ্রদান। আগেই বলা হয়েছে—টাকা-পয়সা দেবার অছিলায় দর্শকরা মহিলাশিল্পীর স্পর্শের আনন্দলাভ করে। মোগল আমল থেকে এই অর্থদানপ্রথাটি চলে আসছে। প্রসিদ্ধ মারাঠি লেখক ভি. কে. যোশীর মতে এই অর্থদানের মধ্যে একটি বিশ্রী দুশ্চরিত্র অভ্যাস প্রশ্রয় পেয়ে আসছে। যোশীর মতে, কোনো-কোনো তামাশা-শিল্পীর মধ্যে বারাঙ্গনাবৃত্তি প্রচলিত।

"হনুমান তামাশা থিয়েটারের" মালিক মধুসূদন নিরালের মতো ব্যক্তিরা "দৌলৎ জ্যায়দা" প্রথাটি তুলে দেবার পক্ষে নন। তিনি বলেন—ফিল্ম-টেলিভিশনের মতো আধুনিক উপকরণের বহুল প্রচলনের ফলে তামাশার আকর্ষণ অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়ে অবলুপ্তির সম্মুখীন। এই পরিস্থিতিতে "দৌলৎজ্যায়দা" তামাশা-শিল্পীদের যথেষ্ট আর্থিক সহায়তা দিয়ে তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে।

তামাশার শুরু গণেশ-বন্দনা দিয়ে। এর পরে "গৌলান" (গোয়ালিনী) দৃশ্য। এর মধ্যে তরলভাব-তরঙ্গিত নাচ ও গান, গোপী-পরিবৃত কৃষ্ণের কেলি-লীলা—যার মধ্যে পর্যাপ্ত ইন্দ্রিয়জ সুখকর দৃশ্য-সম্ভাবনা। সংলাপ সাধারণত দ্ব্যর্থবোধক। "রংবাজি" আর সওয়াল-জবাবের মধ্যে নিম্নমানের হাস্যকৌতুক।

এর পরে "ভাগ" (কাহিনী)—সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই কাহিনী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরাণ-বা লোককথা-নির্ভর ফ্যান্টাসি। সাবিত্রী-সত্যবান, হরিশ্চন্দ্র, মারাঠা-সেনাপতি শিব প্রতাপের উপরে তামাশার কাহিনী অভিনয়। কিন্তু কোনো-কোনো তামাশার এই অংশে আবার সামাজিক-সমস্যা-নির্ভর ঘটনা, সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রসঙ্গের উপরে চমৎকার তির্যক কটাক্ষ এবং মন্তব্য। বস্তুত প্রাক-স্বাধীনতা কালে তামাশা ছিল ব্রিটিশবিরোধী ভাবধারা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। সাম্প্রতিক কালে বহু আধুনিক বিষয় তামাশায় গ্রহণ করা হয়েছে—"মুম্‌বাইচি কেলেওয়ালী" (বমবের কলাওয়ালী), "সি. আই. ডি. পিট্যা লা আটক" (সি. আই. ডি. পিট্যালালের গ্রেপ্তার) ইত্যাদি। এই কাহিনীগুলিতে রয়েছে জেমস বনড, বমবের ক্রাইম থ্রিলার, মার্ডার মিস্ট্রি ইত্যাদির প্রভাব।

"লোকনাট্য তামাশা মণ্ডলে"র মালিক গণপৎরাও মানে গত পনেরো-ষোলো বছর ধরে বহু সফল পালা লিখে প্রযোজনা করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে ঐতিহাসিক কাহিনী "শম্ভাজী", জাতিভেদপ্রথা "বিবাহের আগেই বিধবা", পৌরাণিক "ধ্যানেশ্বর", "আমার মা", রাজনৈতিক "ইন্দিরা আবার জন্ম নিক" ইত্যাদি। শেষোক্ত পালাটি দক্ষ প্রযোজনা, বাস্তবানুগ সাজসজ্জা, প্রশংসনীয় অভিনয় এবং হৃদ্যসংলাপে সাফল্যমণ্ডিত।

বিঠাবাঈ মাঙ্গ একজন শ্রেষ্ঠ তামাশা-শিল্পী। স্বামীকে নিয়ে তিনি একটি দলের স্বত্বাধিকারিণী। তিনি ভারত-সীমান্তের বহু জায়গায়, গুজরাত এবং দিল্লিতে সাফল্যের সঙ্গে তামাশার অনুষ্ঠান করেছেন। নৃত্য-গীত এবং দর্শকদের সঙ্গে অব্যবহিত সংলাপ সম্পর্কে তিনি অতি আকর্ষণীয়া। তাঁর মতে তামাশা ক্রমে আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। মারাঠি ফিল্মে তিনি নৃত্য আর অভিনয় করেছেন। কিন্তু ফিল্মের

জগৎ তাঁর তেমন ভালো লাগে নি, কারণ সেটি 'live art' নয়।

১৯৮৬ সালে "সঙ্গীত নাটক একাডেমি" লাবানি-লোকসঙ্গীতের জন্যে পুনার সত্যভামা বাইকে পুরস্কৃত করেছিলেন।

সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে রাজ্য-সরকার তামাশার রূপশৈলীর মানোন্নয়নে সচেষ্ট হয়েছেন। ফলে তামাশা লাভ করেছে "লোকনাট্যে"র মর্যাদা। এখন শুধু তামাশা শুধু 'থিয়েটার' বা গ্রাম-অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ নয়। তামাশার উপরে কয়েকটি মারাঠি ফিল্মও তোলা হয়েছে। দাদা কোন্‌ডেকের ফিল্ম তো বক্স-অফিস হিট। ভি. শান্তারামও তৈরি করেছেন "পিঞ্জর" নামে একটি সফল ফিল্ম।

মুস ইনামদার এক তামাশা দলের ম্যানেজার। তাঁর সঙ্গে কথা বলে তামাশার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। তাঁর দল বছরে আড়াই শর মতো 'শো' করে থাকে। এর মধ্যে অর্ধেক ব্যবস্থা হয় কনট্রাক্টরদের মাধ্যমে, বাকি তাঁরা নিজেরাই। কনট্রাক্টর প্রতিটি শো-এর জন্য পাঁচ থেকে সাত হাজার টাকা দেয়, সেই সঙ্গে থাকবার জায়গা, স্টেজ এবং পাব্লিসিটি। একটি শো করতে সাধারণত হাজার পাঁচেক খরচ হয়, কিন্তু কনট্রাক্টরদের লাভ পুরো একশ ভাগ।

তামাশা-শিল্পীদের কোনো ইউনিয়ন নেই। তাই তাঁদের পারিশ্রমিক বাড়াবার কোনো কার্যকর পন্থা অনুপস্থিত। তাঁদের কাজের সময়সীমাও নির্দিষ্ট নয়। প্রায়ই তাঁদের সমস্ত দিন ভ্রমণের শেষে রাতে অনুষ্ঠান করতে হয়, বিশ্রাম আর নিদ্রার জন্যে সময় কম।

রামরাও গাভাই একজন প্রধান অভিনেতা এবং মঙ্গল প্রতিভাময়ী গায়িকা। তাঁরা অভিযোগ করেন যে বমবেতে স্থূলগামী ছেলেমেয়েদের রেখে তাদের তামাশার অনুষ্ঠান করতে হয়। মঙ্গল জানান—শুধু বর্ষাঋতুতেই তিনি অবসর পান।

বৃদ্ধ শিল্পীদের অবস্থা শোচনীয়। অনুষ্ঠান করতে অসমর্থ বা অযোগ্য বিবেচিত হলে তাঁদের দল থেকে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া হয়। তাঁদের এমন কোনো সঞ্চয় থাকে না যে বৃদ্ধ বয়সে তার উপরে নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করা যায়।

মহারাষ্ট্র সরকার মাঝে-মাঝে বিভিন্ন স্থানে "তামাশা মহোৎসবের" আয়োজন করে শিক্ষিত নাগরিকদের মধ্যে একে জনপ্রিয় করে তুলবার এবং তামাশা-শিল্পীদের সামাজিক মর্যাদা দেবার প্রয়াস করছেন। আগে বিভিন্ন তামাশাদলের মধ্যে প্রতি-যোগিতার ব্যবস্থা করা হত, এখন নির্বাচিত কয়েকটি দলকেও অভিনয়ের জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সংশ্লিষ্ট সবাইকে যথাযোগ্য পারিশ্রমিক দেবার ব্যবস্থাও রয়েছে।

কিন্তু রাজ্য-সরকারের নানাবিধ প্রয়াস সত্ত্বেও বহু তামাশা-শিল্পী শোচনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে দিন গুজরান করেন। সুপ্রসিদ্ধ ফিল্ম-নির্মাতা সাই পরাঞ্জপে এঁদের অবস্থা বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন—প্রতি দলে রয়েছেন অন্তত এক ডজন শিল্পী, তাঁদের উপর নির্ভরশীল লোকদের কথা না-হয় ছেড়েই দিলাম। (গ্রামে অনুষ্ঠান করতে গিয়ে) মাটির চুল্লি জ্বালিয়ে যেখানে পারেন তাঁরা খাবার বানান। লোকে থাকেন গাদাগাদি করে। একটি দলের অনুষ্ঠান শেষ হতে না-হতেই আরেকটি দল তাঁদের প্রোগ্রাম শুরু করে, বোঝাই যায় না—কোন্ দলের অনুষ্ঠান কখন শেষ হল। কোনোরকমে আবরু রেখে মেয়েরা শাড়ি বদলান। তাঁদের ট্রাঙ্ক, জিনিসপত্র এখানে-ওখানে ইতস্তত ছড়ানো।

নব্বই শতাংশ তামাশার দল এইভাবেই জীবন কাটায়। তামাশা-শিল্পীদের আনুমানিক সংখ্যা দশ হাজার, আরও পঁচিশ হাজার লোক পরোক্ষভাবে তাঁদের উপার্জনের উপরে নির্ভরশীল। একজন মহিলা শিল্পীর জীবনের শ্রেষ্ঠ অধ্যায় যখন তাঁর বয়স পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ। এই সময়ে তাঁর মাসিক উপার্জন

পাঁচশো থেকে ছশো টাকা। এই অর্থ দ্বারা তাঁর সংসার প্রতিপালিত হয়। বেশি বয়সে অনেক প্রতিভাময়ী শিল্পীকে ভিখারিনির জীবনও যাপন করতে হয়েছে—এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। মাদকাসক্তি অনেকের জীবনে ডেকে এনেছে শোচনীয় পরিণতি। যাঁরা গ্রামে-গঞ্জে রাতের পর রাত দর্শকদের উচ্ছ্বসিত খুশির ফুলঝুরি উপহার দিয়েছেন—তাঁদের জীবনে শেষ পর্যন্ত দেখা দেয় অশ্রুকলঙ্কিত অন্তহীন দুঃখ।

দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্য দেবার জন্যে মহারাষ্ট্র সরকার "মারাঠি তামাশা পরিষদ" গঠন করেছেন। অভিনয়রত শিল্পীদের আবাসস্থল নির্মাণের জন্যেও সরকার সাহায্য দিয়েছেন। এ ছাড়া খোলা হয়েছে ট্রেনিং ক্যাম্প, অবসরপ্রাপ্ত শিল্পীদের জন্যে করা হয়েছে স্বল্প পেনশনের ব্যবস্থা। আরো অনেক কিছু করা দরকার। নয়তো লোকনাট্যের জনপ্রিয় এই ধারাটি বিশীর্ণ হয়ে বিলীন হয়ে যাবার সম্ভাবনা। লোকমনোরঞ্জনের আনন্দপুর্ণিমার উজ্জ্বল আকাশে নেমে আসবে নিবিড় বিষাদের অমাবস্যা।

কবি কৃষ্ণকামিনী : "চিত্তবিলাসিনী"

বসন্তকুমার সামন্ত

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে কৃষ্ণকামিনী দাসীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়ার যোগ্য। তাঁর "চিত্তবিলাসিনী" বঙ্গমহিলারচিত সর্বপ্রথম প্রকাশিত পুস্তক—একটি নাতিদীর্ঘ কাব্য (পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭২)। বঙ্গদেশের 'বন্দিনী বামা'কুলের মুক্তিসংগ্রামের প্রথম যুগে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। "চিত্ত-বিলাসিনী" পুস্তকের ভূমিকায় লেখিকা তাঁর দুঃসাহসী চেষ্টা সম্পর্কে নিজেই বলেছেন—'অদ্যাপি অস্মদেশীয় মহিলাগণের কোন পুস্তকই প্রচারিত হয় নাই, সুতরাং প্রথমতঃ এ বিষয়ে হস্তার্পণ করা কেবল লোকের হাস্যাস্পদ হওয়া মাত্র, কিন্তু আমার অন্তঃকরণে যৎপ্রে সাহস জন্মিতেছে, যে সামাজিক মহাশয়েরা আপাততঃ স্ত্রীলোকের রচনা শুনিলেই বোধ হয় যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই, আর আমার পুস্তক রচনা করিবার এই এক প্রধান উদ্দেশ্য যে উৎকৃষ্ট হউক বা অপকৃষ্ট হউক একটা দৃষ্টান্ত পাইলে স্ত্রীলোকমাত্রেই বিদ্যানুশীলনে অনুরাগী হইবে তাহা হইলেই এদেশের গৌরবের আর পরিসীমা থাকিবেক না,…। লেখিকা কৃষ্ণকামিনী দাসী আশা করেছেন, বিশ্বাস রেখেছেন যে তাঁর গ্রন্থ প্রকাশের ফলে এদেশের নারীসমাজ অনুপ্রেরণা পাবে, স্ত্রীশিক্ষাপ্রসারের জোয়ার আসবে এবং তার ফলে দেশের গৌরব বৃদ্ধি পাবে।

ঊনবিংশ শতকের শুরুতে বালকদের শিক্ষার জন্য বেশ কয়েকটি শিক্ষায়তন গড়ে উঠলেও এখানকার বালিকাদের বিদ্যায়তনের মাধ্যমে শিক্ষালাভের সুযোগের জন্য অনেকদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। অবশেষে ১৮১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটির উদ্যোগে বালকদের একটি বিদ্যালয়ে মাদুরের বেড়া দিয়ে পৃথক ক'রে ('separated from the boys by a mat partition') কিছু বালিকার ভর্তির ব্যবস্থা হল। দেশীয় বালিকাদের শিক্ষার জন্য পৃথক একটি শিক্ষায়তন ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে লনডন মিশনারি সোসাইটির যাজক রবার্ট মে চুঁচুড়া শহরে নিজের বাসভবনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অবশ্য শিক্ষাব্রতী মে'র অকালমৃত্যুর কারণে বঙ্গের (সম্ভবত ভারতের) এই প্রথম প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়টি বেশি দিন চলে নি। এর পরে ব্যাপকভাবে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার গৌরব কয়েকটি বিদেশী মহিলাসমিতির। 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' কলকাতার নন্দন-বাগানে (বর্তমান গৌরীবেড়ে অঞ্চলে) ১৮১৯ সালের জুন মাসে 'ফিমেল জুভেনাইল স্কুল' নামে একটি বালিকাবিদ্যালয় এবং পরে লিভারপুল স্কুল, সালেম স্কুল ও বার্মিংহাম স্কুল নামে আরও তিনটি অনুরূপ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। এ ছাড়া মিস মেরি অ্যান কুকের উদ্যোগে এবং লেডিজ সোসাইটি (১৮২৪ খ্রী) ও লেডিজ অ্যাসোসিয়েশন (১৮২৫ খ্রী)-এর মাধ্যমে অবৈতনিক বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও এতদ্দেশীয় সমাজে প্রচলিত কিছু অদ্ভুত ধারণা, বাল্যবিবাহ ও অবরোধপ্রথার জন্য স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে তেমন অগ্রগতি হয় নি। বিদ্যার্জন করলে স্ত্রীলোকেরা বিধবা হবেন—তাঁদের চরিত্র-দোষ ঘটবে—এ ধরনের ধারণাকে অতিক্রম করে তখনকার সমাজে বালিকাদের শিক্ষাগ্রহণ প্রায় অসম্ভব ছিল। এমনকী স্ত্রীলোকেরা নির্বোধ পশু-

সদৃশ—তারা শিক্ষাগ্রহণে অক্ষম—এমন যুক্তিহীন কথাও ভাবা হত। তবে অনুকূল পরিবেশে কোনো-কোনো নারী পিতৃগৃহে স্বজন পুরুষের সাহায্যে আর স্বামিগৃহে প্রধানত স্বামীর সহযোগিতায় বিদ্যার্জন করেছিলেন। কিন্তু সেরূপ সৌভাগ্যবতীর সংখ্যা স্বভাবতই খুব কম ছিল।

এমন প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেও স্বল্পসংখ্যক সৌভাগ্যবতীদের একজন হিসাবে কৃষ্ণকামিনী দাসী যে সামান্য শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন তার সাহায্যে প্রতিভাশালিনী এই মহিলা নিজের ভাবনা-চিন্তা ছন্দে গ্রথিত করে পাঠকদের চিত্তবিলাসের জন্য "চিত্তবিলাসিনী" কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। স্বামী-সোহাগিনী কৃষ্ণকামিনী এক্ষেত্রে তাঁর স্বামীর অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছিলেন। লেখিকা "চিত্তবিলাসিনী"-র ভূমিকায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন —'পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, যে এই ক্ষুদ্র পুস্তক রচনার সময় আমার প্রাণবল্লভ যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন এবং তিনি এ বিষয়ে মনোযোগী না হইলে কেবল আমা হইতে ইহা সম্পন্ন হইবার কোন প্রকার সম্ভাবনা ছিল না।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কৃষ্ণকামিনীর স্বামী বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন এবং "তত্ত্বচূড়ামণি", "সহজ সত্য তত্ত্বজ্ঞান", "ভবরোগ-মহৌষধি", "মহাবাক্যতত্ত্বামৃতরস" প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ রচনা করেছিলেন।

"চিত্তবিলাসিনী" বঙ্গমহিলারচিত প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। তবে এই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের বেশ কয়েক বৎসর পূর্বেও মহিলাদের সাহিত্য-সাধনার প্রমাণ পাওয়া যায়। "সংবাদ প্রভাকর"-এর পৃষ্ঠায় কিছু বাঙালি মহিলা-কবির কবিতা দেখা গেলেও সেখানে তাঁদের নাম ছাপা না থাকায় এখন কিছু ধরবার উপায় নেই। সম্ভবত সমাজের সমালোচনার হাত থেকে বাঁচার জন্য এসব ক্ষেত্রে লেখিকার নাম উল্লেখ করা হত না।

সেদিক থেকে কৃষ্ণকামিনী দাসীর স্বনামে প্রকাশিত পুস্তকের ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্কোচ-মুক্ত সাহসী মনের পরিচয় আছে। সাহসিকা লেখিকা তাঁর কাব্যগ্রন্থের "আত্ম-পরিচয়" কবিতার মাধ্যমে নিজের পরিচয়ও দিয়েছেন। পিতৃকুলের পরিচয় সেখানে অনুপস্থিত। বিবাহিতা নারী হিসাবে কৃষ্ণকামিনী তাঁর শ্বশুরকুলের পরিচয় দিয়েছেন :

> জাহ্নবী দক্ষিণ অংশে হুগলী জিলায়।
> সুখরিয়া নামে গ্রাম আছয়ে তথায়॥
> সেই স্থানে বৃহৎ এক গোষ্ঠীর বসত।
> কায়স্থ উপাধি মিত্র মুস্তৌফীতে খ্যাত॥

হুগলী জেলার সুখরিয়া গ্রামের উক্ত কায়স্থ বংশে কালিদাস মিত্র মুস্তৌফী নামে এক ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ কাশীদাস, মধ্যম হরদাস ও কনিষ্ঠ নৃসিংহদাস।

> কনিষ্ঠের বংশধর শ্রীশশিভূষণ।
> অধিনীর প্রাণের বল্লভ সেই জন॥
> তাঁর আনুকূল্যে আমি করেছি মনন।
> 'চিত্তবিলাসিনী' গ্রন্থ করিতে রচন॥

"আত্মপরিচয়"-এর শেষাংশে লেখিকা তাঁর শক্তির সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে সুধী পাঠকসমাজের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য আবেদন রেখেছেন :

> গুণিগণ প্রতি এই আমার মিনতি।
> দোষদৃষ্টে নাহি যেন হন রুষ্টমতি॥
> ক্ষীণ বুদ্ধিবল আমি নিতান্ত অক্ষমা।
> কৃপা করি অধিনীরে করিবেন ক্ষমা॥
> এ যুক্তি বিধান হৈল এই যুক্তি মতে।
> মহাত্মাগণের আস্য সহায় করিতে॥

"চিত্তবিলাসিনী" নাতিদীর্ঘ কাব্য হলেও বিষয়-বস্তুর গৌরবে এবং রচনার আঙ্গিকের বৈচিত্র্যে অসাধারণ। অন্তঃপুরবাসিনী একজন গৃহবধূ—যিনি আগ্রহ থাকলেও তখনকার প্রতিকূল পরিবেশে শিক্ষার উদার সুযোগ পান নি, এবং দেখার চোখ থাকলেও সে-সময়ের সামাজিক পরিবেশে যাঁর পরিচিতির জগৎ স্বভাবতই সীমাবদ্ধ ছিল, তাঁর লেখনীতে যে-

সব অমৃতসমান কথা প্রকাশিত হয়েছে তার প্রতিটি ছত্র উদ্‌ধৃতিযোগ্য। আজকের পাঠকের দরবারে দুর্লভ এই কাব্যের কিছু-কিছু অংশ পটভূমিকাসহ উপস্থিত করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। বঙ্গসাহিত্য-আসরের প্রথম লেখিকা অবশ্যই একজন প্রথম সারির লেখিকা ছিলেন। গদ্যরচনাতেও তাঁর স্বাভাবিক উৎকর্ষ ছিল; তবু তিনি কেন কবিতার শরণ নিয়েছিলেন তার কৈফিয়ত লেখিকা তাঁর গ্রন্থের অনবদ্য ভূমিকায় দিয়েছেন এবং প্রসঙ্গত ভাবী পাঠকদের কাছে তার গ্রন্থপাঠের জন্য যুক্তিপূর্ণ আবেদন পেশ করেছেন। 'বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল গ্রন্থ রচিত হইত পারে তাহার মধ্যে ছন্দোবন্ধে যে সকল গ্রন্থ প্রচারিত হয় তাহা গদ্য অপেক্ষা পরিশ্রমের লাঘব ও অনায়াসে সুরস হয় এই বিবেচনা করিয়া আমি চিত্তবিলাসিনী নামে একখানি অভিনব গ্রন্থ অধিকাংশই নানাবিধ ছন্দে বিরচিত করিয়া মধ্যে ২ কএক পংক্তি করিয়া গদ্যও সন্নিবেশিত করিয়াছি ইহাতে যদিও স্বমতবিরুদ্ধ নূতন ভাব দেখিতে পান—তাহা একেবারে অশ্রদ্ধা না করিয়া স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন অবশ্যই তাহা যুক্ত্যনুগত হইতে পারিবে, আর মনে করুন, নূতন একখানি পুস্তক হস্তগত হইলে কত আমোদ জন্মে তাহার কোন অংশ বিরুদ্ধ হইলে দেশভাষার উন্নতি হইতেছে এই আনন্দে তাহা নিতান্ত আপনাদিগের পক্ষে নিন্দনীয় হয় না, বিশেষতঃ সবিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া আদ্যো-পান্ত অবলোকন করিয়া থাকেন। এক্ষণে এই অবলার প্রতি অনুকূল হইয়া চিত্তবিলাসিনী গ্রন্থ নিরীক্ষণ করিয়া সেই প্রকার আনন্দ প্রকাশ করিলে সমুদয় আয়াস সফল জ্ঞান করিব।'

কবি কৃষ্ণকামিনী তাঁর কাব্যগ্রন্থে পয়ার, ত্রিপদী (দীর্ঘ ত্রিপদী), লঘু-ত্রিপদী, পয়ার-মিশ্র ত্রিপদী, একাবলী ও দীর্ঘললিত নামক নানাবিধ ছন্দের প্রয়োগ করেছেন। যথা—

পয়ার : নম ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময় পরম প্রকৃতি।
পরাৎপর সারাৎসার সর্ব্ব ভূতে স্থিতি॥
('ব্রহ্মবন্দনা', পৃ ৩)

ত্রিপদী : মরি কিবে বুদ্ধিবল, করিয়াছে ধোঁয়া কল,
কলেতে চালায় বেগে গাড়ি।
অদ্ভুত ব্যাপার অতি, মরুত যিনিয়া গতি,
নাহি কিন্তু হস্তি ঘোড়া ঘুড়ি॥
[বি. দ্র. : ছাপার ভুলে 'কি যে' 'কিবে' হয়েছে।]
('বিরহিণীর উল্লাস', পৃ ৮)

লঘুত্রিপদী : সর সর সর, কি কর কি কর,
যাও নিজ নিকেতনে।
দেখে যদি পরে, কি বলিবে পরে,
কিছু নাহি ভাব মনে॥
('কামিনীর উক্তি', পৃ ১৫)

পয়ার-মিশ্র ত্রিপদী :
নাহি তরি তরবারে, কিসে যাব পারাবারে,
কিছু মাত্র উপায় না হেরি।
বল দেখি বিধুমুখী কি করি কি করি॥
তব বস্ত্র আভরণ, আমারে কর অর্পণ,
আগে গিয়ে রেখে আসি পারে।
তোমারে লইয়া যাব এসে তার পরে॥
('উপনায়কের উক্তি', পৃ ১৩)

একাবলী : কাহারে কহিব মনের দুঃখ।
গুমুরে গুমুরে ফাটিছে বুক॥
('কোন বিরহিণীর বিলাপ', পৃ ২৭)

দীর্ঘ ললিত :
"পুষ্প তুলে নানা জাতি, সেঁউতি গোলাপ জাঁতি
মনোমত হার সখি তাহে গাঁথিলাম লো।
প্রাণেশ আসিবে বলি, আনিয়ে কুসুমকলি
মনসুখে সুশোভন শয্যা করিলাম লো॥"
('নায়ক আশয়ে নায়িকা জাগরণে যামিনী যাপন করিয়া প্রভাতে সখি প্রতি বলিতেছেন', পৃ ২৪)
['আশয়ে' 'আশায়' হবে।]

বিভিন্ন ছন্দে গাঁথা কবিতা ছাড়াও লেখিকা তাঁর গ্রন্থে গদ্যরচনার মাধ্যমে কোনো প্রসঙ্গের প্রাথমিক উপস্থাপনা, কবিতায় কথোপকথন এবং গদ্যপদ্যমিশ্রণে নাট্যসংলাপ ব্যবহার করেছেন। এগুলি নিঃসন্দেহে তাঁর লেখনীর শক্তি ও সাবলীলতা প্রমাণ করে। নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থিত করা হল :

'দয়া ছাড়া ধর্ম্ম নাই।

একদিবস নিশীথ সময়ে নিদ্রিত হইয়া স্বপ্নযোগে দর্শন করিলাম, যে কোনো সুষুপ্ত মহাশয় পুরুষের নাসিকা রন্ধ্র হইতে প্রথমতঃ এক অসামান্য রূপলাবণ্য বিশিষ্ট ষোড়শবর্ষীয় কামিনী এবং পর ক্ষণেই এক তরুণ বয়স্ক তেজঃপুঞ্জ-বিশিষ্ট পুরুষ নিঃসৃত হইলেন পরে তাঁহারা এক স্থানে উপস্থিত হইয়া পরস্পর যাদৃশ কথোপকথন করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে যাহা ঘটনা হইয়াছিল পশ্চাল্লিখিত পুংক্তি কতিপয়ে প্রকাশ করিতেছি। ['পুংক্তি', 'পংক্তি' হবে।]

পুরুষের উক্তি
ঘোর রজনীতে তুমি কাহার কামিনী।
কিসের লাগিয়ে ভ্রমিতেছ একাকিনী॥

* * *

কামিনীর উক্তি
আমি হে রমণী, আছি একাকিনী,
কুলের কামিনী তায়।
তুমি হে এখানে, কিসের কারণে,
বল ওহে যুবরায়॥

* * *

স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ ও কামিনীর এইভাবে কাব্য-নাটকের ধরনে উত্তর-প্রত্যুত্তর (পৃ ১৪-১৮) চলেছে। শেষে জানা গেল উক্ত কথোপকথন একটি রূপক : কামিনী ও পুরুষ যথাক্রমে দয়া ও ধর্ম এবং কবির মূল বক্তব্য—

দয়া ছাড়া ধর্ম্ম আছে কোনখানে।
যেখানেতে দয়া দেখ ধর্ম্ম সেইখানে॥ (পৃ ৭১)

দয়া-ধর্মের স্থায়ী মিলনের মধ্য দিয়ে রূপক কাব্য-নাটিকার যবনিকা পড়েছে এবং লেখিকার স্বপ্ন শেষ হয়েছে।

স্বপ্নদর্শনের মাধ্যমে একইভাবে কৃষ্ণকামিনী প্রবীণা রমণী ও নবীনা দুই ভগ্নীর কথোপকথন (পৃ ১৮-২৩) শুনিয়েছেন—রূপকের ছদ্মবেশের বাহিরে যাদের পরিচয় বসুমতী, সুখ ও সন্তোষ। এখানে কবির বক্তব্য—

ধনেতে কখন নাহি হয় সুখোদয়।
সন্তোষ সুখের হেতু জানিবে নিশ্চয়॥ (পৃ ১৮)

উক্ত ছত্রদ্বয়ই দ্বিতীয় কাব্যনাটিকার শিরোনাম।

"বালবিধবা মাতঙ্গিনী ও সৌদামিনীর কথোপকথন" (পৃ ৬০-৬৭)-এ কৃষ্ণকামিনী-লিখিত নাট্যসংলাপের উদাহরণ আছে। বিধবাবিবাহ আইন 'পাশ' হয়েছিল ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই।* এই যুগান্তকারী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিধবাবিবাহের পক্ষে প্রধান প্রবক্তা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১)-এর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদিত হয়েছে—

সৌদামিনী। হেঁলো, এমন গুণমণি গুণের সাগর কে আছে যে আমাদের দুখের দুখী হয়ে এ কাণ্ড কল্লে।
মাতঙ্গিনী। শুনিচি নাকি সে গুণের সাগরের নাম বিদ্যেসাগর।

* * *

সৌদামিনী। …একটা কিছুর সাগর হবে, তা গুণেরি বা কে জানে, আর বিদ্যেরি বা কে জানে, সাগর না হলে কখন পুকুরে ঢেউ খেলে না,…
মাতঙ্গিনী। …ধন্য ধন্য ধন্য বটে বিদ্যার সাগর।
রাখিলেন চিরকীর্ত্তি ভারত ভিতর॥
বিধবার দুঃখভার করিতে সংহার।
মহীতে ঈশ্বর বুঝি তাই অবতার॥
(পৃ ৬১-৬২)

---

* কৃষ্ণকামিনী-লিখিত "চিত্তবিলাসিনী" কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে নভেম্বরের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায়। এই তারিখ ও বিধবাবিবাহ আইন পাশের পূর্বোক্ত তারিখের নিরিখে বলা যায় যে "চিত্তবিলাসিনী" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৬ সালের অগস্ট থেকে অকটোবরের মধ্যে—খুব সম্ভবত ঐ বৎসর সেপটেমবর মাসে শারদীয় উৎসবের আগে।

অনুরূপভাবে 'অধিবেদন' * শীর্ষক রচনায় (৬৭-৭১ পৃ) ব্রাহ্মণকুমারী সদয়ান্তিকা ও নবীনা কুলীন কুলকামিনী লবঙ্গিকার কথোপকথনের মাধ্যমে সাত বৎসর বিবাহ সত্ত্বেও স্বামিবিরহে লবঙ্গিকার যে দুঃসহ জীবন যাপন করতে হয়, তার মূল কারণ বল্লালী কৌলীন্য-প্রথা—একথা উনিশ শতকের মধ্যভাগে পুরুষ-শাসিত সমাজে দাঁড়িয়ে লেখিকা নির্ভয়ে প্রকাশ করেছেন। বিধবা বিবাহ আইন পাশ হলেও কুলীন পুরুষদের বহুবিবাহ বন্ধ করতে তেমন কোন নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা হল না। এক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের চেষ্টা ছিল। কিন্তু অনুকূল ব্যাপক জনমতের অভাবে সে চেষ্টা ফলবতী হয় নি। শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে সমাজের ভবিষ্যৎ স্বাভাবিক সংস্কার ও পুরুষের সদিচ্ছার উপর উক্ত সামাজিক কুপ্রথা 'অধিবেদন' থেকে নারীজাতির মুক্তি নির্ভরশীল হয়ে থাকল। তাই সদয়ন্তিকা সে যুগের কুলীনদের 'গুণ', তাদের বিবাহ-ব্যবসায় ও তার কুফল বর্ণনা করে এই সর্বনাশা প্রথা থেকে নারীদের উদ্ধার করার জন্য যোগ্য সমাজবিপ্লবীকে আহ্বান জানিয়েছেন—

এখন কুলীন যারা কুলীন বলিয়ে।
গর্ব্বে নাহি যান পদ ধরায় পাতিয়ে॥
তাহাদের গুণ যত অতি সুশোভন।
গাঁজাগুলি সুরা পানে পটু বিলক্ষণ॥
* * *
পরিণয়ে হন রত শৈশব সময়।
অশীতি হইলে পার তবু ক্ষান্ত নয়॥
কেহ হন একশত রমণীর পতি।
যাহার অধিক নূন তাহার বিংশতি॥
* * *
কিছু মাত্র চিন্তা নাহি করেন অন্তরে।
অকূলে ফেলিয়া সেই অবলাগণেরে॥
* * *
হায় কবে সুধীগণ সদয় হইবে।
অধিবেদনের পাট উঠাইয়া দিবে॥
কুলীন কুমারিগণে করিতে উদ্ধার।
কি জানি ভারতে কে বা হবে অবতার॥
(পৃ ৭০-৭১)

নারীচরিত্র সম্পর্কে বাদ-প্রতিবাদ (পৃ ৩২-৫৯) নিয়ে "চিত্তবিলাসিনী" কাব্যগ্রন্থের 'বাদী-প্রতিবাদী' সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ। লেখিকা গদ্যে লিখিত উপস্থাপনায় জানিয়েছেন—বাদী অম্বিকানিবাসী শ্রীবেণীমাধব মল্লিক ও প্রতিবাদী সুখরিয়ানিবাসী শ্রীদক্ষিণাচরণ মুস্তৌফী নব্য সম্প্রদায়ের কয়েকজন ব্যক্তির উপস্থিতিতে তর্কযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। বাদী মহিলা-বিদ্বেষী ও স্ত্রীশিক্ষা-বিরোধী এবং নারী-জাগরণকে তিনি সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর ভাবেন। অন্যদিকে প্রতিবাদী (যিনি লেখিকার উদারহৃদয় স্বামী বা তাঁর বংশের অন্য কোনো ব্যক্তির প্রতীক) নারীর মহীয়সী অস্তিত্বের উপাসক এবং তিনি মনে-প্রাণে 'বন্দিনী-বামা'কুলের মুক্তি কামনা করেন। (কৃষ্ণকামিনী দাসীর সমগ্র জীবনকথা জানা না থাকায় প্রতিবাদীর মতো বাদীও তাঁর কোনো পরিচিত জগৎ থেকে এসেছেন কিনা জানা যাচ্ছে না।) মাঝে-মাঝে বাদী ও প্রতিবাদী নিজেদের যুক্তির সমর্থনে শাস্ত্র থেকে সংস্কৃত শ্লোক (লেখিকা পাঠক-পাঠিকার সুবিধার জন্য শ্লোকগুলির কবিতায় বঙ্গানুবাদ করে দিয়েছেন) উদ্ধৃত করেছেন। নারী-চরিত্র সম্পর্কে এঁদের এই কবিতাযুদ্ধ এত হৃদয়গ্রাহী যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উদ্ধৃতি-যোগ্য। তার মধ্যে একটি অংশ উদাহরণস্বরূপ উপস্থিত করা হল:

বাদী।
* * *
স্ত্রীজাতি চরিত্র আমি জেনেছি বিশেষ।
অনিষ্ট ক্রিয়ায় যায় নাহি পরিশেষ॥ (পৃ ৩৪)
* * *
প্রতিবাদী।
* * *
বিদ্যাবতী গুণবতী নারী যদি হয়।
অনিষ্টসাধনে তার মন নাহি লয়॥
অতএব স্ত্রীগণেরে বিদ্যা শিখাইলে।
সন্দেহ নাহিক তায় শুভ ফল ফলে॥
বিনা দোষে দোষ দেওয়া অতি অনুচিত।
অনিষ্টের সৃষ্টিকর্তা পুরুষ নিশ্চিত॥ (পৃ ৩৫)

"চিত্তবিলাসিনী" কাব্যগ্রন্থে কাল্পনিক কথোপকথন জাতীয় পূর্বোক্ত রচনাগুলির বাইরে অন্য ধরনের লেখাও লেখিকা আমাদের উপহার দিয়েছেন। এগুলির অধিকাংশই বিভিন্ন ঘটনা ও সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে একজন নারীর উক্তি বা মনোভাব। কবিতা-গুলির শিরোনাম থেকে তাদের বিষয়বস্তুর হদিশ মিলবে: 'বিরহিণীর উল্লাস' (পৃ ৮-৯), 'লম্পট ব্যক্তির পত্নীর সহচরী সমীপে বিলাপ' (পৃ ২৩-২৪), 'নায়ক আশয়ে নায়িকা জাগরণে যামিনী যাপন করিয়া প্রভাতে সখি প্রতি বলিতেছেন (পৃ ২৪-২৫), 'কোন বিরহিণীর বিলাপ' (পৃ ২৫-২৭), 'নিদ্রোত্থিত বিরহিণীর বিলাপ' (পৃ ২৭-২৮), 'আমার প্রতি প্রাণেশ্বরের উক্তি' (পৃ ২৮-২৯), 'মৎকর্তৃক প্রাণেশ্বর সমীপে লিপি প্রেরণ' (পৃ ৩০), 'নববিবাহিতা কামিনী' (পৃ ৩০-৩২) এবং 'মৎসন্নিধানে প্রাণেশ্বরের লিপি প্রেরণ' (পৃ ৭২)।

তবে সবচেয়ে ভালো লাগে 'দিবাবসানের শোভা' (পৃ ১৩-১৪)—যেখানে লেখিকার স্বভাব-বর্ণনা স্বাভাবিকতার মাধুর্যে আমাদের অভিভূত করে। চলচ্চিত্রের মতো সেখানে শেষ সূর্যের ম্লান আলো, রমণীয় প্রদোষকাল এবং চন্দ্র- ও তারকাখচিত প্রথম রাত্রি ক্রমশ দৃশ্যমান হয়েছে:

ভাস্করের ম্লান করে যত তরুগণ।
সুবর্ণ পত্রেতে যেন হয়েছে শোভন॥
* * *
অরুণ কিরণ হলো ক্রমেতে বিলয়।
রমণীয় কাল অতি প্রদোষ সময়॥
* * *
এমতে হইল ঘোর রজনী আগতা।
ক্ষণকাল করে হলো ধরণী ব্যাপিতা॥
তপন তাপেতে যারা আছিল গোপন।

অসংখ্যক গ্রহগণ দিল দরশন॥ (পৃ ১৩-১৪)

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কৃষ্ণকামিনী দাসী-রচিত উক্ত কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর তারিখের "সংবাদপ্রভাকর" পত্রিকায় লিখেছিলেন—'আমরা পরমানন্দ-সাগর-সলিলে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে "চিত্তবিলাসিনী" নামক অভিনব গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া পাঠানন্তর চিত্তানন্দে আনন্দিত হইয়াছি, অঙ্গনাগণের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে যে সুপ্রণালী এদেশে প্রচলিতা হইতেছে, তাহার ফল-স্বরূপ এই গ্রন্থ,.....অবলাগণ বিদ্যানুশীলন পূর্ব্বক অবনীমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিতা হয়েন ইহাই আমার দিগের প্রার্থনা।' গুপ্তকবি তাঁর সমালোচনার শেষাংশে লেখিকার রচনার নিদর্শনস্বরূপ এই একান্ত দুষ্প্রাপ্য কাব্যখানির কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করেছিলেন। লেখিকার রচনাশৈলী সম্বন্ধে বলা যায় যে সেখানে ঈশ্বর গুপ্তের রচনার প্রভাব বিদ্যমান।

কেউ-কেউ মনে করেন "চিত্তবিলাসিনী" কাব্য (১৮৫৬ খ্রী) বঙ্গমহিলা-রচিত সর্বপ্রথম প্রকাশিত পুস্তক নয়। এই প্রসঙ্গে তাঁদের বক্তব্য—"মিসেস মুলেন্স" (Mullens) ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে "স্ত্রীলোকদের শিক্ষার্থে বিরচিত 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (৩০৬ পৃ) প্রকাশ করেন। স্থানীয় লোকের মুখে শুনিয়াছি, ইনি একজন বঙ্গমহিলা, চক্রবেড়িয়া-নিবাসী খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ভগবানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা, পাদরি মুলেন্সকে বিবাহ করেন। ভিন্ন এক সূত্রে জানা যায় রেভারেনড জোসেফ মুলেন্সের পত্নী 'হানা ক্যাথেরিন মুলেন্স বাংলাভাষা এরূপ আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে তিনি 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' নামে একখানি সুপাঠ্য বাংলা পুস্তক রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।' দ্বিতীয় এই বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে মিসেস মুলেন্স বঙ্গমহিলা ছিলেন বলে মনে হয় না। এ ছাড়া, ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' যদি কোনো বাঙালি মহিলার দ্বারা লিখিত হত তা হলে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে

* 'অধিবেদন' শব্দের অর্থ 'এক স্ত্রী সত্ত্বেও পুরুষের পুনর্বার বিবাহ'।

কৃষ্ণকামিনী দাসী তাঁর রচিত পুস্তকের ভূমিকায় 'অদ্যাপি অস্মদ্দেশীয় মহিলাগণের কোনো পুস্তকই প্রচারিত হয় নাই'—এমন কথা ঘোষণা করতে পারতেন না। তবে প্রথমোক্ত জনশ্রুতির কথা সত্য ভাবলেও অর্থাৎ মিসেস মুলেন্স প্রাক্-বিবাহ জীবনে মিস চট্টোপাধ্যায় হলেও উপন্যাসের ধারায় রচিত "ফুলমণি ও করুণার বিবরণ" হবে বঙ্গমহিলা-রচিত প্রথম প্রকাশিত পুস্তক। সেক্ষেত্রেও বঙ্গমহিলা-রচিত সর্বপ্রথম কাব্যগ্রন্থের গৌরব 'চিত্তবিলাসিনী'র প্রাপ্য। আবার কৃষ্ণকামিনী দাসী কোনো লেখকের ছদ্মনাম হইতেও পারে—এমন কথা একক্ষেত্রে বলা হয়েছে। কিন্তু 'চিত্তবিলাসিনী' গ্রন্থে লেখিকার 'আত্মপরিচয়' অনুসরণ করলে ও সুজননাথ মিত্র-মুস্তৌফী লিখিত 'উলার মুস্তৌফী বংশ' পড়লে লেখিকার অস্তিত্বের বাস্তবতা অবশ্যই প্রমাণিত হবে। আসলে "চিত্তবিলাসিনী" কাব্যগ্রন্থের উৎকর্ষ কোন বাঙালি গৃহিণীর প্রতিভাজাত—একথা সহজে স্বীকার করতে না চেয়ে উদ্ভট তত্ত্বগুলি 'উদ্ভাবিত' হয়েছিল। সবদিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে "চিত্তবিলাসিনী" বঙ্গমহিলা-রচিত সর্বপ্রথম প্রকাশিত পুস্তক। অসাধারণ এই কাব্যগ্রন্থটি সে-যুগে পাঠকচিত্তকে উদ্বেলিত করেছিল। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বামাকুলের শিক্ষার সামান্যতম সুযোগের দিনে সমাজ-সচেতন লেখিকা তাঁর একমাত্র পুস্তকে নারীজাতির বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাকে সমাধানের ইঙ্গিত-সহ যেভাবে উপস্থিত করেছেন, তা অবশ্যই প্রশংসার্হ ও অভিনন্দনযোগ্য।

ভ্রমসংশোধন

চতুরঙ্গ মে '৯০ সংখ্যায় ৭৬ পৃষ্ঠায় সুরজিৎ ঘোষের বই এর নাম হবে "ভাসান চলে জলে স্থলে"। এই সংখ্যার ১৬ পৃষ্ঠায় "উজান-যাত্রা" কবিতার অষ্টম পঙক্তির শেষ শব্দটি হবে "যোধন"।

মার্চ '৯০ সংখ্যায় ৯৮৪ পৃষ্ঠায় প্রথম কলমে ১১শ লাইনে পড়তে হবে "বারো বছরের নেয়ে", ৯৮৬ পৃষ্ঠায় "চিত্রবাঘ" কবিতার প্রথম লাইনে হবে "ফুলশেজে এবং ৯৮৫ পৃষ্ঠায় প্রথম কলমে ২৯তম লাইনে 'ঘটনা' কথাটি বাদ যাবে।

বাঙলা সাহিত্যে গ্যেটেচর্চা

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীর নানা ভাষায় নানা সাহিত্য—সব নিয়ে বিশ্বসাহিত্য। নানা ভাষার নানা সাহিত্যিক আর তাঁদের সাহিত্যের নামটুকু পৌঁছয় আমাদের কাছে। ভাষার প্রাচীর ভেদ করে সবটুকু জানা সহজ নয়। অনুবাদে খানিক আসে বটে, কিন্তু তাতে সামগ্রিক স্বাদ পাওয়া যায় না। অথচ এ ছাড়া উপায়ও নেই। অনুবাদও সব সময় জোটে না, জুটলেও তাকে সর্বদা সার্থক অনুবাদ বলা চলে না। কখনো বা আসে দু-তিন হাত ঘুরে, আসলের পনেরো আনাই তাতে অনুপস্থিত। তবু বিশ্বসাহিত্য ব্যাপারটা আছে। তার জন্য গর্বও আছে, আগ্রহও আছে। যা মহৎ, হাতফেরতা অনুবাদেও তার মহত্ত্ব একেবারে ম্লান হয়ে যায় না। সার্থক অনুবাদ যে নেই তা নয়, তবে পরিমাণে তা নিতান্তই নগণ্য। সার্থক অনুবাদ কেন যে এত কম, সে আলোচনা ভিন্ন। আসলে এখনও পর্যন্ত অনুবাদকেরা সাহিত্যিক সমাজে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। এ দৃষ্টিভঙ্গি যতদিন না পালটাচ্ছে ততদিন অনুবাদসাহিত্যের মান উন্নত হওয়া কঠিন। ততদিন আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুবাদের উপরই ভরসা করব, আর এখানে-সেখানে বিক্ষিপ্ত আলোচনার সূত্রে বিশ্বসাহিত্যের একটা ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা করব। আচার্য সুনীতিকুমার একদা শ্রেষ্ঠ বিশ্ব-সাহিত্যের এক তালিকা প্রস্তুত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। প্রাচীন এবং আধুনিক নানা ভাষা থেকে দশটি সাহিত্য-আয়তনের তিনি উল্লেখ করেছেন। সেই সাহিত্য-আয়তনের মধ্যে রামায়ণ-মহাভারত, ইলিয়াদ-ওদিসি এবং গ্রীক ট্র্যাজেডি, বাইবেলের ওল্ড-টেস্টামেনট, রাজা আর্থারের আখ্যান, আরব্য-রজনী, শাহনামার সঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন শেকসপিয়র, গ্যেটে, টলস্টয় এবং রবীন্দ্রনাথ। অনুবাদ ছাড়া এসব সাহিত্য-আয়তনে কোনো এক পাঠকের প্রবেশ প্রায় অসম্ভব। এদের সম্পূর্ণ অনুবাদই কি হয়েছে আমাদের বাঙলা ভাষায়? সুতরাং নাম শুনেই মেনে নিতে হয় বা খুশি হতে হয় অধিকাংশ বাঙালি পাঠকের। এ তালিকায় দান্তে বা কালিদাস নেই কেন, সে তর্ক তো অনেক দূরের ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ যদিও-বা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে, তবে সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্য পড়েছেন এমন মানুষের সন্ধান খুব বেশি মিলবে না। ইংরেজি ভাষার সঙ্গে আমাদের দেড়শো বছরের উপর যোগ, সেই সুবাদে শেকসপিয়রও আমাদের অনেকের আয়ত্তের মধ্যে। টলস্টয়ের উপন্যাস প্রবন্ধ ইংরেজিতে খুবই সার্থকভাবে অনূদিত হয়েছে, বাঙলাতেও হয়েছে কিছু। তাই টলস্টয়ও আমাদের অনেককিছু জানা। কিন্তু গ্যেটে? গ্যেটের নাটক-কবিতা-উপন্যাসের সংখ্যা চল্লিশোর্ধ্ব। তার সব কটি ইংরেজিতে অনুবাদ হয়েছে কিনা তাও আমাদের সহজে জানার উপায় নেই। ফাউস্তের রচয়িতা হিসেবেই গ্যেটের পরিচয় বাঙালি পাঠকের কাছে। সে বিচারে গ্যেটে তো আমাদের কাছে প্রায় অপরিচিত নাম। তাঁর নামের উচ্চারণ বা বানান নিয়ে তর্কই কি মিটেছে বাঙলায়? অথচ গ্যেটের ইংরেজি অনুবাদ থেকে প্রথম বাঙলায় অনুবাদ করেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর ১৮৫৩ সাল নাগাদ। তারপর তারই গদ্য-অনুবাদ করলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৮৭৯ সালে। এইভাবে যেখানে বাঙালি পাঠকের কাছে

গ্যেটে ও বাংলা সাহিত্য—আজহারউদ্দিন খান। ভারত ও গণতান্ত্রিক জার্মানী মৈত্রী সমিতি। কলকাতা-৭৩। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৯। কুড়ি টাকা।

গ্যেটের পরিচিতির সূচনা, সেখানে আশা করা গিয়েছিল বাঙলায় গেটে-চর্চা গত একশো বছরে আরো ব্যাপক হয়ে উঠবে। কিন্তু তা হয় নি। তার প্রধান কারণ: বাঙালি জার্মান ভাষা চর্চা শুরু করেন অনেক পরে, তাও খুব ব্যাপক আকারে নয়। ইংরেজির পরই, যে য়ুরোপীয় ভাষায় বাঙালি আগ্রহ দেখায় তা জার্মান নয়, ফরাসি। একটা সময় যদিও গ্রীক-লাতিনেরও কিছু পণ্ডিত চর্চা শুরু করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথও একদা জার্মান ভাষা চর্চায় হাত দিয়েছিলেন। সেও বোধহয় গ্যেটের মূল রচনা পড়বার আগ্রহে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'I tried Goethe. But that was too ambitious. With the help of little German I had learnt, I did go through Faust.' রবীন্দ্রনাথের রচনায়, জানি, টলস্টয়ের উল্লেখ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তা নিয়ে টলস্টয়-রসিকদের মনে স্বাভাবিক ক্ষোভও আছে। কিন্তু তুলনায় রবীন্দ্রনাথের রচনায় গ্যেটের প্রসঙ্গ এসেছে বারে-বারে—যার সূচনা হয়েছিল ১৭ বছর বয়সে লেখা এক প্রবন্ধে। কিন্তু রবীন্দ্র-রচনায় গ্যেটে-প্রসঙ্গ কতবার এসেছে তাই দিয়েই তো বাঙালি পাঠকের গ্যেটেচর্চার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে না। বিদ্যাসাগরে যার সূচনা, রবীন্দ্রনাথে যার ব্যাপ্তি, সেই গ্যেটেচর্চা বাঙলা ভাষায় খুব যে ব্যাপক আকার ধারণ করে নি তার প্রমাণ পাওয়া গেল আজহারউদ্দিন খানের "গ্যেটে ও বাংলা সাহিত্য" গ্রন্থের ৫৯ পৃষ্ঠার বিবরণে। যে বিবরণ প্রস্তুত করতে আজহারউদ্দিন খানকে প্রভূত পরিশ্রম করতে হয়েছে। সেখানে বিদ্যাসাগর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামদাস সেন থেকে শুরু করে দিলীপকুমার রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল পর্যন্ত গ্যেটেচর্চার সন্ধান করেছেন এবং সবশেষে নীরেন্দ্রনাথ রায়ের জবানিতে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, 'আমরা বাঙালিরা জার্মান ভাষার চর্চা করি না। আমরা গ্যেটেকে জানিব অনুবাদে। হয়তো বা অনুবাদের অনুবাদে। সাহিত্যিক মন ইহাতে কতটুকু প্রভাবিত হইতে পারে?' আজহারউদ্দিন এখানে এসেই থামেন নি। বাংলাদেশে গ্যেটে-অনুবাদ এবং গ্যেটেচর্চার খবরও সংগ্রহ করেছেন বিশদভাবে। আজহারউদ্দিনের এই পরিশ্রমজাত গবেষণার পরে আমরাও বোধহয় তাঁর সঙ্গে একমত হব, যেখানে তিনি বলছেন, 'বাংলা সাহিত্যে কাজী আবদুল ওদুদই একমাত্র ব্যক্তি যিনি গ্যেটের রোমাঞ্চকর জীবনী দু খণ্ডে লিখেছেন—এক্ষেত্রে তাঁর দোসর কেউ হন নি। গ্যেটে সম্পর্কে সাধারণ বাঙালি পাঠক যদি কিছু ধারণা পেতে চান তাঁর বইটিই সম্বল···ওদুদ সাহেবই একমাত্র লেখক যিনি সারাজীবন গ্যেটেময় হয়েই ছিলেন।' সত্যি অবাক হতে হয় বাঙলা ভাষায় গ্যেটে-সম্পর্কিত বই বলতে ওই একখানাই। তাও ওদুদ সাহেবের বই এখন আর পাওয়াই যায় না। অথচ বাঙালি পাঠকের গ্যেটের সম্বন্ধে আগ্রহ এবং অনুসন্ধিৎসা যে এখনও সজীব, তার প্রমাণ আজহারউদ্দিন খান সাহেবের বইখানির দুটি সংস্করণ হয়ে গেল।

আজহারউদ্দিন খান সাহেব তাঁর এই ক্ষুদ্রায়তন বইটিকে (কার্যত ৮৮ পৃষ্ঠার বই) সাজিয়েছেন তিন ভাগে। প্রথম অংশে আছে গ্যেটের জীবনকথা। মূল তথ্যগুলি যথাযথ রেখেও সাবলীল কাহিনীর ছলে তিনি গ্যেটের জীবনকথা বলেছেন। তবে ইংরেজি উদ্ধৃতিগুলি সংক্ষিপ্ত করলে বা বাঙলায় তর্জমা করে দিলে ইংরেজি-না-জানা পাঠক-পাঠিকাও সহজে বইটির প্রতি আকৃষ্ট হতেন। নেপোলিয়ন এবং গ্যেটের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের সবটুকুই কি তিনি বিরোধিতা করেছিলেন? দাঁতো এবং রোবসপিয়রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ অনুক্ত থাকায় ফরাসি বিপ্লব সম্পর্কে গ্যেটের ধারণা সম্বন্ধে পাঠকচিত্তে কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তি গড়ে উঠতে পারে। পরবর্তী অধ্যায়ে আছে বাঙলা সাহিত্যে গ্যেটের অনুবাদ এবং আলোচনা। স্বভাবতই সাময়িক পত্রিকা ঘেঁটেই অধিকাংশ তথ্য উদ্ধার করতে হয়েছে। ফলে এ অংশটি একটি অপরিকল্পিত তালিকায় পর্যবসিত হয়েছে। তবে বীতশোক ভট্টাচার্য-কৃত নির্ঘণ্টের সাহায্যে পাঠক তাঁর অভীপ্সিত তথ্য খুঁজে বার করতে পারবেন। গ্যেটের অনুবাদের সিংহভাগই ইংরেজির সূত্রে। মূল জার্মান থেকে বাঙলায় গ্যেটে অনুবাদের একটা তালিকা থাকলে খুশি হওয়া যেত। এই সূত্রে গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদের প্রসঙ্গ মনে পড়ছে। এক সময় এই অনুবাদের বেশ খানিকটা হাতে এসেছিল। কিন্তু সাহিত্য অকাদেমিকে তা প্রকাশে আগ্রহী করে তোলা যায় নি। ঠিক মনে পড়ছে না, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদকর্মে তিনি যেন মূল ফাউস্টের সঙ্গে মিশিয়ে দেখার চেষ্টা করেছিলেন কারো সাহায্য নিয়ে—এমন কথাই বলেছিলেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। সে অনুবাদ এখনও যদি উদ্ধার করা যায়, তাহলে বাঙালি পাঠক সেই উদ্ধারকর্তার কাছে সুনিশ্চিতভাবে কৃতজ্ঞ থাকবেন।

পরিশিষ্ট অংশে "গ্যেটের গ্রন্থপঞ্জী" নিশ্চিতভাবেই পাঠকের আগ্রহ জাগাবে। তবে মূল গ্রন্থে যথেষ্ট প্রবেশ না থাকায় গ্রন্থপঞ্জীটি নিদারুণভাবে অসম্পূর্ণ। গ্রন্থপঞ্জীটি কালানুক্রমিকও নয়, বিষয়-উল্লেখও নেই সর্বত্র। তা ছাড়া, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ইংরেজি অনুবাদের উল্লেখ থাকায় মনে হতে পারে, বাকিগুলি অনুবাদ হয় নি। তাহলে তো ধরে নিতে হয় ফাউস্টও ইংরেজিতে অনূদিত হয় নি। গ্যেটে-সম্পর্কিত মাত্র একটি জার্মান গ্রন্থ এবং উনিশটি ইংরেজি গ্রন্থ নিশ্চিতভাবে সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী নয়। হতে পারে এই বই কথানিই আজহারউদ্দিন সাহেব ব্যবহার করেছেন।

বইটিতে কয়েকটি ছবি দেওয়া হয়েছে। ছবিগুলি সুমুদ্রিত নয়, কিন্তু জরুরি। আজহারউদ্দিন খানের এই গ্রন্থের অঙ্গসৌষ্ঠবে যথেষ্ট গরিবিয়ানার ছাপ আছে। তাতে লেখকের কুণ্ঠিত হবার কোনো কারণ নেই। এমন জরুরি কাজ এদেশে সহজে কেউ করতে এগিয়ে আসেন না। আজহারউদ্দিন খানের বই বিষয়গৌরবেই ধনী। ছাপা বা অন্য ক্ষেত্রে যদি কোথাও দৈন্যের ছাপ থেকে থাকে, তাতে এটাই প্রমাণ হয় যে আমরা এখনও কোন্‌টা জরুরি কাজ তা বুঝে উঠতে শিখিনি। কবে শিখব তাও জানি না।

□

কত রূপে হে কবিতা, তুমি

মতি মুখোপাধ্যায়

কবি এক অর্থে তান্ত্রিক। তন্ত্রোক্ত সাধনপ্রক্রিয়ার মতো শবাসনে আসীন হয়ে তিনিও জাগাতে চান

শব আর শঙ্খ ভৈরবী—রফিকউল ইসলাম। পত্রলেখা, ৯/৩ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯। ১৯৮৯। পৃ ৫৬। পনেরো টাকা॥ **সর্বহারা, তবু অহংকার**—দেবী রায়। মিরান্দা, ২৩৮ মানিকতলা মেন রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪। পৃ ৫২। বারো টাকা॥ **নির্মাণে এসেছে**—উত্তম দাশ। মহাদিগন্ত প্রকাশ সংস্থা, বারুইপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ৭৪৩৩০২। ১৯৯০। পৃ ৯২। কুড়ি টাকা॥ **ঘর ও আকাশের গল্প**—মঞ্জুষ দাশগুপ্ত। মহাদিগন্ত প্রকাশ সংস্থা, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। ১৯৯১। পৃ ৬৩। বারো টাকা॥ **ভালোবাসা কলম্বাসের জাহাজ**—বিপ্লব মাজী। প্রকাশনা, মেদিনীপুর। ১৯৮৯। পৃ ৮০। দশ টাকা॥ **শিকারী! জলের স্পর্ধা কতদূর**···—সৈয়দ সমিহুল আলম। আপেক্ষিক। ৬৫/৬ বাজে শিবপুর রোড, হাওড়া-৭১১১০২। ১৯৯০। পৃ ৬৪। আট টাকা॥ **কলা বৌ**—সংযম পাল। প্রকাশক তরুণ প্রিন্টার্স, ২৯ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩। ১৯৮৯। পৃ ৪০। পাঁচ টাকা॥ **উদাস দুপুরে কেউ আসে**—নীতীশ চৌধুরী। তরুণ পাবলিশার্স, ২৯ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩। ১৯৮৮। পৃ ৩২। ছয় টাকা॥ **একসঙ্গে**—নীহারকণা দাস দে ও ডাঃ গৌরমোহন দাস দে। রূপা, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩। ১৯৮৯। পৃ ১৬০। তিরিশ টাকা॥ **শ্রীকান্ত বর্মার কবিতা**—ভূমিকা ও ভাষান্তর দেবী রায়। মডেল পাবলিশিং হাউস। ৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩। ১৯৯০। পৃ৫৬। পনেরো টাকা॥ **ফারনানদো পেশোয়ার কবিতা**—বিপ্লব মাজী, অজিত মিশ্র। প্রকাশনা, শরৎপল্লী, মেদিনীপুর। ১৯৮৯। পৃ ৫৬। আট টাকা॥

ভয়ঙ্করী মানসপ্রতিমাকে। অবশ্যই সে প্রতিমা শব্দের। শোনা যায় তান্ত্রিক সাধনা রীতিমতো কষ্টসাধ্য, সাধকমাত্রেই সফল হন না। প্রকৃত কবি হয়তো তাই। কিন্তু রফিকউল ইসলাম তাঁর এই দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে যে সফল, তার নজির দেখাতে হলে পুরো বইটাই উদ্ধৃত করতে হয়।

'মৃত শরীরের চেয়েও মহৎ কিছু পুড়ে যাচ্ছে / চিতার অগোচরে / নিশিপার্বণে মেতে উঠছে মানুষ' (শব আর শব্দ ভৈরবী)। এভাবে শ্মশানচারী কাপালিকের মতো রফিক জাগিয়ে তুলেছেন চলমান সময়ের এক সঙ্কটের ছবি। কত সহজে উচ্চারণ করতে পেরেছেন, 'এই স্থিরগ্রন্থ ক্ষণে / উন্মুক্ত নিসর্গ নিঃশব্দে দেখে নেয়: মানুষ কিভাবে / আত্মবৃক্ষ থেকে খুলে দেয় হোমাগ্নির কাঠ, / জ্বলে ওঠে আগুন, / ছুটে যায় অশ্বমেধের ঘোড়া···' (অশ্বমেধ)।

কোনো কবিতা শুধুমাত্র চিত্রধর্মিতার কারণে নয়, স্মরণীয় হয়ে থাকে ইতিহাস লোকগাথা শাস্ত্রোক্ত উপাখ্যান ইত্যাদি নানান লৌকিক উপাদানে কাল-নিরপেক্ষ সত্যে পরিণত হওয়ায়। অথচ কবিতা জীবন বাদ দিয়ে নয়, জীবনের বাঁকে-বাঁকে নতুন মূল্যবোধ আবিষ্কারের চেষ্টা। রফিকের কবিতায় একদিকে যেমন পূর্ণতারদিকে যাত্রা, অন্যদিকে খণ্ড জীবনের জন্য মমতা। 'শ্বেতকেতু ঘরে নেই, তাই মা'র হলুদছোপ শাড়িতে / আজ পেট্রোলের গন্ধ, / মা'র মেয়েদের অগ্নিদগ্ধ লাশের মিছিল / পোস্টমর্টেম থেকে মর্গে / মর্গ থেকে সারিবদ্ধ চিতায়' (শ্বেতকেতুর উপাখ্যান)।

যে কবি সত্যে বিশ্বাসী, সে কখনো সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য, বিচারের জন্য উলগুলান বা বিপ্লবের ডাক দিতেও দ্বিধা করে না। 'মাতা করমি এসে তুলে নিলেন বুকে, / তাঁর কালো পাথরের শরীর জুড়ে খোদাই করা / থাবার মানচিত্র, শিকলের অহংকার, / শুধু জোয়ার ছিল স্তনবৃন্তে দুধের ঝরনায়।' (উল-গুলান)। আবার কখনো 'কৃষ্ণতিথিতে' দেখেন, 'পুত্রস্পর্শে ফিরে পাওয়া বিবর্ণ শৈশব / মুঠোয় খোঁজে ধোপানির ঘাট··· / সেদিন গাঙ্গুরের স্রোত বেয়ে ভাসান গান / লাফিয়ে ওঠে ময়ূরপঙ্খী ভেলায়, / বৈরাগ্যের মেঘ ভাসে সপ্তকের তারে।'

রফিক জানেন শব্দের জাদু। সাপুড়ের বাঁশির টানে সাপের হেলে-দুলে ওঠার মতো শব্দেও লাগে নাচনের দোলা। শব্দের বিচিত্র বর্ণালী প্রকাশের জন্য কোথাও অত্যুক্তি বা প্রগল্‌ভতা নেই, বরং পাওয়া যায় এক মিতবাক সংযম যা নাকি একজন প্রকৃত রসবেত্তা শিল্পীর কাছে প্রার্থিত। 'কাছে পিঠে বজ্র-পতনের তানপুরায় বেজে উঠতো / তোমার অস্ফুট স্বরবৃত্ত।' 'রাতের চণ্ডাল অবিরত মহুয়ার ভেতর / মৃত্যুশোক মুছে / টানটান দাঁড়ায়।' 'ধ্যানস্থ জলের মতন পদ্মকাঁটায় বুক / অহর্নিশ রক্তপাতে গুঢ় টান-টান।' 'ফণিমনসা জানে / কিভাবে ধরতে হয় চাবুক।' এমনি ব্যঞ্জনা-সমৃদ্ধ শব্দমিছিলে আশ্চর্য রৌদ্রকরোজ্জ্বল ছবি, যা কবিতা সম্পর্কে শ্রদ্ধা জাগায়। কিংবা এমন ধারণা অযৌক্তিক নয়—রফিক 'শিল্পের পরিমিতি-বোধের মূল রহস্য জেনেছেন বলেই গ্রহণ আর বর্জনের মধ্যবর্তী সাঁকো ধরে অবলীলায় হেঁটে গেছেন গন্তব্যের দিকে।

শিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রচ্ছদ চমৎকার।

যে-কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার একটি নির্দিষ্ট অভিমুখ থাকে এবং অন্তিমে যে ফল পাওয়া যায় সেটিও নির্দিষ্ট। কিন্তু জীবন-রসায়নের ক্রিয়ায় কি প্রতিক্রিয়ায় সর্বদাই এক ফল পাওয়া যায় না, আশাও করা উচিত নয়। এই কারণে সময় এবং দৃষ্টির ফারাকে জীবন বিচিত্ররূপে বিম্বিত হয় শিল্পের দর্পণে। কবিতা জীবননিরপেক্ষ নয়, সময়-উদাসীন হতে পারে না বলেই কবিতার আকাশে নানা রঙের মেঘের খেলা। কোথাও কাপাস তুলোর মতো হালকা মেঘের ঢুলকি চাল, কখনো বজ্রগর্ভ কালো মেঘের বিজলি চাহনি।

সেই "হাংরি-সময়" থেকে দেবী রায় আলাদা গোত্রের কবি। তাঁর কবিতা পড়ার সময় আলগা শরীর টানটান হয়ে ওঠে। সেগুলি যে কল্পনালতা নয় বরং বস্তুবাদী এবং জীবনসর্বস্ব, তা তাঁর "সর্বহারা, তবু অহংকার" কাব্যের ২৯টি কবিতায় ছড়িয়ে আছে। দেবী রায়ের প্রিয় বিষয় মানুষ। আলোয়-অন্ধকারে, সংঘাতে-প্রেমে, নিষ্ঠুরতায়-ভালোবাসায়, উদাসীনতায়-আসক্তিতে মানবজীবন দারুণ ভাবে দ্বান্দ্বিক। "মানুষ মানুষ" নামে দীর্ঘ কবিতায় সেই বিরোধাভাস: 'মানুষের কাছ থেকে মানুষ, ত্রস্তে-দূরে সরে যায় / মানুষের কাছে হাত জোড় করে মানুষ—মানুষের চেয়ে আর কে এমন অসহায়!' (মানুষ, মানুষ)। এক মানুষ, বিচিত্র তার রূপ,—ধান্দাবাজ, লম্পট, মাস্তান, নেশাখোর, বেশ্যালয়ের সৃষ্টিকর্তা, চক্রান্তকারী—কী নয়। কিন্তু সেটাই কি মানুষের একমাত্র রূপ? 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১ মানুষ / জীবনানন্দ দাশ ১ মানুষ' যেমন, তেমনি রাইফেলের সামনে বুক চিতিয়ে ধরা মানুষও মানুষ। আসলে বিচিত্র ব্যবস্থার এবং শোষণের শিকার মানুষ স্ববিরোধী। অজস্র বিরোধের ধোঁয়াশায় যে কারণে হয়তো কবির সিদ্ধান্ত: 'কবিতার জন্য মানুষ। মানুষের জন্য কবিতা।'

মানবিক চেতনায় প্রাগ্রসর কবি সোজাসুজি বলতে পেরেছেন, 'মহাশয় / উপচে ওঠো, মাথা চাড়া দাও / লক্ষ্য করো: জলাশয় / সে-ও উপচে ওঠে কোনো এক সময় / ব্যথায়-বেদনায় আর না পাওয়ার ক্রোধে / ক্রমাগত হেনস্থায়— / নাকি, রক্তের ঋণ শোধে / না, বদলা নেবে বলে / বদলায়' (মিছিলে—বেলা যায়)।

মাধ্যমের ঘনত্বের কারণে প্রতিস্থত রশ্মির বাঁক নেওয়ার মতো কবিতায় ব্যঞ্জবিদ্রূপের ঝুলঝুরি চোখে পড়ে। আমাদের এই সময়ের অমানবিকতা, অসাম্য, দাসত্ব কবিকে পীড়িত করে বলেই শব্দের চাবুক তুলে নিয়েছেন হাতে। 'জান্তে যদি চাও, বাবাজী / যাও চলে তার মূলে / বিবেচনার দয়ার কাজে আর কত-কাল, রাজী? / 'মন ভালো ক'রে পড়্‌গা ইস্কুলে' (স্বদেশ)। কিংবা 'ছিন্ন কবিতা'য় 'রাবার ষ্ট্যাম্প / রাবার ষ্ট্যাম্প, জানো কি ক্ষমতা কতো সীমাবদ্ধ!'

যারা কবিতায় সোজাসুজি কথা বলা পছন্দ করে না, জীবনের নগ্নতাকে পাশ কাটিয়ে চায় রহস্য-ময়তা অথবা শব্দের একাধিক কৌণিক প্রতিফলন, তাদের কাছে এ ধরনের কবিতার মূল্য যাই হোক না কেন, সর্বহারার 'অহংকার' বলতে কিছু থাকে। যোগ্যক্ষেত্রে কবি ও কবিতার থাকা উচিত।

অপরূপ উকিলের প্রচ্ছদচিত্রটি ভালো।

শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে নিজস্ব কল্পনায় কবিতার একটা স্থাপত্য গড়ে ওঠে। কিন্তু স্থাপত্যের মতো তা কখনোই নিষ্প্রাণ বস্তুমাত্র নয়। আসলে কবিতা কেবল নির্মাণ নয়, তার একটা আত্মাও থাকে। আত্মার সদাজাগ্রত ক্রিয়ায় জারিত হয় কবিতা, অর্থাৎ কিনা প্রাণ পায়।

ষাট-দশকের প্রখ্যাত কবি উত্তম দাশের নবম কাব্যগ্রন্থ "নির্মাণে এসেছি", কিন্তু তা নির্মাণসর্বস্ব নয়। অন্তর্গত আত্মার বিচিত্র প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত। একটি কাব্যনাটক বাদ দিলে বাকি ৫৩টি কবিতার ভিতর ৩টি দীর্ঘ কবিতা। কবিতার দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় কবি অর্জন করেছেন এমন এক স্থিতধী মনস্কতা আর আলোকিত প্রত্যয়, যার উপর ভিত্তি করে অনায়াসে বলতে পারেন: 'যুবকের রক্ত ঠিক দেবতার নয় / প্রাচীন স্থাপত্য ভেঙে সেই যে দাঁড়ালো / আর কারো উচ্ছিষ্ট সে কখনো ছোঁবে না।' (যুবকের প্রতিচ্ছবি)। ষাটের কবিতার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য ময়তা এবং আত্মানুসন্ধান, পঞ্চাশের প্রগল্‌ভতা বা সত্তরের লড়াকু প্রবণতার মাঝখানে হাইফেনের মতো ওই সঙ্কোচ, যা আত্মবিশ্বাসে দৃঢ় অথচ ব্যবচ্ছেদে উদ্‌গ্রীব। 'আত্মার পোড়াগন্ধে' যে কারণে কবির ভাষ্য: 'খুব কষ্টে পুড়ে যাচ্ছি / তুলে ধরো, বাতাস শুশ্রূষা দাও। / আত্মার পোড়াগন্ধ

তাও কি পাও না।'

প্রবল সামাজিক প্রতিকূলতার মধ্যেও মানবিক হার্দ্য আবেগে ঐকান্তিক শুভেচ্ছায় একটি আর্ত জিজ্ঞাসা ছুঁড়ে দেন। 'জন্মাবধি দেখে যাচ্ছি, আমার সারল্যে / আর কত কপটতা মেশাতে পারো?' [জন্মাবধি] মনে হতে পারে অসহায় কিংবা নিরাশা-পীড়িত। কিন্তু পরমুহূর্তেই বুকের জ্বলন্ত বিশ্বাসে স্তোত্রের মতো উচ্চারিত হয়: 'সংঘবদ্ধতার কাছে ফিরে এসো, / একদিন ফিরে আসতে হয় নিজস্ব নির্মাণে।' [তত ভালো নেই]

ষাটের অন্যতম শক্তিমান কবি রবীন সুরের অকালপ্রয়াণে নিবেদিত ছটি পত্র ব্যক্তিগত সংলাপতার ঊর্ধ্বে উঠে কবিহৃদয়ের শাশ্বত ভালোবাসার প্রতি-রূপ পেয়েছে।

ভ্রমণ-বিষয়ক বেশ কিছু কবিতা এই গ্রন্থে পাওয়া গেল। 'ভ্রমণ'-বিষয়ক কবিতাগুলি যতটা কবির প্রিয় পাঠককে ততটা টানে না। বরং "আন্দামান সিরিজ" ভ্রমণ এবং অভিজ্ঞতা ছাড়িয়ে উত্তরণ পেয়েছে এমন এক মাত্রায়, যেখানে কবির সঙ্গে আমরাও মুগ্ধতায় লক্ষ করি: 'সমুদ্রের নীল মাছি ওড়ে আর সেই / খোলা পিঠ রোদ মেলে কি শান্ত সে শুয়ে / জলযান খুবলে খায় নোনা মাংস তার। / এই যে আহার সংক্রামক বেড়ে / আমাদেরও খায়, প্রাত্যহিকতায়।' [আন্দামান সিরিজ—১]

সামাজিক সত্তার ঊর্ধ্বে ব্যক্তিস্বরূপের আশ্চর্য প্রতিফলন "রুপুকে পুনর্বার" কবিতামালার মধ্যে পাই। গ্রন্থটির শ্রেষ্ঠ ফসল এই কবিতামালা। স্তব্ধবাক চেতনার পারে তীব্র স্পন্দনে যেন স্পন্দিত: 'এ শরীর দারুময় যজ্ঞের সমিধ / নিজেকে পোড়াবে বলে তীব্র জাগরণে / হাজার জন্মের পারে দাঁড়ায়ে রয়েছে।'

আত্মানুসন্ধানের একটি উজ্জ্বল ছবি: "কোথাও আমি।" "কাব্যনাটক" নামে যা উল্লিখিত। থানাদারের জেরার মুখে জঙ্গল থেকে ধৃত একজোড়া তরুণ-তরুণীর বিবৃতি এবং সন্দেহক্রমে আটক আরো দুই ব্যক্তির কৌতুককর এজাহার নিয়ে কাব্যনাটকটি জিজ্ঞাসা আর বোধের মধ্যবর্তী একটি সাঁকো গড়ে তুলেছে। বিশ্বাসযোগ্যতা এবং কাব্যের উজ্জ্বলতার পাশে নাটকীয়তা আরো ঘন হতে পারত।

শিল্পী চারুখানের সুন্দর প্রচ্ছদ।

ভারতীয় সাহিত্যে কাব্যনাটক নতুন কোনো সংযোজনা নয়। প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃত ভাষায় যেসব মহাকাব্য লেখা হয়েছে সেগুলিকে নিছক কাব্যপর্যায়ভুক্ত করায় বোধ করি সুবিচার হয় না। নাটকীয় সংলাপ এবং আঙ্গিকে সেগুলি রচিত। সে সময় গদ্যে নাটকের চল ছিল না। বাঙলার আদি কবি কৃত্তিবাস থেকে নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ অনেকেই কবিতার আঙ্গিকে নাটক রচনা করেছেন। কিন্তু সেগুলিকে সঠিক অর্থে কাব্যনাটক বলা যাবে কিনা সন্দেহ। বাঙলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম সার্থক-ভাবে দীর্ঘকবিতার ভূমিতে কাব্যনাটকের চারা রোপণ করেছিলেন। পরবর্তী কালে বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ একালীন অনেক কবির হাতে তার একটা পরিণত রূপ লক্ষ করা যায়। মঞ্জুষ দাশগুপ্তের "ঘর ও আকাশের গল্প" সেই বহতা ধারার একটি রূপ।

কবিতায় নাটকীয়তা বা নাটকে কাব্যময়তা—কোনোটাই কাব্যনাটক নয়। কাব্যনাটকের নিজস্ব একটা চাল বা ধর্ম থাকে। গদ্যনাটকের মতো সেখানেও কুশীলব, যারা ঘটনার আর ব্যক্তিত্বের সংঘাতের ক্রীড়নক মাত্র। কিন্তু কাব্যনাটকে চরিত্র-গুলির মানসপট যেভাবে উন্মোচিত হয়, গদ্যনাটকে সেভাবে হয় না। তা ছাড়া, কাব্যনাটকে নাট্যকার-কবির একটা ভূমিকা থাকে, তা শরীরী না হলেও প্রস্তাবনা বা স্বগতোক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। কবির ব্যক্তিগত ইচ্ছা, স্বপ্ন, আশা, হতাশা কি ক্রোধ নাটকের কুশীলবের সংলাপে উন্মোচিত হয়। বাস্তবে থেকেও বাস্তব থেকে ঈষৎ সরে আসাও কাব্যনাটকের

অন্যতম ধর্ম। এইসব দিক থেকে বিচার করলে যে চারটি কাব্যনাটক নিয়ে "ঘর ও আকাশের গল্প" সেগুলি যে ধর্মচ্যুত হয় নি, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

"ঘর ও আকাশের গল্পে" প্রাক্-তিরিশ এক নারীর সঙ্গে উত্তর-চল্লিশ এক পুরুষের সংলাপ বিধৃত। "শেষের কবিতা"-র অমিত-লাবণ্যের মতো এখানেও নায়ক-নায়িকা মিলন-বঞ্চিত হয়েও মিলিত হবে কোনো একদিন, হয়তো জন্মান্তরে, প্রচলিত ছকের বাইরে মুক্ত আকাশের ঘরে। 'ঘর নয় তবু ঘর / মন্ত্র নয় তবুও সিঁদুর / তোমার চুলের ভাঁজে করে দেবো সমস্ত উপুড়।'

"সুদর্শনা" কাব্যনাটকের পরিকল্পনায় অভিনবত্ব আছে। স্বয়ংবরসভা যেখানে "প্রণয়" নামে পুরুষের গলায় বরমাল্য দিতে চায় উচ্ছ্বাস, আশা, ঈর্ষা, বিরহিণী, নম্রতা, প্রতিষ্ঠা, মেধা নামে নারীরা। উপস্থিত নারীরা প্রণয়ের পরিণয় কামনা করলেও প্রণয়ের মনোনয়ন পায় না, প্রত্যাখ্যাত হয়। প্রণয় কামনা করে 'সুদর্শনা' নামে এমন এক নারীকে যার ভিতরে থাকবে ওইসব নারীদের ব্যক্তিত্বের আলো অর্থাৎ কিনা যাবতীয় দোষগুণ নিয়ে পূর্ণা এক সুন্দরী।

"মৈত্রেয়ীর কাছে" নাটকটিতে দুই অসমবয়সী পুরুষ-নারীর হৃদয়বিনিময়ের পথে সামাজিক আর সময়ের বাধা এবং অপূর্ণতা মেনে নিয়ে গোপনতার খেলা। চমৎকার একটি সংলাপ: 'এক বাড়ি ভেঙে ফেলে / অন্য বাড়ি··· / স্মৃতি কিছু থেকে যাবে / সে বড় ভীষণ। / আমার তো পিছুটান নেই / তোমার রয়েছে কিছু কিছু / সহজেই যেতে পারি আমি / কিন্তু তুমি?'

"যুদ্ধ কিংবা নির্বাসনে" নাটকীয়তা অনেক বেশি প্রখর। অবিবাহিত এক মধ্যবয়সী পুরুষ আদর্শ তার শূন্যতা আর একাকিত্ব নিয়ে একদিকে, অন্যদিকে একদা প্রেমিকা নারী আর অন্য পুরুষের গৃহিণী ঐহিকা তার চাতুর্য নিয়ে স্বার্থের কারণে। এই নারী উচ্চাশা এবং সুখের মরীচিকার পিছনে ছুটে ধ্বস্ত হয়ে শেষমেশ সমর্পণ করেছিল এমন এক পুরুষের কাছে যে তাকে সুখে রাখতে অনৈতিক কোনো কাজই বাকি রাখে নি। আদর্শ জানে তার অপরাধ, উদ্যত তার শক্তির হাত, কিন্তু তা অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার বদলে প্রমাণ লোপ করতে রাজি হয়। নির্বাসনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, আদর্শ থেকে এহেন ভ্রষ্টাচার কি অন্য একটি সফল প্রেমের কারণে নাকি নিছক করুণায় অথবা মধ্যযুগীয় আত্মত্যাগের মহান কোনো দৃষ্টান্ত রাখার প্রেরণায়? ঠিক বোঝা গেল না ছায়ামূর্তির অন্তিম সংলাপের সত্যতা: 'পরপর ভেঙে যাচ্ছে মানুষের বিশ্বাসী নিঃশ্বাস / কোনো আদর্শই আর দাঁড়াচ্ছে না বিন্দুস্থিরতায় / রাত্রে হেডলাইটের আলো চলকে যাচ্ছে পিছল রাস্তায়··· / তবুও মানুষ যাচ্ছে / নিজের নিজের যুদ্ধে / কিংবা কোনো / স্বেচ্ছার মৃত্যুতে···।'

চারু খানের প্রচ্ছদে ও ভিতরকার ছবিতে বইটি আরো মাত্রা পেয়েছে।

নামকরণের মধ্যেই প্রতীয়মান কবি বিপ্লব মাজীর বইটি প্রেমের কবিতার সংকলন। প্রাক্কথায় তিনি বলেছেন, 'ভালোবাসা রহস্যময়, অজানা সমুদ্রে ঘুরে বেড়ানো জাহাজ। সে জাহাজে যিনি কলম্বাস, তাঁর জীবনে যে সত্যের উপলব্ধি ঘটে তাই এ বইয়ের নামের উৎস। আমার জীবনে বইটি হয়ে উঠবে একটি সজীব মানচিত্র, যার অদৃশ্য দূরবীনে চোখ রেখে আমি দেখতে পাবো পেছনে ফেলে আসা সমুদ্রের স্মৃতি।' নতুন মহাদেশ আবিষ্কারের রোমাঞ্চকর অভিযানের মতো ভালোবাসার জলযাত্রা কখন যে পেয়ে যায় নতুন হৃদয়ভূমি, সে কি তা জানতে পারে? আসলে ভৌগোলিক আবিষ্কারের মতো ভালোবাসাও এক ধরনের সত্যের সাক্ষ্যে, যে সত্যকে সম্পূর্ণ জানা যায় না তখনো। 'ঘুরতে ঘুরতে ভালোবাসা শুধু / অজানা

সমুদ্রে / অভিযানে ঘোরে / হয়তো ছুঁয়েছি মহাদেশ তবু / মূল ভূখণ্ডে / শেকড় নামে না' (ভালোবাসা কলম্বাসের জাহাজ)।

প্রেমের ধর্ম সত্যবদ্ধতায়, তার গোপনতায়, স্বীকৃতিতে। 'জোড়া চুম্বনে হারালো সমাপ্তিরেখা—/ শেকড়ের মতো গভীর রক্তে আর / মাঝে মাঝে এসে স্বপ্নে দিচ্ছে দেখা।'

শব্দপ্রয়োগে প্রতীকী ব্যবহারের কারুকারিতায় কোনো-কোনো কবিতা আশ্চর্য উজ্জ্বলতা পেয়েছে। 'স্তব্ধ চোখ / নীলাভ-সীসার মত ভারি / যেন কোন ইন্‌কাদেবী এসেছিল আজ রাতে কাছে' (হৃৎপিণ্ডের ঘড়ি)। চিত্রকল্পেও মুন্সিয়ানা চোখে পড়ে। 'বকের ডানার মত / শাদা ক্যাথিড্রাল / ঝিঙেফুল রোদে / ভিজছিল।' 'আধফোটা হলুদ গোলাপ আধফোটা হলুদ দুঃখের কুঁড়ি / মালভূমির অসতর্ক ঘাসের মতন যা / ভালোবাসার জন্যে উন্মুখ' (তোমাকে আবিষ্কার করি)।

প্রেম মানে কিন্তু নিকষিত হেম নয়, ভালোবাসাও যে কারণে ছুঁয়ে থাকে বিপরীত শরীর, তার রক্তমাংস নিয়ে যৌনতাকে। "রাতমেয়ে" কবিতায়, 'ঝিনুকের মতো ছোট দুটি স্তন, উত্তল-লেন্স নাভি / নৌকোর ছায়া মৌনফুল ছুঁয়ে চলে গেছে আরো দূরে।' 'কি কি জিনিশে',—'নাভির / নীল গর্ত / ভালোবাসার ডোবা।' "আহত ঈগল" কবিতায়, 'তোমার তামাটে উরুর / ভাঁজ খুলে দেখি; / পাথর, শুধু পাথর / অনেক গভীরে জল-স্তর।'

মোট ৫৩টি কবিতার মধ্যে চলতি কিছু বিজ্ঞাপন আর প্রযুক্তিগত শব্দের অতি-ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন 'নতুন ব্র্যাণ্ডের ডিটারজেন্ট পাউডার', 'মার্কিনী জিনস্', 'স্মৃতির ব্যারেজ', 'কাথোডরে টিউবের মত ক্লান্তিহীন আকাশ', 'উইশু মিলের মত ঘুরছে তোমার দুঃখ রাগ অভিমান ক্রোধ / উদ্ধত স্তনের চূড়ায়', 'প্রিজমের আলোর মত কেঁপে উঠছে শরীর', দৃষ্টিকে প্যান করে / জুমলেন্সে ধরে যাচ্ছো', 'স্মৃতির অ্যানটেনা', 'নাভির লেন্সের কেন্দ্রে', 'জাপানি প্লেনের মত তোমার ম্যাগনেটিক ফিল্ডে', 'কেয়োকার্পিন চুল', 'সাইকেলের রোডস্টার চাকা' ইত্যাদি। যে-কোনো ভাষার কবিতায় অন্য ভাষার বিশিষ্ট শব্দের লাগসই ব্যবহার হয়তো নিষেধের পর্যায়ে পড়ে না, এক ধরনের ঝকঝকে জৌলুস কিংবা স্মার্টনেস আনে, হয়তো উত্তরণও ঘটায়, কিন্তু সবটাই নির্ভর করে সেই শব্দের উপযোগিতার ওপর অর্থাৎ কিনা ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে। ভাবের তরলীকরণ বা রসের হানি কোনোমতে স্বীকার্য নয়। বিশেষ করে প্রেমের কবিতায়, যেখানে বাজারচলতি হালকা শব্দগুলি ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায়।

এই সংকলনে এমন কবিতাও আছে যেখানে বিদেশী শব্দের আশ্চর্য সুন্দর ব্যবহার হয়েছে, যা নাকি নির্বিকল্প এবং সুসমঞ্জস বলতে দ্বিধা হয় না। "হলদিয়া বন্দরে গোধূলি" কবিতায় এই সময় আর জীবনের আশ্চর্য প্রতিভাস কাটা-ছাঁটা শব্দের কোলাজে ফুটে উঠেছে। 'রক্ত ছুঁয়ে নাচছিল / সন্ধ্যার সমাপ্তিরেখা / বন্দরের রং / বন্দরের মানুষের রং / বন্দরের পেট্রলের রং / রিফাইনারির ট্যাঙ্কার, পাইপের রং / গোধূলির স্তব্ধতার রং-এ মিশে যাচ্ছিল।'

কলকাতার বাইরে থেকেও যে সুশোভন গ্রন্থ প্রকাশ করা যায়, বইটি তার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ। মউলি মিশ্রের প্রচ্ছদ দৃষ্টিনন্দন।

অনুভূতির কারণে কবি মাত্রেই স্পর্শকাতর। আত্মসত্তার সঙ্গে পরিপার্শ্বের ক্রমাগত সংঘাত হতে থাকে। অনেকটা তেজস্ক্রিয় পদার্থের মতো উপলব্ধিরও ভাঙচুর হতে-হতে নতুন-নতুন অভিজ্ঞতা গড়ে ওঠে কবির। সর্বদাই যে তা সমান্তরাল হবে এমন কোনো নিয়ম নেই, বরং সচেতন শিল্পী-মনে একটি অপরটির বিরোধীও হতে পারে। মাত্রাবৃত্তে গ্রথিত সমিহুলের "মুখ" কবিতার (ঐ শিশুমুখ, মুখের রক্ত / খুঁড়েছে গর্ত, হাজার মুখের) পাশাপাশি "প্রেম" ('সোনালী

ঢেউয়ের বাহু প্রণয়সমুদ্রে / অবৈধ উষ্ণতা চায় কুমারী তিমির') আমাদের অবাক করে না, বরং সেটাই স্বাভাবিক মনে হয়।

সমিহুল রহস্য ভালোবাসেন। আক্ষরিক অর্থে শুধু না, তাৎপর্যেও রহস্য-আক্রান্ত তাঁর কবিতা। 'উদ্যুনের গায়ে দাগ, উদ্যুনে হিরোশিমা— / প্রবল স্পর্ধায় হলো অভ্রের ফুল।' (চালচিত্র)। কিংবা 'মাংস কই। মাংস কই!' ডেকে এস্কিমো রাজার স্লেজ / ছুটছে ছায়ামাখা, স্বপ্নহীন, জ্যোৎস্নালোকে' (ছুট) 'আজ বর্ষা, আজ আলোর সাতটি বর্ণ / ময়ূরের বিচিত্র পালকে ফুটিয়ে তুলবে / কার্তিক-পুরাণ' (আলোড়ন)।

"ছুট", "বিরুদ্ধতা" এবং "আজিব সন্দেহ" নামে তিনপর্বে গ্রথিত অর্ধশত কবিতার বেশির ভাগই সংক্ষিপ্ত আকৃতির, চার লাইন থেকে আঠারো লাইনের মধ্যে সীমায়ত। কিন্তু ছোটো হলেও নান্দনিক মূল্যে ছোটো নয়। বিচিত্র বর্ণে উৎসারিত আলোকে দীপ্যমান শব্দগুলি। সরল ভাবগত সৌন্দর্যে প্রোজ্জ্বল পংক্তিগুলি মনে রাখার মতো। 'এক পতঙ্গ আরেক পতঙ্গকে ডাকে / ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সমস্ত নিঃস্বতাকে' (স্বয়ম্বর)। 'আজ পুকুরে নাচছে মাছ / মাছের গভীরে জল / শিকারী! জলের স্পর্ধা কতদূর…' (পুকুর)। 'ছুরিটি পড়ো, দেখবে লেখা আছে / আমিই ঈশ্বর / আমিই প্রথম খুনী / এই পৃথিবীর' (প্রথম খুনী)।

এই জীবন, জীবনের বেদনা, প্রতিবাদ—সবই আছে সমিহুলের কবিতায়, স্বল্পে সংহত হয়ে। 'মূক ও বধির বৃদ্ধের মতন' 'পাপপুণ্যহীন' যে জীবন যাপন করছেন সেই ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে সোচ্চারে বলতে পেরেছেন, 'মাংসের জন্য চায় অস্ত্র / রক্তের জন্য ছুরি / প্রেমের জন্যে আত্মহত্যা / মৃত্যুর জন্যে একপ্রস্থ শূন্য বিছানা।' (বিছানা)। যে কবির দৃষ্টিতে অজানা নেই 'আগুনে'র কারুকাজ, তিনিই বলতে পারেন, 'মাংস পোড়ার গন্ধে আপ্লুত সে / একে-একে আবিষ্কার করেছিল / আগুনের ক্রোধ / আগুনের মায়া / দেখে-ছিল / মাংস পোড়ার গন্ধে / মানুষের মাংসের স্বপ্ন / কত ভয়ংকর, কত জীবন্ত হ'য়ে ওঠে…' (আগুন)।

শাবাশ, সমিহুল। সৎসাহস না থাকলে কোনো কবি কি বলতে পারেন, 'ঘুম-ই ঘুমের মা / ঘুম-ই ঘুমের বাবা / ঘুম-ই লালন করে / ভারতীয় রাজনীতির মগজ।'

কবিতা লেখার 'দুঃসহ বাসনার' জন্য ছলনার যে প্রয়োজন থাকে সংযম পালের "কলা বৌ" তার অন্যতম এক্সিবিট। বন্ধুর জীবনের সুবিস্তীর্ণ পথে হাঁটার জন্য কবিতার প্রয়োজন ছিল, আছে এবং থাকবেও। কবিতা তো ছন্দোবদ্ধ শব্দের প্রদর্শনী মাত্র নয়, হৃদয়ের রক্তাক্ত দলিল। অবশ্যই যা 'সম্পদের' অধিকার না হয়ে গভীরতম যন্ত্রণার দাবিদার।

'অমর ভিক্ষুকের' বেশে কবির পদযাত্রা। 'যে পথে হেঁটে গিয়েছে লোভী সে পথে যাই আমি / যে পথে লোভী গিয়েছে পাপী সে পথে পিছু পিছু / আমিও যাই আমিও যাই অমর ভিক্ষুক।' জীবন-বাদী দর্শনের এই এক রূপ। কখনো নিজেকে কাটা-ছেঁড়া করার খেলায় ব্যঙ্গবিদ্রূপের নেশায় অক্ষরবৃত্তের পথে পাওয়া যায় কবিকে। 'সংসার চিনেছি, তার কাঁটাগাছ চোরাপথে অশ্লীল ছড়ায় / ফলকে চিনেছি, তার সিঁদুরে আমার ত্রস্ত ঘরপোড়া ভয় / নিজেকে চিনেছি, দেখি অজীবিত অসহায়, কেন অসহায়' (মার্গ)।

সংযম জানেন শব্দে আর ছন্দে কিভাবে খেলতে হয় সংযমের খেলা। 'তোমার আগুন থেকে শ্বাস নিয়ে এসে তুমি আমাকে বাঁচাবে কিনা বলো / পুনর্বার নীল দেশে, করুণ অপুষ্টি যাকে ভেতরে ভেতরে / ধ্বংস করে না। যার কোষের শাঁসের খাদ্যে অনাহার জেগে / ইন্দ্রিয়কে কেটে কেটে প্রস্তুত করে না' (কালী উৎসবের রাত)।

প্রথম পত্রিকা আর দ্বিতীয় পত্রিকা পর্বাংশে বিভক্ত ২৮টি কবিতায় নানান ভাবে সময়চেতনা এবং আপেক্ষিকে ধর্ষিত মানব-সত্তার সকরুণ প্রতিফলন লক্ষ করা গেছে। 'আগুনকে ডেকে ডেকে বৃথা গেলো মানুষের জনমসাধনা / কত শত বছরের থেকে এই মৃত্যুস্পৃহা, নীতিস্পৃহা বলে / ব্যাখ্যা করা যায় যাকে, শুদ্ধ বিনাশ। আমি রহস্য দেখেছি / পাণ্ডবের জতুগৃহে, পদ্মিনীর অহংকারে, মহুয়ার স্টোভে' (হারামি আগুন)। কবিতায় যারা শুদ্ধতা খোঁজে, জীবনযাপনের ঘোলাজল ও নষ্টামি থেকে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে পবিত্র থাকতে চায়, সংযমের কবিতাকে মর্বিড বলে একমাত্র তারাই মনে করতে পারে।

নিজের মতো করে যাবতীয় স্খলন আর পতনকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন এই কবি। 'এই ঝুলজাল ঘরে, সোঁদা রান্নাঘরে / এক পুরুষের সাথে—পুরুষ না নারী ?'—(ফুল্লরা ১)। কখনো সোজাসুজি প্রশ্ন তোলেন, 'ভাতের থালার থেকে ভারি জুতো বুকে চেপে যখন ফুকারি / তোমার কি মায়া হয় না, তোমার কি মনে হয় না এই / দরিদ্র মাহিষ্য মেয়ে বাপের বাড়িতে গেলে ভাতও পাবে না !' (ফুল্লরা ৩)।

নপুংসক এই সময়ে যখন সর্বত্র ফড়ে এবং দালালের আধিপত্য, যখন 'বারো ঘণ্টা কালরাত্রি, ভূতরাত্রি, তমসাধনার অসভ্য নির্মম রাত্রি' সংযম পেয়েছেন সার্বজনীন অসহায়তার দৃশ্য ফুটিয়ে তুলতে। 'আমি জ্ঞানী নই, সংসারী, এক শাবক এবং নারীর / মূর্খ বিধাতা, খুশী হই, দেখি সারে সারে শেয়ালেরা / দাঁত ভরে পচা মাংস আনছে, শস্যভাঁড়ার থেকে / আনীত খাদ্য, পথে পড়ে থাকে, আমি / কালো ও ক্ষুদ্র কুড়িয়ে কুড়িয়ে নিই' (অনুগামী)।

কবিতার বইয়ের নামকরণ থেকে কবি এবং কবিতা সম্পর্কে কখনো কিছু আভাস পাওয়া যায়। "উদাস দুপুরে কেউ আসে" নীতীশ চৌধুরীর চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ। মোট চব্বিশটি কবিতার ফুলে গাঁথা এই কাব্যমালায় কবির মানসভূমির যে পরিচয় পাওয়া যায় তার মূল সুর আত্মময়তার আর শুদ্ধতার। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী, মানবিকতায় আস্থাশীল, আশাবাদী কবির কবিতায় ক্রমিক আবর্তনে এসেছে রোদ-জল-চাঁদ-মেঘ-শিশির ইত্যাদি নিসর্গের রুদ্ধবাক্ স্নিগ্ধ পরিমণ্ডল। মানবজীবনে যার পরোক্ষ প্রভাব সুদূর-প্রসারী। অথচ এমন নয় জীবন আর সময় সম্পর্কে এই কবি উদাসীন, বরং প্রায়শই জীবনকে অন্বিত হতে দেখা যায় এবং সময়ও প্রতিবিম্বিত হয় সেইসব কোমল শব্দের দর্পণে।

'ফুল ছিঁড়ে কিছু বুকে অনুতাপ জ্বলে, / চোখে চোখে ঝুলে থাকে অশ্রু শিশির ; / সুখের আশায় সেই নিত্য ফেরারি / জানে না ফুলেও থাকে ফন্দি-ফিকির' (জীবন পবিত্র হয়)। জীবনের এহেন বিরোধাভাস ব্যাপারে কবি সচেতন, যে কারণে প্রশ্ন করে, 'বুকের শস্য তেতে সোনা হয়ে আছে, / কে আজ তুলবে সেই সোনা ?' (রোদ রং উজ্জ্বলতায়)।

নীতীশ জানেন সহজ সরল শব্দে চমকপ্রদ ছবি ফুটিয়ে তুলতে। যেমন "ডাক" কবিতায়,—'উঠোনে যেতেই দেখি / পাতাঝরা বকফুল গাছে দুলছে কলিং বেল— / কোমল শরীরে তার পাখির পোশাক।' কবিতায় গুপ্তশিল্পকলার একটি অসাধারণ নজির এই "ডাক" কবিতাটি। নিছক শিল্পসুষমা নয়, মানবিক সংবেদনায় উজ্জ্বল একটি কবিতা "চুল্লী" যাকে দেখে মনে হয়, 'চুল উড়িয়ে / ছুঁয়েছে আকাশ, / উড়ুক, আরও উড়ুক, / ওর চুল উড়লেই তো / মানুষের থালায় আসে ভাত, / চোখে স্বপ্ন / বুকে প্রেম।'

চলমান সময়ের মন্থনে যেখানে উঠে আসে গরল, জীবনপাত্রে সঞ্চিত হয় দুঃখের ভার, সেখানেও প্রদীপ্ত শিখার মতো আত্মবিশ্বাস : 'এভাবেই বিরহ চেনায় প্রেম, / মৃত্যুজীবন / সময়ের সিঁড়ি বেয়ে অসময় আসে আর যায়, / কান্নার নিক্তি বলে দেয় / আর কতো হাসি আছে তাতে' (বিষ নয়)। কিংবা জীবনের বিচিত্র অনুভবের মধ্যেই যে জীবনের প্রকৃত রূপ সেই সচেতনতায় কবি বলেন, 'শব্দে-স্বপ্নে-রক্তে যুদ্ধ, যুদ্ধে জীবন জাগছে, / শব্দগুলো, স্বপ্নগুলো তাই তো ভালো লাগছে' (জীবনযুদ্ধ)।

"দুঃখবিলাস" কবিতায় কবি যে লিখেছেন, 'আবদ্ধ কুয়ো থেকে উঠে আসে কৃষ্ণকায় হাওয়া— / যার নাম দীর্ঘশ্বাস— / দুঃখবিলাস।' কিন্তু সেটাই যে সত্য নয় সে ব্যাপারে কবি সচেতন বলেই লিখতে পেরেছেন, 'এখন কোথাও আর কেউ ভালো নেই' একথা জেনেও ; প্রতীক্ষায় বসে থাকে মন, / পৃথিবীর মানুষেরা ভালো আছে, এই কথাটুকু / শোনার দুরাশা নিয়ে প্রতীক্ষায় থাকে, / খোলা থাকে হৃদয়ের, জীর্ণ কপাট, / থাক, / যদি / উদাস দুপুরে কেউ আসে।'

"একসঙ্গে" নামের কবিতার বইটি এক কবিদম্পতির যৌথ কাব্যচর্চার ফসল। শুরুতে এবং ভূমিকায় বলা হয়েছে, একজন চিকিৎসক জীবনের ফাঁকে-ফাঁকে অন্য-জন সাংসারিক কর্মসাধনার দুর্লভ অবসরে কাব্যচর্চা করেছেন। তুলনীয়, ইংরেজি ভাষার বিখ্যাত ব্রাউনিং দম্পতি এবং বাঙলা ভাষায় রাধারানী দেবী আর নরেন্দ্র দেব। 'সহজ হয়েও গভীর, স্বতঃস্ফূর্ত হয়েও প্রাণস্পর্শী এঁদের কবিতা। আধুনিক না হয়েও বলা যায় চিরকালের।' বাক্যবদ্ধটি 'বিজ্ঞাপন' হলে বলার কিছু নেই, কিন্তু অন্তরভুক্ত কবিতার প্রতিনিধিত্ব দাবি করলে সত্যাসত্যনির্ণয় জরুরি হয়ে পড়ে।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় ভাগে ডা. গৌরমোহন দাস দে তাঁর "প্রার্থনা" কবিতায় লিখেছেন, 'কলম দিয়ে লিখতে গেলে / মনে আগুন শুধুই জ্বলে / পাই যে আমি লজ্জা।' দ্বিতীয় কবিতায় তাঁর উক্তি : 'কবি আমি নই, কবি আমি নই / লিখিনি তো কভু কবিতা, / রুদ্ধ দুয়ারে বসে বসে একা / মনে আসে যা লিখে যাইতো।' 'কবিতা'র সঙ্গে 'যাইতা'র অন্তঃমিল বেদনা-দায়ক মনে করে নীরব থাকা যেত, কিন্তু চতুর্থ কবিতায়, 'গল্প লিখি ভ্রমণ লিখি / প্রবন্ধ আর উপন্যাস, / পদ্য আমি লিখতে গেলে / প্রাণটা করে হাঁসফাঁস।' 'উপন্যাস' কিভাবে 'হাঁসফাঁসকে' মিলিয়ে নেবে সেই ভাবনায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি।

প্রথম ভাগে কবি-সহধর্মিণী "সুবাস" কবিতায় লিখেছেন, 'স্তব্ধ হই আমি / অপলক চোখে চেয়ে স্বামী / রূপের প্রকাশ তব পাই / যার কোন আদি-অন্ত নাই।' কবিতাটি ভূমিকা অনুযায়ী 'আধ্যাত্মিক' ভেবে নেওয়া যায়, কিন্তু দ্বিতীয় কবিতা "টাগ অফ ওয়ার" পড়লে সংশয় উপস্থিত হয়। 'তোমার সুকঠিন হস্তের দৃঢ়বন্ধনে / যখন আমি / অবসন্ন, মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ি, / ঠিক তখনই / সেই মধুর মিলনের ক্ষণে / আবেশে অনুভূতিতে / যখন আমি আচ্ছন্ন, / তখন তোমার সংসারের জনমানুষেরা / তাদের প্রয়োজনের তাগিদে / চীৎকার করে' ডেকে / আমাকে সেই পরমাস্বাদ থেকে বঞ্চিত করে।' স্বীকার করি আবেগ 'স্বতঃস্ফূর্ত' এবং 'চিরকালের' কিন্তু যা কেবলি স্বতঃস্ফূর্ত এবং চিরকালের তা-ই কি কবিতা ? উদ্বৃত্ত অংশও কি কবিতা ?

হিন্দি ভাষার প্রখ্যাত কবি শ্রীকান্ত বর্মার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ থেকে নিজস্ব রুচি আর পছন্দ অনুযায়ী কবিতা নির্বাচন করে বাঙলা ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন কবি দেবী রায়। কাজটি নানান দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীকান্ত বর্মা আমাদের প্রতি-বেশী হিন্দি ভাষার কবিমাত্র নন। স্বদেশে এবং বিদেশে তাঁর কাব্যচর্চা যথেষ্ট স্বীকৃতি পেয়েছে। মধ্যপ্রদেশ সরকার তাঁকে "তুলসী" এবং "শিখর সম্মানে" ভূষিত করেছে, কেরল সরকার দিয়েছে "কুমার আসান" পুরস্কার। দিল্লী থেকে পেয়েছিলেন "ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী" পুরস্কার। সাংবাদিক হিসাবে "ভারতীয় শ্রমিক", "সাপ্তাহিক দিনমান", "বর্ণিকা" ইত্যাদি উল্লেখ্য পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শ্রীকান্ত বর্মা। আমন্ত্রিত কবি হিসাবে আমেরিকা সফর করেছেন দুবার। এছাড়া ৭টি উল্লেখ্য কাব্যগ্রন্থ,

উপন্যাস, গল্পগ্রন্থ, অন্যান্য রচনার রচনাকার হিসাবে তাঁর খ্যাতি সুবিদিত। অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর অনেক রচনা।

দেবী রায় তাঁর মূল্যবান ভূমিকায় লিখেছেন, 'তিনিই উঁচু মাপের কবি, যিনি দেশ কাল মানুষের মর্মভেদী কথা বলায় সক্ষম—মানুষের হয়ে, মানুষের পক্ষে যিনি দাঁড়াতে পারেন।' এমনি এক কবি শ্রীকান্ত বর্মার কবিতা অনুবাদ কত জরুরি সেটা বোঝাতে গিয়ে অনুবাদক আরো বলেছেন, 'ইয়োরোপীয় সাহিত্য আমাদের কাছে যতো বেশি উন্মোচিত, ঠিক ততোটাই গভীরতর এক দুর্দৈব অন্ধকার—ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে? অথবা, আমরা এক রবীন্দ্র পরিমণ্ডল তথা গণ্ডীর ভিতরে নিজেদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখে আজো আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকি?—একি নয় সঙ্কীর্ণ আত্মতৃপ্তি?'

এটা ঠিকই আমাদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির আর ভাষাগত উন্নাসিকতার কারণে প্রাদেশিক সাহিত্যগুলি পরস্পর পরিচিত হতে পারে নি, একাত্ম হওয়া তো দূরের কথা। ফলে "মেরা ভারত মহান" জাতীয় ফান্সে কাজ হয় নি। এই মুহূর্তে তামিল বা মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় শ্রেষ্ঠ রচনা কী লেখা হচ্ছে যেমন তা বাঙলা ভাষার পাঠক-লেখক জানে না, তেমনি বাঙলা ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনা ব্যাপারেও অন্য ভাষা উদাসীন অথবা অজ্ঞ। আলোচ্য অনুবাদ সে কারণে সাধুবাদের যোগ্য।

শ্রীকান্ত বর্মার কবিতার অনুবাদ কেমন হয়েছে, কতদূর মূলানুগ বা সার্থক, তা বলা সহজ নয়, কারণ মূল রচনা পাশাপাশি নেই। বড়ো-ছোটো মিলিয়ে ২৭টি কবিতার অনুবাদের ব্যাপারে দেবী রায়ের সঙ্গে একমত যে অনুবাদ কখনোই আক্ষরিক কাম্য নয়, বরং তা মূলানুগ ভাবাশ্রিত হওয়া উচিত। কবিতা অনুবাদও যে একটি স্বতন্ত্র শিল্পকর্ম, তাকেও যে কবিতা হয়ে উঠতে হয়, এটাই মূলকথা। এক্ষেত্রে অনূদিত কবিতাগুলি কবিতা হয়ে উঠেছে,—নির্দ্বিধায় বলা যায়। শ্রীকান্ত বর্মার কবিতায় ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক স্থান যেমন, হস্তিনাপুর, কলিঙ্গ, মগধ, কোশল, কাশী, কোশাম্বী, কপিলবস্তু, মিথিলা ইত্যাদি; ঐতিহাসিক চরিত্র যেমন বাবর, স্তালিন, অম্বপালী; রাজনৈতিক আন্দোলনের ভূমি হিসাবে ঢাকা, চেকোশ্লোভাকিয়া ইত্যাদির উল্লেখ কবির ঐতিহাসিক আর গণচেতনার ইঙ্গিতবাহী। "কলিঙ্গ" কবিতাটির উল্লেখ করা যায়, 'একমাত্র অশোকের দু'কানে ভাসছে—আর্তনাদ / আর সবাই?' 'এক মৃতের বয়ানে, তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ঝলক দিয়ে ওঠে, 'ছিলাম একজন কবি, একই সঙ্গে মিথ্যুক / ছিলাম এক বীমা কোম্পানীর এজেন্ট / আমি মগ্ন ছিলাম এক অধঃপতিত ভালোবাসায় / ছিলাম এক মিথ্যা কর্তৃত্বের ভিতর / সুযোগ পেয়ে হয়েছিলাম নেপোলিয়ন / সুযোগ বুঝে হয়ে যাচ্ছি শহীদ।' 'মগধ' কবিতায় ঐতিহাসিক সত্যের প্রেক্ষিতে ব্যক্তিত্বের সংকট বিবৃত। 'এ অন্ধ কোনো মগধ! নাকি, সেই তুমিয়ো / যে ঠিক আমারই মতো / সর্বস্ব খুইয়ে বসে আছো?'

সমকালীন রাজনীতির অন্ধকার দিকটি শ্রীকান্ত বর্মার অগোচর ছিল না। সাহসের সঙ্গে লিখতে পেরেছেন, 'স্তালিন নাগরিক যোসেফ জিজ্ঞাসা করে, / 'নাম'? / যোসেফ / ধর্ম? / স্তালিন / কর্ম? / স্তালিন/ কর্ম? / স্তালিন / জীবিকা? / স্তালিন। লাঞ্ছনা? / শাস্তি? / স্তালিন' (স্তালিন পর্দার আড়ালে রয়ে যায়)। এভাবেই 'চেকোশ্লোভাকিয়া', 'ঢাকা বেতার কেন্দ্র' ইত্যাদি কবিতার মধ্যে প্রতিক্রিয়ার বিস্ফোরণ ঘটতে দেখা যায়।

যে অনুবাদে কবিতাগুলি নিজস্ব ভাবমহিমায় স্বীকৃত সেই ভাষান্তরিত রূপ মূলপাঠে প্ররোচিত করলে অনুবাদ সার্থক বলে ধরে নেওয়া যায়।

পর্তুগিজ ভাষার অগ্রণী কবি ফারনানদো পেশোয়া বাঙলা কবিতার জগতে প্রায় অপরিচিত

একটি নাম। মূল কারণ হল এযাবৎ তাঁর কবিতা অনূদিত হয় নি। পর্তুগিজ ভাষার চর্চা না থাকায় সরাসরি অনুবাদের সম্ভাবনা ছিল না। টি. এস. এলিয়ট, এজরা পাউনড, রিলকে, বোদলেয়ার আর ডিলান টমাসের মতো আরো কিছু প্রতিনিধিস্থানীয় কবির কবিতার স্বাদ পাওয়া গেছে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে অনুবাদের সুযোগ থাকায়। পেশোয়া অনুবাদ করে বিপ্লব মাজী এবং অজিত মিশ্র কবিতা-পাঠকের কাছে কবিতার এক রহস্যময় ভুবন উন্মোচন করেছেন।

মোট ৩৫টি কবিতা ছাড়াও, পেশোয়ার জীবন আর সাহিত্য নিয়ে একটি প্রয়োজনীয় গদ্য উপহার দিয়েছেন বিপ্লব মাজী। কবিতাগুলির মূল রচনাকার ফারনানদো পেশোয়া, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আরো তিন কবির নাম পাওয়া যায়, যাঁরা হলেন আলবের্তো কেইরো, রিকার্দো রেইস আর অ্যালভারো দে ক্যামপোস। এঁরা পেশোয়ার সৃষ্ট হলেও সম্পূর্ণ পৃথক তিন সত্তা। প্রজ্ঞায়, অনুভূতিতে, প্রকাশভঙ্গিতে যাঁরা প্রত্যেকে ভিন্ন কবি। মজার কথা হল, স্বয়ং পেশোয়াও তাঁদের থেকে আলাদা। জীবন সম্পর্কীয় ধারণা এবং কবিতার আঙ্গিক-প্রকরণে এই চারজন চতুর্ভুজের চার কৌণিক বিন্দুতে অবস্থান করেছেন। অস্তিত্ববাদী কেইরো, শান্ত ব্যক্তিত্বের নব পেগান রিকার্দো, আর সত্যান্বেষী ফিউচারিস্ত ক্যামপোস কিভাবে একই জনক-কবি পেশোয়ার চিন্তাবীজ থেকে জন্ম নিয়েছেন সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন বিপ্লব মাজী। যে পরিবেশে আর সংসর্গে পেশোয়া জীবন কাটিয়েছেন, তার মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব, ভারসাম্যহীনতা এতই প্রকট ছিল যে তাঁকে বোধ আর চিন্তার ক্ষেত্রে বারবার স্থান-পরিবর্তন করতে হয়েছে। ফলে এক অনুভূতি থেকে আর-এক অনুভূতিতে, যন্ত্রণার ধাপে-ধাপে অতিক্রম করেছেন এক ব্যক্তিত্ব থেকে আর এক ব্যক্তিত্বে। নিসর্গ-প্রকৃতি থেকে মানব-প্রকৃতি, অধ্যাত্মবাদ থেকে জীবন-বাদ শাশ্বত মূলবোধের প্রতি আস্থা থেকে বিতৃষ্ণা, ভোগবাদ, বহির্মুখিতা থেকে অন্তরমুখিতা—কী নেই পেশোয়ায়? বস্তুত পেশোয়ার কবিতা-পাঠে পাঠকের মানস-সরোবরে নানান বিপরীতমুখী তরঙ্গ-সৃষ্টি হয় এবং পাঠককে সমৃদ্ধ করে তোলে।

জোনাথান গ্রিফিথের বই থেকে অনুবাদ করেছেন অজিত মিশ্র। অনুবাদকের ভাষায়, 'একটা ঘোরের মধ্যে পেশোয়া অনুবাদ করেছি।' অনুবাদের ক্ষেত্রে সমস্যা প্রচুর, বিশেষ করে যেখানে সরাসরি অনুবাদ হয় না। আক্ষরিক অনুবাদও কাম্য নয়। ভাবগত অনুবাদের ব্যাপারে অনুবাদক কিছুটা স্বাধীনতা নিয়ে থাকেন। সেক্ষেত্রে কতটা স্বাধীনতা স্বীকার্য তা নিয়ে বিতর্ক আছে। কারো-কারো মতে অনূদিত কবিতায় অনুবাদকের ব্যক্তিত্ব মূলের সমান্তরাল না হয়ে পরিপূরক হওয়া উচিত। অজিত মিশ্রের কথায় 'সামান্য দু'একটি ক্ষেত্র ছাড়া স্বাধীনতা নিই নি একেবারে।'

চমৎকার কবিতা হয়ে উঠেছে "কৃষ্ণকরমণী"। 'কিন্তু না, বিমূর্ত সে যে, যেন এক ধ্বনিময় পাখি / উড়ে যায় বাতাসের ওপারে বাতাসে / এবং হৃদয় তার অনাহত গায় / কেননা গান যে তার স্বতঃউৎসারিত' পেশোয়ার 'হঠাৎই একটি হাত' কবিতায় অতীন্দ্রিয় রহস্যময়তা ফুটে উঠেছে, 'বুঝতে পারি কেউ নই আমি, শুধু সে মুখের ছায়া / যে মুখ দেখিনি, তারই ছায়াতে রয়েছি, আর কোন-কিছু নেই অন্ধকার হিম হয়ে আসে।' গভীর জীবনদর্শনের ইঙ্গিতবাহী এই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু, আত্মা ও ঈশ্বর সম্পর্কীয় ভাবনার প্রতিফলন পাই 'মেষরক্ষক' কবিতামালার 'পাঁচ সংখ্যক কবিতা'য়। 'বস্তুপুঞ্জ নিয়ে কি ভাবছি আমি? / কার্য-কারণ তত্ত্বে আমার কি মত? / ঈশ্বরে কি অনুধ্যান রয়েছে আমার / অথবা আত্মায় কিংবা পৃথিবীর ভাবং সৃষ্টিতে? / আমি তা জানি না। এসব বিষয়ে ভাবা মানে / চোখ বন্ধ করা আর / কিছুই না-ভাবা। জানালায় / পর্দা টেনে দেওয়া (যদিচ

পর্দা নেই তাতে)।'

রহস্য, বিষাদ এবং দুঃখের জটিল রেখায় যে কবির জীবন আর কবিতা এক আশ্চর্য রূপ নিয়েছে তার কতোটা সমীপবর্তী হওয়া গেল জানা না গেলেও অজিত মিশ্রের অনুবাদে এবং বিপ্লব মাজীর সম্পাদনায় বাঙলা কবিতার দিগন্ত যে আরো প্রসারিত হল, সে বিষয়ে সংশয় নেই।

অধ্যাত্ম প্রেম, প্রেম এবং অন্যান্য

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

খুব অল্পদিনের ব্যবধানে আবদুল আল্-আমান-এর চারটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁকে প্রাথমিক-

আমার বাগানে লাইলী—আবদুল আজীজ আল্-আমান। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা-৭। আট টাকা।

ফেরা—আবদুল আজীজ আল্-আমান। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা-৭। আট টাকা।

এই কণ্ঠ অন্য স্বর—আবদুল আজীজ আল্-আমান। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা-৭। আট টাকা।

ধবল জোছনার সম্রাট—আবদুল আজীজ আল্-আমান। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা-৭। পাঁচ টাকা।

কারাগারের কাব্য—হো চি মিন। রূপান্তর: মুনীর সিরাজ। উন্মেষ প্রকাশনী, উয়ারী, ঢাকা-১২০৩। কুড়ি টাকা।

লালমোনের কাহিনী—কবি আরিফ। সম্পাদক ড. গিরীন্দ্রনাথ দাস। পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯। দশ টাকা।

জীবনযাপন—পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। ময়না প্রকাশনী, কলকাতা-৯। আট টাকা।

ভালোবাসা শ্বেত শঙ্খচিল—সবিৎশেখর মজুমদার। মুক্তপত্র, কলকাতা-২৫। দশ টাকা।

শঙ্খচূড় বিষ খেয়ে যা—রাজীব সিংহ, দীপঙ্কর রক্ষিত, সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরী। কথা ও কাহিনী, কলকাতা-৭৩। পাঁচ টাকা।

শোন আমাদের কথা—ইকবামুল হক টপী। বুস্তক প্রকাশনী, ঢাকা-১১০০। পনেরো টাকা।

ভাবে সম্পাদক প্রাবন্ধিক এবং প্রকাশক হিসেবে জানতাম। স্বভাবতই তাঁর কবিতা সম্পর্কে কৌতূহল জেগে উঠল মুহূর্তেই। প্রতিটি কাব্যগ্রন্থেই তিনি একটি "প্রবেশক" লিখেছেন যা তাঁর কবিতার স্বাদ-গ্রহণে অবশ্য সহায়ক। 'শুভ্র বোধ আর উজ্জ্বল সৌন্দর্যে'র কবি তিনি, তবে 'অস্থিরতা এবং অন্তর্দাহন'ও তাঁর কবিতার পংক্তিতে-পংক্তিতে প্রতি-ভাসিত। 'শব্দের চিত্রবহনক্ষমতা'য় তিনি বিশ্বাসী কিন্তু সবসময়েই যে শব্দ চিত্র বহন করেছে এমন কথা বলা গেল না। কিছু ক্লিশে শব্দ ব্যবহারে-ব্যবহারে ক্লান্ত করবে পাঠকদের। তবে তাঁর মধ্যে যে একটি নিবিড় গভীর কবিসত্তা রয়েছে তা আবিষ্কার করা নিমেষেই সম্ভব।

তাঁর কবিতার সবচেয়ে শক্তির জায়গা হল তিনি আরবি, ফারসি, উর্দু শব্দ অবলীলায় গ্রহণ করেছেন। সর্বোপরি সেই-সমস্ত শব্দের অর্থ, টীকা এবং অনুষঙ্গ "পরিশিষ্টে" সংযোজিত করেছেন। তবে এই সংযোজন প্রথম দুটি কাব্যগ্রন্থেই পাওয়া গেল। অবশ্য এই শব্দগুলির সঙ্গে পরিচয় ঘটে গেলে তৃতীয় কাব্য-গ্রন্থটির স্বাদগ্রহণে অসুবিধার কারণ ঘটবে না। চতুর্থ কাব্যগ্রন্থটিতে রসুলকে ভালোবাসার কবিতা-গুলি একত্র করেছেন—'এই গ্রন্থের কোনো কবিতা নতুন নয়, কিছু "ফেরা" কিছু "আমার বাগানে লাইলী" এবং অবশিষ্টগুলি "এই কণ্ঠ অন্য স্বর"-এর সম্পদ'। ভবিষ্যতে তিনি যদি রসুলুল্লাহ বিষয়ক কবিতা লেখেন তাহলে এই গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে সেগুলি সংকলিত হবে—এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন।

'আল্লাহ নিজে সুন্দর এবং সৌন্দর্য ভালবাসেন'—হযরত মুহম্মদ সা:-এর এই বাণী উদ্ধৃত হয়েছে "আমার বাগানে লাইলী" কাব্যগ্রন্থের সূচনায়। মূলত সৌন্দর্য-সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন কবি। একটি ছোটো লিরিক পড়ে নেওয়া যাক—

'রাত একেবারে ভিজে গেছে শিশিরে

সোলেমানপুর এখন শান্ত গভীর
একটু পরে চাঁদ উঠবে
আর তখন
সিক্ত শাড়ি খুলে ফেলে
কালো রাত পরে নেবে
জোছনার সফেদ লেবাস।

(সোলেমানপুরের রাত)

রোমানটিক সহজিয়া কবিমনটিকে খুঁজে নিতে দেরি হয় না। খুব চড়া রঙ ব্যবহার করেন নি কবিতাটিতে কিন্তু চমৎকার এক নিসর্গচিত্র আঁকা হয়ে গেছে হালকা জলরঙের সুচারু ব্যবহারে। 'আদিগন্ত মাঠ জুড়ে শুধু তুমি তুমি' বলতে পেরে খুশি হয়ে ওঠেন এই প্রেমিক কবি। 'আয়ুল হৃদয় / ধানচেরা স্বপ্নচোখে দেখেছে তোমায় / একান্ত আপন করে।'—এই পংক্তিগুলিতেও সেই 'তুমি'র কথা। কখনো 'লাইলী'কে মনে হয় মানবী, কখনো নিসর্গ-প্রকৃতি, কখনো বা শুধু একটি ভাবনামাত্র। এই আলো আর ছায়ার খেলা দেখানোই তো কবির প্রতিভার পরিচয়। এই 'লাইলী' প্রতি কাব্যগ্রন্থেই ফিরে-ফিরে এসেছে।

এ ছাড়াও তাঁর কবিতায় ফিরে-ফিরে এসেছেন রসুল। কখনো সম্পূর্ণ কবিতাটিতে, কখনো কবিতার অংশবিশেষে। সবসময় তাঁর মনে হয়েছে 'প্রার্থনার মত নীরবতায় / আমরা সবাই / তোমার জন্য / কেবল তোমার জন্য।' এই 'তুমি' কিন্তু সেই রসুলুল্লাহ।

যেখানে-যেখানে আবদুল আজীজ আল্-আমান নীচু স্বরে কথা বলেছেন সেখানে তাঁর টানাপোড়েন, আনন্দবেদনা, আশানিরাশা স্পর্শ করে গেছে। কিন্তু যখনই তিনি কিছুটা স্বরগ্রাম বাড়িয়েছেন, কবিতায় লাগিয়েছেন পোস্টার কালার, তখনই (খানিকটা দুঃসাহস লক্ষ করা গেলেও) তখনই কবিতার ভেঙে-পড়া খণ্ডহর দেখা গেছে। যদিও তিনি বলেছেন 'কবিতার সঙ্গে বাস / সে তো আর এক জান্নাত।' তবু তখন জান্নাত-এর রূপময়তা পেলাম কই।

"লাইলী" কাব্যগ্রন্থের "প্রবেশক" অংশে তিনি বলেছেন—'প্রতিটি কবিতায় আমি বিনীত কণ্ঠে কিছু বলতে চেয়েছি। এই বলায় নিশ্চয় পর্দার আবরণ আছে কিন্তু দেওয়ালের ব্যবধান নেই, কাব্যের আড়াল আছে কিন্তু কুয়াশার অস্পষ্টতা—যা অনেকের মতে আধুনিক কবিতার হৃৎপিণ্ড—নেই,' এ প্রসঙ্গে তাঁকে সবিনয়ে জানিয়ে দিতে চাই এখন এদেশে বা বাইরের অনেক দেশেই কবিতা খুব সরাসরি কথা বলছে—অনেকটা খবরের কাগজ পড়া বা ফুটবল ম্যাচ দেখার মতো প্রতিদিনকার ব্যাপার-স্যাপার। প্রখ্যাত চেক কবি মিরোশ্লাভ হলুব বা চিলির কবি নিকানর পারা এমনি মতবাদে বিশ্বাসী। সম্প্রতি নিকানর পারা কলকাতায় এসেছিলেন—তাঁর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেছিলাম। তিনি বলেন, **'There is poetry in everything except in poetry.'** এই ধারায় কাউকে কবিতা লিখতে হবে এমন কথা নেই কিন্তু আধুনিকতম কবিতায় আড়াল বা কুয়াশার অস্পষ্টতা যে নেই তা কবিতার অবিরল পাঠক হিসেবে বলতে পারি। তবে "এই কণ্ঠ অন্যস্বর" কাব্যগ্রন্থে আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধাচারণ করতে গিয়ে আবদুল আজীজ আল্-আমান একটি চমৎকার কবিতা লিখেছেন :

হাওরে কি নিল পা ?
আহা টলটলে গ্রাম্য যুবতী।
ক্র্যাচ নির্ভর ক্লান্ত জীবন
মাটিতে হামা দেন কখনো সখনো
সতর্কতায় ঘসটান পা ধুলোর উপরে
দাঁড়াবার দুরন্ত ইচ্ছায়
স্বতোকাটা ঘুড়ির মত
কাত হয়ে যান অবশেষে

সুঠাম পায়ের পরে তুমি কেন খাড়া নও
সুন্দরী !
কে নিল তোমার পা ? কোন্ সে হাঙর ?
বড় সাধের
আধুনিক কবিতা আমার।

"ফেরা" কাব্যগ্রন্থে কবি 'অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাসে,

অন্ধকার থেকে আলোকে, উত্তেজনার উন্মত্ততা থেকে সমর্পণের অশ্রুজলে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের জগৎ থেকে আধ্যাত্মিকতার শান্ত সাম্রাজ্যে ফিরে আসতে চেয়েছেন। মহান মুসলমান ধর্মের জীবন ও সংস্কৃতিতে বহুপ্রচলিত শব্দ, উপমা, অনুষঙ্গ, চিত্রসম্পদ তিনি আহরণ করেছেন। দ্রৌপদীর শাড়ি আর রহিমার চুল কিংবা যমুনা এবং ফোরাতের ধারাকে একসঙ্গে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন। উদার মুক্ত মানসিকতার সব পাঠকেরই এতে আনন্দিত হবার অবকাশ আছে। তবে এই কাব্যগ্রন্থের "প্রবেশক" অংশে তিনি কিছু অবিনয়ের কণ্টকও উপহার দিয়েছেন। আপাত নিরাসক্তিকে মনে হয়েছে অনেক বেশি অভিমান-লগ্নতা।

তাঁর কবিতা প্রসঙ্গে একটি সাধারণ মন্তব্য করা যেতে পারে। তাঁর দেখার চোখ আছে, ভাবনা আছে এবং সর্বোপরি কাব্যবোধও আছে। কিন্তু জীবনানন্দীয় ভাষাব্যবহারের অধিক প্রবণতা, এমনকী শব্দে-শব্দে জীবনানন্দের সামগ্রিক উপস্থিতি কিছুটা আশাহত করেই। সব কবিকেই ক্রমশ তাঁর নিকট ঐতিহ্যকে অতিক্রমের জন্য প্রয়াসী হতে হয়ই।

তবু আশা আছে, শুধুমাত্র বিদেশী শব্দপ্রয়োগের নতুনত্ব নয়, ভাষারীতিতেও তিনি পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে নিজেকে অতিক্রম করে যাবেন।

প্রতিটি কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদ সুন্দর। করেছেন একই শিল্পী অমিয় ভট্টাচার্য। ছাপা-বাঁধাইও বেশ ভালো। দাম কম।

হো চি মিন-এর একটি কবিতার অনুবাদ করেছেন মুনীর সিরাজ এভাবে—'কবিতা পাঠ আমার অভ্যাসের একটি নয়/ কিন্তু এ বন্দীশালায় কি আছে অন্য কাজ?/ কয়েদী এ দিনগুলি কাটাবো কবিতা লিখে/ আর তা গাইতে-গাইতেই নিকটে আনবো স্বাধীনতার দিন।' প্রতিভাধর বিপ্লবী নেতা হো চি মিন কবিতা লিখেছেন, অনুবাদ করেছেন, লিখেছেন মৌলিক প্রবন্ধ এবং এমনকী তাঁকে সাংবাদিক-সম্পাদকের ভূমিকায়ও দেখা গেছে। তাঁরই কাব্যগ্রন্থ "কারাগারের কাব্য"—মুনীর সিরাজ আমাদের বাঙলা রূপান্তর উপহার দিয়েছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা মহৎ এবং তিনি আমাদের সকৃতজ্ঞ অভিনন্দনের যোগ্য। এমনিতেই বাঙলা অনুবাদ কবিতা-শাখাটি অপেক্ষা-কৃত দুর্বল কিন্তু সাম্প্রতিক কালে অনেকের সযত্ন-প্রয়াস লক্ষ করে আমরা আশ্বস্ত হচ্ছি। হো চি মিন-এর কবিতা খুবই সহজ-সরল, এর সরাসরি আবেদন যে-কোনো মানুষের কাছেই। ক্ষুধার্ত, শৃঙ্খলিত, উৎপীড়িত মানুষের কথাই তিনি বলতে চেয়েছেন। দু-একটি কবিতার অনুবাদ এই প্রসঙ্গে পড়ে নেওয়া যেতে পারে—

প্রতি চেলাই শুধু একবাটি ভাত,
দিনরাত ক্ষুধার্ত উদর-জ্বালা করে আর্তনাদ।
যখন দারুচিনির দামে বিক্রি হয় কাঠ
এবং মুক্তোর দামে চাল
তিন 'ইউয়ানের' আতপ স্বভাবতই অপ্রচুর
ক্ষুধা নিবারণে
(তিয়েনতুং)

দাসত্বের চেয়ে মৃত্যু ভালো।
আমার সমস্ত দেশে আবার লাল পতাকা উড়ছে
ঠিক এমন মুহূর্তে বন্দী জীবন কি দুঃসহ!
যুদ্ধের সারিতে যোগ দেয়ার জন্য
কখন যে মুক্তি পাব আমি?
(সতর্ক ভিয়েতনাম)

অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতার কবিতা পড়তে গিয়ে আমার প্রায়শই মনে হয়েছে তাঁরা শিল্পশর্ত পূর্ণ করে কবিতা লেখার চেয়ে নিজেদের ধ্যান-ধারণা, আদর্শ কিংবা মতামতকে প্রতিষ্ঠা করতেই বেশি আগ্রহী। প্রতিবাদ এঁদের লেখায় নিয়ত শ্লোগান, কখনো-সখনো মাত্র যথার্থ কবিতা। হো চি মিন-এর একটি কবিতার নাম "মধ্যরাত"। শব্দটির সঙ্গে যে স্বপ্নব্যঞ্জনা আর মাধুর্য উঁকি মেরে যায় তা কিন্তু কবিতাপাঠের

পরে আর থাকে না। পুরো কবিতাটিই তুলে দেওয়া যাক—

ঘুমিয়ে পড়া মুখগুলো সবই নিষ্পাপ
শুধু জেগে উঠলেই তাতে লাগে সাধু
কিম্বা শয়তানের ছাপ।
সাধু কিম্বা অসাধু কোনো চরিত্রই মানুষে
আপনি জন্মায় না
ভ্রান্ত শিক্ষাই এর জন্য প্রধানত দায়ী। (মধ্যরাত)

প্রথম দুই পংক্তিতে যে চমৎকার কবিতার আভাস তা শেষ পংক্তিতে এসে প্রায় প্রবন্ধপ্রতিম হয়ে গেছে।

"লালমোনের কাহিনী" কবি আরিফের রচনা। ড. গিরীন্দ্রনাথ দাস বাঙলা পীরসাহিত্য নিয়ে গবেষণাধর্মী অনেক কাজকর্ম করেছেন। অধ্যবসায়ী এই লেখকেরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে কবি আরিফের দুষ্প্রাপ্য রচনাটি। সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত পুঁথিটি সর্বসাধারণের অগোচরেই ছিল—শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেনের অনুরোধে ড. গিরীন্দ্রনাথ দাস তা প্রকাশ করে একটি অভিনন্দনযোগ্য উচিত কাজ করেছেন।

"লালমোনের কিসসা" বা "লালমোনের কাহিনী" পীরমাহাত্ম্য-প্রচারক পাঁচালি-জাতীয় মঙ্গলকাব্য। একটি সুন্দর প্রেমকাহিনীকে অবলম্বন করে কবি সত্যপীরের মহিমা পাঠকমনে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন। আরিফের রচনাটি পুরোনো ভাষারীতিতে লেখা বলে আধুনিক পাঠকের কাছে তা ততটা রম্য-পাঠ্য নয়, তবুও কোথাও-কোথাও কবিত্বময় পংক্তি বেশ লাগে। কোরব শহরে বাদশা হাসেনার বৃদ্ধ-বয়সের পুত্র হোসেন, উজির সৈয়দ জামাল-এর কন্যা লালমোনের সঙ্গে একই পাঠশালায় পড়তে এল। পরিচয় হল দুজনের। তারপর একদিন লালমোন খুশি মনে স্নান করে এলে কবি বর্ণনা দিচ্ছেন এভাবে—

বাল শুখাইতে গেল বালাখানা পরে।
পাছুপানে ঝাড়ে কেশ ছাতি হেলাইয়া
হৃদয়ের কাচলি তার পড়িল খসিয়া।

এই কাহিনীতে একজন প্রতিনায়িকাও রয়েছে। তার নাম পুর্ণিমা—সে মালিনী। হোসেন আর লালমোন ঘুরতে-ঘুরতে এসেছে মোগান শহরে। গাছতলায় লালমোনকে রেখে সওদা করতে বাজারে চলেছে হোসেন—তখনই পথে পুর্ণিমার সঙ্গে দেখা। হোসেনের রূপমুগ্ধা মালিনী প্রসঙ্গে কবি লিখলেন—

খুলিয়া মাথার কেশ আগে বান্ধে খোপা
তাহাতে বেড়িয়া দিল যুঁইফুল চাঁপা।
কানেতে ঘুশিল ফুল অতি শোভ করে
হাসিয়া হাসিয়া তবে কহেন বাদসারে॥

ঢলিয়া ঢলিয়া কথা কহে নষ্টবতী
গায়ের কাপড় খুলে দেখাইল ছাতি।
দেখিয়া ভুলিল বাদসা খেতে নারে আর
মালিনীরে ডেকে বলে দেহ পুষ্পর হার॥'

হয়তো বা সুস্থ অন্ত্যমিল নেই, হয়তো বা অতিশয়োক্তি বা পুনরুক্তিদোষ আছে, তবুও মাঝে মাঝে এমনিধারা কবিত্বের টান এবং সর্বোপরি কল্পকাহিনীর ঘটনার স্রোত লেখাটিকে পড়িয়ে নেবে।

ড. গিরীন্দ্রনাথ দাস টীকাটিপ্পনী এবং শব্দার্থ দিয়ে রচনাটিকে সুবোধ্য করে তুলেছেন। ভাষাচার্য ড. সুকুমার সেন যিনি সর্বপ্রথম পীরসাহিত্য বিষয়টি আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছিলেন সেই তিনিই একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু মূল্যবান ভূমিকাও লিখে দিয়েছেন। এই গ্রন্থটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য সুধী-সমাজে নিশ্চিত স্বীকৃত হবে।

খুব অল্পদিন কবিতা লিখছেন পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তিন ফর্মার এই কাব্যগ্রন্থটিতে শেষ তিন পৃষ্ঠায় এক অজ্ঞেয় হিন্দিকবির একটি কবিতার অনুবাদ রয়েছে—এ ছাড়া রয়েছে ৩১টি মৌলিক কবিতা। সব কবিতাই ছোটো-ছোটো—অলংকারহীন, এক অর্থে খুবই সাদামাটা। কিন্তু কখনো-কখনো গভীর উচ্চারণ পাঠককে ভাবাবে। যাটের কবি সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত বা পরেশ

মণ্ডলের কথা খুব মনে পড়িয়ে দেয় কবিতাগুলি। তবু বলব পার্থজিৎ ওঁদের থেকে খুব আলাদা না হয়েও যেন আলাদা। পৃথিবীর অধিকাংশ সাহিত্যেই কবিতা আটপৌরে ভাষাকে আশ্রয় করে দাঁড়াতে চাইছে। একটু আলতো ঠাট্টা, তির্যক বক্রোক্তি এসে পড়ছে কবিতার ভাববস্তুকে ফুট করবার জন্যে। ধরা যাক পার্থজিৎ-এর "ছাতা" কবিতাটি : 'ছাতা খুলবো না। / বৃষ্টি পড়ছে। / পড়ুক। / ভিজবো। / ছাতা খুলবো না। / ভিজবো। / ছাতা খুলবো না। / ছাতা খুললেই / ছাতার তলায় / তুমি। / ছাতা খুললেই / ছাতার তলায় / তিনি। / না, / ছাতা খুলবো না। / ছাতা খুললেই…' স্বার্থপর সময়ের এক সংক্ষিপ্ত গ্রাহ্য প্রতিবেদন যেন কবিতাটি। অন্যভাবে বলতে গেলে একটি বাঙলা প্রবাদের সাহায্য নেওয়া যায় : 'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করা।' কিংবা এই 'তুমি' বা 'তিনি'দের চাতুর্যময় আশ্রয়পিপাসার দিকে প্রশ্রয়হীন তির্যক তর্জনীসংকেত। অন্য একটি কবিতায় একটু অন্যভাবে পার্থজিৎ এই ভাবনাকে যেন বিশ্লেষণ করেন—'এখন / পরস্পরের কঠিন মুখে / শুধু / পরস্পরের জলছবি দেখি।' এইসব সপ্রতিভ কিন্তু সরল, গভীর কিন্তু আটপৌরে উচ্চারণে পার্থজিৎ আমাদের কবিতার চেতনাকে উশকে দেন—নতুন আলো পড়ে আমাদের ভাবনায়।

এঁরই প্রায় বিপরীতে রয়েছেন সরিৎশেখর মজুমদার। সম্প্রতি লোকান্তরিত শ্রদ্ধেয় সব্যসাচী লেখক কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন সরিৎশেখরের "ভালোবাসা শ্বেত শঙ্খচিল" কাব্যগ্রন্থটির। সেখানে প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন—'এই বইটি হাতে নিয়ে তার সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে অকপটে স্বীকার করছি যে জানা-অজানা অনেক কবির আধুনিক কবিতা নাম শুনলে আমি তা থেকে সাত কেন সহস্র হাত দূরে থাকবার চেষ্টা করি।

'আধুনিক নাম নেওয়া কবিতা সম্বন্ধে আমার এই বিরাগ আর ভীতি হয়তো আমার কাব্যবোধ এবং বিচারের অক্ষমতার প্রমাণ, তবু আমার সারা জীবনের সহজাত আর অর্জিত বিচারবোধে সার্থক কাব্যসৃষ্টি বলে যা বুঝতে শিখেছি তার জায়গায় শুধু কাব্য-বিচারের ক্ষেত্রে সূক্ষ্মবোধহীন বর্বর অপবাদে উপহসিত হবার ভয়ে বাতুল সব প্রলাপের গুচ্ছকে কবিতা বলে মেনে জাতে উঠতে পারব না।'

পরে তিনি সরিৎশেখরের কাব্যগ্রন্থটিকে সাধুবাদ দিয়ে বলেছেন—'এই কবিতা-সংগ্রহ যথার্থভাবে আধুনিক তো বটেই সেই সঙ্গে কবিতার সেই চিরন্তন আদর্শের রূপায়ণে কথাকে সুরে পৌঁছে দেবার সেই জাদুস্পর্শও এগুলির মধ্যে বর্তমান।'

সরিৎশেখর কখনো-কখনো আধুনিক নন এমন কথা বলতে চাই না কিন্তু 'করবী'র সঙ্গে 'লভি' মিল দিলে কিংবা 'প্রেম-সমীরণ' 'অধরাগ্র' 'শীতাবগাহন', 'সরম-জড়ানো' জাতীয় অব্যবহৃত শব্দ বা শব্দগুচ্ছকে ফিরে ব্যবহার করলে খটকা লাগে বইকি।

দীপঙ্কর রক্ষিতের সম্পাদনায় রাজীব সিংহ, দীপঙ্কর রক্ষিত এবং সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরীর কবিতা নিয়ে যে সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছে তার নাম "শঙ্খচূড় বিষ খেয়ে যা"। এই সংকলনের ভূমিকায় লেখা হয়েছে—'গত দশ-পনেরো বছরে যিনি শুধুমাত্র উপন্যাস, গল্প ছাড়াও একমাত্র রবীন্দ্রনাথ আঁকড়ে বসে আছেন তাঁর প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ এ বই পড়বেন না।' এই তিনজনের অধিকাংশ কবিতাই প্রবহমান গদ্যে লেখা এবং সপ্রতিভ বিতর্কমূলক উচ্চারণের পক্ষপাতী। এঁদের সব লেখাই কবিতা হয়েছে এমন কথা বলা যাবে না কিন্তু এঁরা যে নতুনভাবে কথা বলবার চেষ্টা করেছেন তার জন্যে অভিনন্দন জানাতে হয়। এঁদের লেখার তিনটি উদাহরণ উদ্ধার করা যাক—

'বন্দর থেকে এইমাত্র যারা বেরুলো ক্রমাগত রাক্ষুসে গহ্বরের খুব কাছাকাছি সোর্স খোঁজে তারা। / আগুন প্রজাতির বীজে উর্বর নেশা কলোনি। প্রিয় আড্ডা ক্যাসিনোর টেবিলে চে গুয়েভারার ডায়েরী। আপাদমস্তক মাতাল সহযাত্রীরা। আর তাদের বেতনভুক ছিন্নবিচ্ছিন্ন ভাড়াটে শরীর। (—রাজীব সিংহ)

চুলচেরা আলোর প্রচারে ক্রমশঃ তুমি ছায়ার গণশত্রু—
নিয়ন্ত্রণের বাহিরে যাইলেও ইহার গুরুতর প্রতিক্রিয়া
দেখা যাইবে শেষে
চামড়ায় ঘষছি নাক, নাকের তাপেই অক্ষম হই।
(দীপঙ্কর রক্ষিত)

তাত্ত্বিক সংজ্ঞায় ডানা কেটে ফেলতেই
চাইল হারিয়ে যেতে
বৃষ্টি তোর প্রস্থ-রুমাল
জলন্ত নামাবলী সফলতা ফিরে চায়
রক্তের ভস্মবেলায়।
(সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরী)

দৃশ্যের বাইরে এক আলোআঁধারির মায়ার মধ্যে এঁরা নিয়ে যেতে চাইছেন—প্রথাসিদ্ধ প্রকরণ ভেঙে ফেলে হয়তো বা ভৌতিক নাচ দেখাতে ইচ্ছুক।

ইকরামুল হক টগী বাংলাদেশের অতি তরুণ কবি। তাঁর কাব্যগ্রন্থ "শোন আমাদের কথা" পাঁচটি দীর্ঘ কবিতার সংকলন। দীর্ঘ কবিতা রচনা অত্যন্ত দুরূহ শিল্পকর্ম। অতিকথন কিংবা একই কথার পুনরুক্তি অথবা ভাবনার বিশদীকরণ করতে গিয়ে কবি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন। হয়তো এ কারণেই এখনকার বুদ্ধিমান কবিরা সংহত হতে গিয়ে দীর্ঘ কবিতা রচনা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। কেউ-কেউ যে লেখেন না এমন নয়, কিন্তু তার মধ্যে মাত্র দু-পাঁচটি উতরে গিয়ে মহৎ চারুকর্ম হয়ে যায়।

ইকরামুল হক টগীর আবেগ যতখানি তীব্র ততখানিই অসংহত। কবিতা শুধুমাত্র যেমন শব্দশিল্প নয়, তেমনি বিবৃতিও নয়। সাংবাদিক প্রতিবেদন পড়ার জন্য সকালবেলার ছোটো-বড়ো নানা পত্রিকা তো রয়েছে—তাই কবিতায় ভিন্নমাত্রা না এলে ওই জাতীয় রচনার পাশ কাটিয়ে যেতে হয়। ইকরামুল একটি কবিতায় লিখেছেন—

যারা তারুণ্যের হৃদয় আবেগকে
অশ্রদ্ধা করে, যারা অতৃপ্ত অভিজ্ঞতার কথা
বলে তারুণ্যের আবেগকে স্রেফ বয়সের উচ্ছ্বাস
বলে উড়িয়ে দেয়
যারা মন্তব্য করে বয়স হোক সব ঠিক
হয়ে যাবে
যারা তত্ত্বের কচকচানীর ঠেলায়
পণ্ডিতি করতে ব্যস্ত—
সেই সব আঁতেলদের হাতে যেন
আমার এই বইটা না পড়ে। (সূচনা)

কিন্তু বর্তমান আলোচকও তাঁর কবিতা যথেষ্ট যত্নের সঙ্গে পড়েও তাঁকে আবেগতাড়িত উচ্ছ্বাসের কবি হিসেবেই চিহ্নিত করতে চান। মূলত তাঁর সব কবিতাই বক্তব্যের ভারে ভারাক্রান্ত। আদর্শ, 'বৈজ্ঞানিক চিন্তা' কিংবা কমিউনিস্ট ধ্যানধারণার প্রচারক হওয়া এক ব্যাপার আর কবি হয়ে ওঠা সম্পূর্ণ অন্য এক প্রক্রিয়া। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রখ্যাত রাজনীতিকেরা কবি হতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন।

ইকরামুল একটি কবিতায় সিদ্ধান্তে লিখেছেন—'শব্দ যদি স্তব্ধ হয় অর্থহীনতায় / নতুন শব্দরা এসে শব্দকে তাড়ায়'। সম্ভবত এটি একটি উদ্ধৃতি। কিন্তু এটিকে চমৎকার লাগসইভাবে প্রয়োগ করেছেন। কিংবা অন্য একটি কবিতায় লিখেছেন - 'এক ন্যাংটো শিশু রাস্তায় কাঁদছিল / তাকে কোলে তুলে আদর করলাম / চুমো খেলাম / সে কানে কানে রাষ্ট্রের অসভ্যতার কথা বললো।' এটি তাঁর মৌলিক চিন্তার প্রকাশ এবং বলা বাহুল্য, আমাকে মুগ্ধ করল।

"তারপর, শোন আমাদের কথা" কবিতাটিতে ইকরামুল লিখেছেন 'আমরা কমিউনিস্ট / আমরা লেখক হওয়ার জন্য লিখি না, / আমরা লেখক গড়বার জন্য লিখি।' এইসব উচ্চারণের মধ্যে তাঁর ভূমিকা প্রচারকের মতো কৌশলী কিন্তু কবির মতো প্রচ্ছন্ন সংকেতবাহী নয়। তবে আমার বিশ্বাস এবং আশা যে তিনি আগামীদিনের লেখায় আরো সংহত হয়ে আমাদের চমকে দেবেন।

বাংলাদেশের রাজনীতি

রণেন্দ্রনাথ দেব

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় কোনো দেশের সাম্প্রতিক সংঘটনসমূহের বিশ্বাস্য বিবরণ পাওয়া গেলেও সে দেশের সম্পূর্ণ পরিচয় স্পষ্ট হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ধীশক্তিসম্পন্ন লেখক বা ব্যাখ্যাতা তাদের তাৎপর্য বিশ্লেষণ না করেন। বদরুদ্দীন উমর বাংলাদেশের সুপরিচিত লেখক। তাঁর নবতম গ্রন্থে বাংলাদেশের বর্তমান কালের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার সামগ্রিক চিত্র পাওয়া গেল।

বইটিতে আছে এগারোটি নিবন্ধ—(১) "উন্নয়নশীল" দেশে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা, (২) বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতির ক্রমবিকাশ, (৩) জুলাই মাসের হরতাল আন্দোলন এবং সামরিক শাসনের অবসান প্রসঙ্গে, (৪) বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদের অবস্থান এবং তৎপরতা, (৫) সরকারি "জাতীয় ফ্রন্ট", (৬) বাংলাদেশে মৌলবাদ আর শ্রেণীসংগ্রামের নতুন পর্যায়, (৭) বাংলাদেশে বুর্জোয়া রাজনীতির বিষাক্ত বৃত্ত এবং আমাদের করণীয়, (৮) এরশাদ হটাও আন্দোলন আর সামরিক শাসনের উচ্ছেদ প্রসঙ্গে, (৯) কাদের ঐক্য, ধনিক শ্রেণীশক্তির না শ্রমজীবী জনশক্তির? (১০) বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বাস্তব পরিস্থিতি এবং করণীয়, (১১) সোভিয়েত-মার্কিন নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি এবং তার অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক তাৎপর্য। প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হলেও এদের মধ্যে বিষয়গত ঐক্য রয়েছে। সব জড়িয়ে একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা।

প্রথম প্রবন্ধটিকে আলোচনার সুযোগ্য প্রস্তাবনা বলা যেতে পারে। রাষ্ট্রের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সম্পর্ক কী? লেখক বলছেন—'সমাজ যতদিন শ্রেণীভিত্তিক থাকে ততদিন সমাজে রাষ্ট্র অপরিহার্য হয় এবং সেই সঙ্গে অপরিহার্য হয় রাষ্ট্রের মূল হাতিয়ার সেনাবাহিনী।' বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির অধিকাংশই 'অল্পবিস্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সরাসরি তা না হলেও বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থতহবিল (আই. এম. এফ.) ইত্যাদি সাম্রাজ্যবাদী সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ও তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।' এইসব সাম্রাজ্যবাদী দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি একান্তভাবে নির্ভর করে আছে ব্যাপক সামরিকীকরণের জন্য উৎপাদনব্যবস্থায়। 'সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী যে দালাল বুর্জোয়াশ্রেণী নয়া-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে ক্ষমতায় থাকে এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্র পরিচালনা করে তাদের চরিত্রও হয় পরগাছাসুলভ। তারা সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট হিসেবেই এইসব দেশের শিল্প এবং কৃষি উৎপাদন আর ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে তৎপর থাকে এবং উন্নয়নের পরিবর্তে দেশীয় অর্থনীতির অনুন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে।' এ থেকে বোঝা যায় বাংলাদেশে সামরিক শাসন কেন সহজে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল।

পরবর্তী প্রবন্ধগুলিতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে লেখক দেখিয়েছেন: ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর আওয়ামী লীগ তার শ্রেণীগত লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয় নি। এই শাসকশ্রেণীর নিজস্ব কোনো মেরুদণ্ড না থাকায় তারা অচিরে বৈদেশিক ঋণ, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে ঋণের জন্য উত্তরোত্তর নির্ভরশীল হয়। আওয়ামী লীগ তার ঘোষিত নীতি থেকে ক্রমশ সরে যেতে থাকে। অবশেষে 'গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকুও নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে, সকল রাজনৈতিক দল বেআইনি ঘোষণা করে, শেখ মুজিব ফ্যাসিষ্ট কায়দায় গঠন করেন তার সাধের বাকশাল। সেই বাকশালের সদস্যপদের দ্বার সেনাবাহিনী, আমলা, পুলিশসহ সকল ধরনের সরকারি কর্মচারীর জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এর ফলে বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটিতে মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মণি সিংহের সঙ্গে সামরিক বাহিনীর নেতা মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং নৌ ও বিমানবাহিনীর অধিনায়করাও আসন গ্রহণ করেন, কাজেই সামরিক-বাহিনীকে সরকার ও প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্থানগুলিতে তো বটেই, এমন কি শাসকদল বাকশালেরও উচ্চতম কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ... ... শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী বাকশালী সরকার যেসব শ্রেণীশক্তির প্রতিনিধিত্ব করত, তাদের মৌলিক শ্রেণী স্বার্থকে রক্ষা এবং পুষ্ট করার উদ্দেশ্যেই মুজিব সরকার আর বাকশালের উচ্ছেদ এবং সামরিক শাসনের প্রবর্তন হয়।' এইভাবেই সামরিক শাসকেরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। একজন সামরিক শাসক অপসারিত হলেও সামরিক শাসনের অবসান ঘটে না। সেইজন্য এরশাদ হঠাও আন্দোলন নিরর্থক। প্রকৃত যে আন্দোলন প্রয়োজন তা জনশক্তির স্বার্থরক্ষার আন্দোলন? বাংলাদেশের বুর্জোয়া রাজনীতি এক বিষাক্ত বৃত্তে আবর্তিত হচ্ছে। জনগণের সত্যকার উন্নতি তার লক্ষ্য নয়। তা চায় সামরিক শাসকদের সঙ্গে ক্ষমতাভোগের কিছু বিস্তৃত সুযোগ মাত্র।

বদরুদ্দীন উমর গভীর বিশ্লেষণ এবং তীক্ষ্ণ মন্তব্যের দ্বারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী কালের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পটভূমিটিকে যেভাবে স্পষ্ট করে তুলেছেন খুব কম লেখকই তেমনই সার্থকতা লাভ করেন। বাংলাদেশের সামাজিক চিত্রেরও একটু আভাস পেলাম। তাঁর নিজস্ব মতাদর্শ কোন্ ভিত্তির উপর স্থাপিত, তাও সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশিত। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন এঙ্গেলসের অনুসরণে। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমরাস্ত্র উৎপাদনের সম্পর্ক তিনি ব্যাখ্যা করেছেন রোজা লুক্সেমবার্গের উদ্ধৃতি দিয়ে। মার্কস এবং লেনিনের চিন্তাধারায় তিনি উদ্বুদ্ধ। একজন খাঁটি মার্কসবাদীর দৃষ্টিতে বাংলাদেশের ঘটনাবলীর এই বিশ্লেষণ অবশ্যই সাগ্রহে পঠনীয়। বিশেষত জামাতে ইসলামী দলটির সম্বন্ধে এবং মৌলবাদীদের সম্পর্কে তাঁর বিচার একান্ত সুচিন্তিত। তবু কয়েকটি বিষয়ে আমাদের সন্দেহ রয়ে গেল।

প্রথমত, আওয়ামী লীগের পতনকে তিনি মনে করেন সম্পূর্ণত তার অপদার্থতা-প্রসূত। এই দলটির উগ্র লোভ এবং অকর্মণ্যতা এর পতন ত্বরান্বিত করেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু কিছু রাজনৈতিক কারণের উল্লেখ করাও প্রয়োজন ছিল। মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলির ভূমিকা কী ছিল তা তিনি বলেন নি। বিশেষ করে বলা দরকার ছিল সি. আই. এ-র চক্রান্তের কথা। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কলকাঠি নাড়ার কথা তিনি বলেছেন। তবে বিষয়টি আরো একটু বিশদ করে বললে ভালো হত।

দ্বিতীয়ত, বদরুদ্দীন উমর মনে করেন বাংলাদেশে হিন্দুদের আধিপত্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে খর্ব হবার পর থেকে সাম্প্রদায়িকতার বিষ কমে গেছে। একথা সম্পূর্ণ সত্য কিনা সংশয় আছে। জামাতে ইসলামীর মতো দলে দু-একজন হিন্দু সদস্য থাকলেও সে দেশে সাম্প্রদায়িকতার মূল উৎপাটিত হয়েছে কি?

শেষ প্রবন্ধটি ঠিক বাংলাদেশ সম্বন্ধীয় নয়, তবে এ বইয়ে সেই আলোচনাটিকেও অপ্রাসঙ্গিক বলা চলে না। তাঁর মতে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মতো 'সোভিয়েট সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদও' নানা সমস্যায় বিব্রত এবং নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি আলোচনায় সোভিয়েত রাশিয়াই যে দুর্বল পক্ষ, তা সকলেই বোঝেন। বদরুদ্দীন উমর স্তালিনীয় নীতিতে ঐকান্তিক বিশ্বাসী। ফলে স্তালিনবাদের উচ্ছেদপ্রচেষ্টা এবং গ্লাসনস্ত আর পেরেসত্রৈকার প্রসারকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি। স্তালিনবাদ সম্পর্কে তাঁর অভিমত, বলাই বাহুল্য, ঘোর বিতর্কের বিষয়।

সামরিক শাসন ও বাংলাদেশের রাজনীতি—বদরুদ্দীন উমর। প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা ১১০০। ১৯৮৯। পৃ ১৩৮। বাষট্টি টাকা।

ধর্ম ও ধর্মের রাজনীতি—হাসান শফি। প্রতিপক্ষ প্রকাশনা, শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭। ১৯৮৯। পৃ ৪৮। কুড়ি টাকা।

"সামরিক শাসন ও বাংলাদেশের রাজনীতি" বাংলাদেশকে বোঝবার জন্য অপরিহার্য। তার চেয়েও বড়ো কথা, সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশকে জানার কাজে এ বইটি মূল্যবান সহায়ক।

সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে মৌলবাদ পেট্রোডলারের প্রভাবে অনেকটা জাঁকিয়ে বসেছে। জামাতে ইসলামীর প্রতিপত্তি তার প্রমাণ। আলবদর প্রভৃতি কুখ্যাত ঘাতকদল যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল তারা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এইসব দলের পিছনে যে মৌলবাদী প্ররোচনা কাজ করে হাসান শফি যুক্তির সাহায্যে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করবার চেষ্টা করেছেন। শফি বলেন, ইসলামধর্মের মূলনীতিসমূহ বিধৃত রয়েছে কোরআনে আর সুন্নাহ বা শরীয়তে আছে তার প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে আলোচনা আর নির্দেশ। হাদিসেরও আবার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অবকাশ রয়েছে। বিশেষ পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা নতুন কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য আরো কিছু উপায়ের কথা শাস্ত্রবিদরা বলেছেন। 'চিন্তা ও গবেষণার সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এই প্রচেষ্টাকে ইসলামী নীতিশাস্ত্রের (ফেকাহ্) ভাষায় "ইজতেহাদ" বলা হয়।' নবযুগের চিন্তাপ্রণালীতে অভ্যস্ত মানুষ ইসলামের অনেক রাজনীতি বিষয়ে যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন শফি তার দুয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন, যথা—

> পৃথিবীর যে অংশে বছরের কয়েক মাসই সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত দৃশ্যমান নয় সেখানে একজন মুসলমান ঘড়ির উপর নির্ভর না করে কিভাবে রোজা পালন করতে পারেন?
> যাকাত আর ফিতরা পাবার হকদার কারা?
> প্রতিবেশীকে অভুক্ত রাখা নিষেধ; কিন্তু প্রকৃত প্রতিবেশী কে? শুধু কি নিকটতম পড়শী?
> চিত্রকলা আর কাব্যের চর্চা কি নিন্দনীয়? সুদগ্রহণ এবং মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা অবলম্বনীয়? ইত্যাদি।

শফির বিবেচনায় যুক্তির সাহায্যে এসব প্রশ্নের নিরসন-প্রচেষ্টা ইসলামবিরোধী নয়।

লেখকের কয়েকটি মন্তব্য উদ্‌ধৃত হবার যোগ্য—

১. 'মৌলবাদীদের প্রস্তাবিত "ইসলামী রাষ্ট্রে" একজন অমুসলমানের স্থান কি হবে? তাঁরা বলবেন, সংখ্যালঘুরা হবে রাষ্ট্রের (আসলে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের) "পবিত্র" আমানত। এখানেএই আমানত কথাটিই অবমাননাকর, প্রকৃত মানবিক মর্যাদার পরিপন্থী। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অধিকার সংরক্ষণে পৃথক আইনকানুন চালুর কথা বলবেন হয়তো মৌলবাদীরা। তা সে ধরনের সংরক্ষণ ব্যবস্থা তো দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ-বর্ণবাদী সরকারও সে-দেশের কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য প্রবর্তন করেছেন।' (পৃ ৩৬)

২. 'মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের তুলনায় যে-দেশে তারা সংখ্যালঘু সেখানে মৌলবাদের চেহারা কিছু কম ভয়াবহ নয়। সম্প্রতি শাহবানু মামলায় সুপ্রীম কোর্টের একটি রায়কে কেন্দ্র করে ভারতে যা ঘটেছে তা-ই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা-জনিত উদ্বেগ আর হীনম্মন্যতা সেক্ষেত্রে বরং সমস্যায় নতুন মাত্রা যোগ করে। ১৯৬১ সালে (মৌলবাদীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও) পাকিস্তানে মুসলিম পারিবারিক এবং উত্তরাধিকার আইনের যে সংশোধন করা হয় (এবং আমাদের বর্তমান বাংলাদেশেও যা কার্যকর রয়েছে) আজ এত বছর পর ভারতে সেই একই উদ্যোগ গ্রহণ করতে গেলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিজস্ব ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অভিযোগ ওঠে।' (পৃ ৩৭)।

যুক্তিবাদী লেখকের সৎ সাহসপ্রশংসনীয়। যদিও বদরউদ্দীন উমরের সঙ্গে কোনোক্রমে তুলনীয় নন, হাসান শফি কালক্রমে চিন্তায় আর প্রকাশভঙ্গিতে আরো স্বচ্ছতা অর্জনে সচেষ্ট হবেন বলে আশা করি।

১

'কে এমন নির্বোধ আছে যে, দুধের গোরু বা চাষের বলদ কশাইকে বেচবে?'

আবার একটা চিঠি লিখতে হল। বিষয় একই। দেশজ বাস্তবতা সম্পর্কে শিক্ষিত নগরবাসী এবং বুদ্ধিজীবীর কমিউনিকেশন গ্যাপজনিত বিভ্রান্তি। শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (জুন, চতুরঙ্গ) একই বিভ্রান্তিতে ভুগছেন। প্রয়াত আবদুল ওদুদও এর ব্যতিক্রম নন। 'সিইয়ার-উল-মুতাখ্‌খারিন' (View of Modern Times). লেখক গুলাম হুসেন তবতাবাই (জন্ম ১৭২৭ খ্রী) শেষ জীবনে ঈস্ট ইনডিয়া কোম্পানির কর্মচারী ছিলেন। তখন বইটি লেখেন এবং বইয়ে উল্লিখিত ঘটনাকাল ১৭০৭-১৭৩৮ খ্রী। ১৭৮৯ সালে রেমনড নামে এক ফরাসি (ধর্মান্তরিত হন হাজি মুস্তাফা নামে) বইটির তিনখণ্ডে ইংরেজি অনুবাদ করেন। ১৮৩২ সালে জে ব্রিগস আরেকটি ইংরেজি অনুবাদ করে ওয়ারেন হেস্টিংসকে উৎসর্গ করেন। এটিই সুপ্রচলিত অনুবাদ।

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ই. এইচ. কার পরামর্শ দিয়েছেন, 'ইতিহাস পাঠ করার আগে ঐতিহাসিককে পাঠ করে নাও।' তার চেয়ে বড়ো কথা, ভারতের মতো একটি বিশাল দেশে প্রাক-কোম্পানি আমলের দুটি বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ আর সাম্প্রতিক কালের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ কখনই এক হতে পারে না। সাম্প্রদায়িকতার চেতনা বলতে আজ যা বুঝি, তা অতীতে ঐতিহাসিক কারণেই থাকা সম্ভবই ছিল না। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক 'মধুর' না হলেও স্বাভাবিক ছিল। হিন্দুদের নিজেদের মধ্যেই জাতপাত ছিল। কাজেই বিধর্মী মুসলিমের সঙ্গে দূরত্ব তো ছিলই। কিন্তু সেই দূরত্ব কখনই সংঘর্ষ বাধায় নি। দেশের একই আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় হিন্দু-মুসলিম পাশাপাশি কাজ করেছেন। এখনও করছেন। কিন্তু এখন সাম্প্রদায়িকতার ঝড় এসে তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে এবং এর পেছনে আছে ক্ষমতার রাজনীতি। "সাম্প্রদায়িকতা" একেবারে আধুনিক যুগেরই ব্যাধি। মধ্যযুগে এর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। কারণ জাতীয়তাবাদই সাম্প্রদায়িকতার জনক। মধ্যযুগে এ দেশে জাতীয়তাবাদ ছিল না।

প্রাক-ইংরেজ যুগে তৃণমূল স্তরে হিন্দু-মুসলিম জীবনযাত্রায় যে স্বাভাবিকতা ছিল, তারই ফলে আমরা সংস্কৃতিসমন্বয়ের বিশাল প্রবাহটি লক্ষ করি, যা এখনও ওই স্তরে বহমান। কিন্তু ক্ষমতার রাজনীতি এবার সেই সমন্বয়কে ক্রমাগত আঘাত হানছে। যাই হোক, ঈস্ট ইনডিয়া কোম্পানিই প্রথমে সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির সূচনা করেছিল শাসন ও সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে। ১৮৫৭ সালে হিন্দু-মুসলিম মিলিত মহাবিদ্রোহের পর সেই ভেদনীতি আরো তীব্র হয়ে ওঠে। তাদের মাধ্যম ছিল শিক্ষাব্যবস্থা। মধ্যযুগের লেখা সমস্ত ইতিহাস অনুবাদের ছলে বিকৃত করা হয়। 'মুতাখ্‌খারিন' বইয়ের পাশাপাশি 'রিয়াজুন সালাতিন' (১৭৮৯)-এর লেখকও ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারী ছিলেন এবং তাঁদের ইংরেজ-চাটুকারিতা বড়ো নির্লজ্জ। রামপ্রাণ গুপ্ত দ্বিতীয় বইটি বাঙলায় অনুবাদ করেছিলেন। দুটি বইয়েরই লক্ষ্য সুস্পষ্ট।

কিন্তু ইতিহাসের পুঁথির চেয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক বেশি। শৈলেশবাবুর জ্ঞাতার্থে নিবেদন, শারদীয় পূজামণ্ডপে কিংবা হিন্দু বিয়েতে যেসব পোশাক-আশাক পরা হয়, তার পিছনে আছে মুসলিম দরজিদের শ্রম আর সৌন্দর্যবোধ। বিয়ের বেনারসিতে আছে মুসলিম বয়নশিল্পী আর তাঁর কারিগরি পটুতা। যে জীবনে আমরা বেঁচে আছি, তার সমস্ত চাহিদা মেটায় মিলিত হিন্দু-মুসলমানের

শ্রম। এটাই স্বাভাবিকতা। এটাই মানবত্বের স্তর। এখানে কোনো বিরোধ নেই। তার চেয়ে বড়ো কথা, এটাই আমাদের দেশের প্রকৃত ঐতিহাসিক বাস্তবতা। অতীতের কোনো বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষের ঘটনা ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হতে পারে বড়ো জোর। তা দিয়ে অতীতের সামগ্রিক হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ককে বিচার করা মূঢ়তার নামান্তর। আধুনিক ইতিহাসগবেষণার নীতি আর্থ-সামাজিক ভিত্তি এবং কাঠামোকেন্দ্রিক। পুরনো ঐতিহাসিকদের ঘটনাকেন্দ্রিক রাজা-রাজড়ার কাহিনী আর ইতিহাস বলে বিবেচিত হয় না।

এবার গো-হত্যা প্রসঙ্গে কিছু বলি। আমি ব্যক্তিগতভাবে গোমাংসের প্রতি অ্যালার্জিপ্রবণ এবং মৎস্যভুক্ প্রাণী। তথ্যের খাতিরে এগুলো লিখছি।

(১) ইংরেজ আমলে দেশীয় হিন্দু রাজা-মহারাজা-দের রাজ্যে গোহত্যা নিষিদ্ধ ছিল।

(২) অখণ্ডিত বঙ্গে বহু হিন্দু জমিদারের মহালে গোহত্যা নিষিদ্ধ ছিল। জমিদার ছিলেন প্রজাদের মা-বাপ। তাই মুসলিম প্রজারা ওইসব মহলে গোমাংস খেত না (ব্যতিক্রম ছেড়ে দিচ্ছি)। বংশানুক্রমে গোমাংস খাওয়া ছেড়ে দেওয়ার ফলে গোমাংসে তাদের অরুচি ধরেছিল। বিগত পাঁচের দশকেও দেখেছি, মুসলিম ভোজ-অনুষ্ঠানে তাদের জন্য পৃথকভাবে পরিবেশিত হত মোষ, ছাগল, ভেড়া বা খাসির মাংস। তাদের বলা হত 'পরব্জি'। মূল শব্দটি ফার্সি 'পরহেজগার' এবং অর্থ হল ধর্মপরায়ণ। কিন্তু আঞ্চলিক অপভ্রংশে এটি 'পরজি'-তে পরিণত হয় এবং কনোটেশনও বদলে যায়। 'পরজি' অর্থ যারা বাছবিচার করে চলে। বহু গ্রামে গোহত্যা নিষিদ্ধ থাকায় যারা গোমাংসভোজী, তাদের জন্য গোপন সরবরাহকারীরা ছিল।

(৩) পশ্চিমবঙ্গ, কাশ্মীর, গোয়া ও কেরল বাদে ভারতের সমস্ত রাজ্যে গোহত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সাতের দশকের প্রথমার্ধে পশ্চিমবঙ্গেও গোহত্যা নিষিদ্ধ করার জন্য চাপ এসেছিল। সরকার নতি-স্বীকার করেন নি। তবে কিছু বিধিনিষেধ চালু করেন। ওই সময় বৃদ্ধদেব বসু, গৌরকিশোর ঘোষ প্রমুখ গোমাংসের সপক্ষে লেখালেখি করেছিলেন। আমি গোমাংস ভক্ষণের সপক্ষে নই, শৈলেশবাবু-কথিত 'দুগ্ধদানের উপযুক্ত গাভী ও কৃষির উপযুক্ত বলদ'-বধের উদ্ভট ধারণার প্রতিবাদে 'দেশ' পত্রিকায় 'গোঘ্ন' নামে একটি গল্প লিখেছিলাম। বাস্তব-অভিজ্ঞতাভিত্তিক গল্প।

(৪) শৈলেশবাবুর ধারণা বিভ্রান্তিকর। কে এমন নির্বোধ আছে যে, দুধের গোরু বা চাষের বলদ কশাইকে বেচবে? সক্ষম গোরু চাষিমজুরের জীবনে মহামূল্যবান অর্থনৈতিক শক্তি। সহজ অঙ্ক কষে দেখাই। পশ্চিমবঙ্গে যেমন-তেমন একটি দুধের গোরু বা চাষের বলদের দাম এ বাজারে কমপক্ষে এক হাজার টাকা। বড়ো জোর ৪০ কেজি মাংস (হাড়সুদ্ধু) ১৪ টাকা কেজি (সর্বোচ্চ দর) হিসেবে ৫৬০ টাকা। চামড়া, মোটা হাড় ইত্যাদির দাম বড়ো জোর ২০০ টাকা। কশাই এক হাজার টাকায় গোরু কিনে কি লোকসান করবে? বিহার, উত্তর-প্রদেশে তো গোরুর দাম আরও বেশি।

(৫) আসলে কশাইখানায় বা গ্রামাঞ্চলে যেসব গোরু মাংসের জন্য হত্যা করা হয়, তারা রুগ্ন, চাষবাসে অক্ষম, বুড়ো। কোরবানি পরবে গাভীহত্যা করা হয় বটে, কিন্তু সেই গাভী বন্ধ্যা। গোচারণ-ভূমি বিধ্বস্ত, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে। লোকে এখন টাকা চিনেছে। তাই কী হিন্দু কী মুসলিমের আগের মতো রুগ্ন, অক্ষম, বন্ধ্যা গোরুর স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করে ভাগাড়ে ফেলার তর সয় না। কশাইকে বেচে দিয়ে পয়সা কামায়। তা ছাড়া সমস্যাও আছে। এসব গোরুর জন্য খাদ্য যোগানো বা সেবাযত্নের ঝক্কি আছে। আগে প্রচুর চারণভূমি ছিল। অবসর ছিল। এখন প্রতিটি মানুষ টাকার ধান্দায় ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। চাষিমজুরই প্রধানত গোরু পোষেন। তাঁদের দারিদ্র্যের কথা ভুললে চলবে না।

(৬) শৈলেশবাবু 'ভাগাড়' কথাটি নিশ্চয় জানেন। মুসলিম গ্রামেও ভাগাড় জীবনযাপনের আবশ্যিক অংশ। একটি ভাগাড় থাকা চাই-ই। তবে কশাইকে বেচার আগে দৈবাৎ গোরু মারা পড়লে ফেলে আসে এবং এক্ষেত্রে অদ্ভুত ব্যাপার, পরিবারটি আনুষ্ঠানিক-ভাবে শোকপালন করে। ভীষণ কান্নাকাটি করতেও দেখেছি। কুম্ভীরাশ্রু বলা চলে এ যুগে। আগে কিন্তু প্রকৃত কান্নাই কাঁদত।

(৭) হাজার-হাজার বৃদ্ধ, রুগ্ন, অক্ষম গোরু উত্তর-প্রদেশ-বিহার ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে পাইকাররা কিনে নিয়ে আসে। প্রতি শুক্র-শনিবার পার্কসার্কাস এলাকা থেকে সি আই টি রোড ধরে হতভাগ্য প্রাণী-গুলি ট্যাংরা কশাইখানায় যায়। শৈলেশবাবুকে অনুরোধ, একদিন স্বচক্ষে প্রাণীগুলির স্বাস্থ্য দর্শন করুন। বিভ্রান্তি দূর হবে।

(৮) শৈলেশবাবু কি ভাবছেন আবার সেই আদিম কৃষিসমাজ ফিরে আসবে? এনার্জির বিকল্প উৎসের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান তো থেমে নেই। আগের সভ্যতাগুলি ছিল নেহাত স্থানিক। এ যুগের প্রাযুক্তিক উৎকর্ষ সর্বব্যাপী এবং আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতা বিশ্বজনীন। প্রাচুর্যের সমাজে 'ব্যাক টু দা নেচার' শ্লোগান নেহাত 'হ্যাড সোসাইটির' মতো হঠকারী শৌখিনতা। মানুষ কি ইতিহাসের পথে পিছু ফিরতে পারে, এই মহাকাশযুগে? তার পিছু হটার উপায় নেই। সামনে ধ্বংস ও শূন্যতা থাকলেও তাকে সামনেই হাঁটতে হবে। এ কোনো আর্ষবাণী নয়। পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা তা-ই তো বলছে।

পরিশেষে শৈলেশবাবুকে স্মরণ করতে বলি, ভারতের হিন্দু এবং বৌদ্ধরা ছাড়া সারা পৃথিবীতে লোকেরা গোমাংস খায়। আদিমযুগ ফিরে এলেও তারা কি গোমাংস খাওয়া ছেড়ে দেবে?

পুনশ্চ: প্রসঙ্গত বিশেষ উল্লেখ্য ঘটনা, পশ্চিম-বঙ্গে সরকারিভাবে গোহত্যা নিষিদ্ধ না হলেও বহু মফশ্বল শহর এবং গ্রামে বেসরকারিভাবে গোহত্যা বন্ধ করা হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজই এটা করেছেন। তাই মুসলিমদের জন্য গোপনে গোমাংস আসে বাইরে থেকে। সেই গোমাংস-বিক্রেতারা মুসলিমপাড়ায় বিবিধ সাংকেতিক শব্দ হেঁকে ফিরি করে বেড়ায়।

শৈলেশবাবু সংসদে বিদেশে গোমাংস রফতানির হিসেব দাখিলের উড়ো তথ্য জানিয়েছেন। বিদেশে ভারত থেকে গোমাংস রফতানি হয় না। বিভিন্ন প্রাণীর চামড়া, শিং ও হাড় সামান্য পরিমাণে রফতানি হয়। এর মধ্যে মোষের চামড়াই বেশি। কারণ পানজাব, রাজস্থান, হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তর-প্রদেশ, সিকিম, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, আসাম ও পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে গোহত্যা নিষিদ্ধ, কিন্তু মোষহত্যায় বাধা নেই। এইসমস্ত রাজ্যের মুসলিমরা মোষের মাংস খেতে অভ্যস্ত হয়েছেন। মোষের মাংস গোমাংসের চেয়ে শস্তাও বটে।

ভারতে উৎপন্ন মোট দুধের শতকরা ৯০ ভাগই মোষের দুধ। গোরুর চেয়ে মোষ অনেক বেশি দুধ দেয়। তা সত্ত্বেও ভারতের দুধের চাহিদা মেটাতে বিদেশ থেকে গুঁড়ো দুধ আমদানি করতে হয়।

যাই হোক, সত্যের খাতিরে এবং যুক্তিবাদী দৃষ্টি-ভঙ্গিতে খতিয়ে দেখলে ভারতে গোহত্যায় নিষেধাজ্ঞা জারির পিছনে কখনই অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য নেই। গরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সংস্কারই এই সরকারি নীতির নিয়ামক। মানুষমাত্রই সংস্কারবদ্ধ জীব। বিশেষ করে সাধারণ মানুষ সংস্কারের দাস। কিন্তু উচ্চ মানসিক পরিশীলন বহু সংস্কারকে ছিন্ন করতে সমর্থ (বিবেকানন্দ গোমাংসের ব্যাপারে আপত্তি করেন নি)। আজকাল অনেক শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু, বিশেষ করে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের নির্দ্বিধায় গোমাংস খেতে দেখি। পশ্চিমে গিয়েও অনেকে অভ্যস্ত হচ্ছেন।

আবার একটা উলটো ঘটনাও ঘটছে। একসময়

যে অন্ত্যজ (যেমন বাঙালি মুচিবায়েনরা) অচ্ছ্যুৎ সম্প্রদায় গোমাংস খেতেন, তাঁরা অধুনা আর খান না। মুচিবায়েনরা খুবই গরিব। তাঁরা মৃত গোরুর মাংস খেতেন। আমাদের গ্রামের ভাগাড়টির বাৎসরিক নিলাম ডাকা হত এবং তিরিশের দশকে বাৎসরিক পাঁচ টাকা সর্বোচ্চ দর উঠত। নিলামে কোনো মুচিবায়েন ডেকে নিতেন। সারা বছর যত মৃত গোরু মোষ ছাগল ভাগাড়ে পড়ত, সেগুলির অধিকার ছিল তাঁর। চামড়া ছাড়িয়ে মাংস নিয়ে যেতেন। কিছু মাংস স্বজাতির মধ্যে বিক্রি করতেন। চামড়া শহরে চালান দিতেন। মৃত পশুর চামড়ার দর স্বভাবত কম ছিল। 'ভাগাড়' নিলামে ডাকার রীতি অধুনা লুপ্ত। পাঁচের দশকে একটি করুণ দৃশ্য দেখেছিলাম ভাগাড়ে। পাশের গ্রামের এক মুচিবায়েন তাঁর বালিকা কন্যাকে প্রতিদিন ভাগাড় দেখতে পাঠাতেন। একটা কঞ্চি হাতে সে দাঁড়িয়ে থাকত মৃত পশুর প্রতীক্ষায়। একদিন দেখি, একটা মৃত বলদকে কেন্দ্র করে মেয়েটি শকুন ও কুকুরের সঙ্গে লড়াই করছে। গ্রীষ্মের দুপুরে একটি ছোট্ট মেয়ের অসহায় কান্না, গালাগালি, অভিসম্পাত ও কঞ্চি আস্ফালন! সেই সময় তার বাবা এসে গেলেন। লড়াই এবার তীব্র হল। শকুন ও কুকুরবাহিনীকে পরাস্ত করে বিকেল নাগাদ বাবা-মেয়ে চামড়া ও মাংস নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। এই ঘটনা নিয়ে "তরঙ্গিনীর চোখ" নামে একটি গল্প লিখেছিলাম ১৯৬১ সালে অধুনালুপ্ত "ছোটগল্প" পত্রিকায়। পরে সেটি বোম্বাইয়ের টাইমস অব ইনডিয়া গোষ্ঠীর হিন্দি মাসিক "শরিকা" পত্রিকায় অনূদিত হয়। অনুবাদ করেন লখনৌবাসী এক বাঙালি অনুবাদক প্রবোধ মজুমদার। এখনকার দিনে এমনটা সম্ভব নয়।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
কলকাতা-১৪

২
গানবাজনাচর্চাকারী ফকির-বাউলদের উপর অত্যাচারের তথ্য আছে

"চতুরঙ্গ" পত্রিকার জুন ১৯৯০ সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ মহাশয় "সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি" বিভাগে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ সম্পর্কে বিচ্ছিন্নভাবে যেসব মন্তব্য করেছেন তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বেশ কিছু বছর আগে "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীসিরাজের "গোম্ব" ছোটো গল্পটি পড়বার পর থেকে তাঁর প্রতি আমার অন্য এক ধরনের শ্রদ্ধা রয়েছে। আমার প্রবন্ধের মূল তাৎপর্যের কোনো উল্লেখ তিনি করেন নি, তাঁর কয়েকটি মন্তব্যের জবাবে বিনীতভাবে কিছু জানাতে চাই।

ক. তিনি আমাকে 'শিক্ষিত শহরবাসী বুদ্ধিজীবী' আখ্যা দিয়ে বলেছেন, 'দেশের মাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ' পরিচয় নেই। কাজের সূত্রে শহরে থাকতে বাধ্য হই, কায়িক শ্রম না করে কলম পিশে জীবিকা নির্বাহ করি,—তাই তাঁর প্রথম অভিযোগকে অস্বীকার করতে পারি না। দেশের মাটি আর মানুষ সম্পর্কে হয়তো অল্পই জানি, কিন্তু একেবারে পরিচয় নেই তা বোধহয় নয়। আমি জনৈক অনামী একজন সরকারি সাংবাদিক, আমার সম্পর্কে তাঁর পক্ষে কিছু জানা সম্ভব নয়। কিন্তু মন্তব্য করবার আগে তিনি "চতুরঙ্গ" পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে একটু জেনে নিতে পারতেন।

খ. 'ইসলামবিরোধী গানবাজনা' বলতে আমি কী বোঝাতে চেয়েছিলাম তা তিনি নিজেই পরে ব্যাখ্যা করেছেন। শুদ্ধি-আন্দোলনের প্রবক্তারা আজ মুর্শিদাবাদ-বীরভূমে বলছেন, ইসলামে গানবাজনা নিষিদ্ধ। ধর্মে নিষিদ্ধ কিনা আমি জানি না, কিন্তু এঁরা সেকথাই বলেন। সংস্কৃতি যে এই নিষেধ মানে নি তার প্রমাণ তো হিন্দুস্তানি সংগীতের উজ্জ্বল সংগীতশিল্পীদের নামের তালিকা দেখলেই বোঝা যায়। তিনি আমার অভিযোগকে স্বীকার করেই

নিয়েছেন, কেননা তিনি লিখেছেন 'আউল-বাউল-নেড়ার ফকিরদের ওপর একটু-একটু চাপ সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সেটা ব্যতিক্রম।' ব্যতিক্রম তো বটেই, সমাজে অসংখ্য সুস্থ মানুষ রয়েছেন বলেই এগুলো এখনও ব্যতিক্রম। কিন্তু একটু-একটু চাপ নয়। এ বিষয়ে শ্রীসিরাজ বিস্তারিত তথ্য পাবেন তাঁরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু কৃষ্ণনাথ কলেজের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝা এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের অনেক হিন্দু-মুসলমান অসাম্প্রদায়িক মানুষের কাছে। এঁরা ছাপানো প্রচারপত্রে অনেক তথ্য জানিয়েছেন। অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝায়ের সঙ্গে নিয়মিত যোগ রয়েছে শ্রীসিরাজের। তাই বিষয়টি এত লঘু করে কিভাবে তিনি দেখছেন ঠিক অনুভব করতে পারছি না।

গ. মৌলবি-পুরোহিতদের ফতোয়ায় যে এখনও কোনো কাজ হচ্ছে না, তার কারণ বেশির ভাগ মানুষ সংহতির সপক্ষে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন কিছু কাজ হয়, নিরীহ মানুষ তাতে প্রাণ দেন। কাটরা মসজিদের ঘটনাকে তিনি বড়ো লঘু করে ব্যাখ্যা করেছেন। হাজি মস্তান ও দিলীপকুমারের আগমনের গুজব ছড়ানোর জন্যই অত লোক এসেছিল? বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, যাঁরা এসেছিলেন হয় তাঁরা বাঙলা বোঝেন না কিংবা সম্পূর্ণ বধির। মিছিলে যে শ্লোগান দেওয়া হয়েছিল তাতে স্পষ্টভাবে নামাজ পড়ার নির্দেশ ছিল। সারা বহরমপুর শহর ও আশেপাশের গাঁয়ে সবার মুখেই নামাজ পড়ার তথ্য শুনেছি, অন্য কথা মেনে নিতে অসুবিধে হচ্ছে। কয়েকজন শান্তিপ্রিয় নিরীহ গরিব মানুষ প্রাণ দিলেন অতি তুচ্ছ কারণে, এটাই আমাকে বিচলিত করেছে। হাজারো উপাসনা-স্থানের চেয়ে একটি মানুষের প্রাণের মূল্য আমার কাছে অনেক,—আমি এটাই বোঝাতে চেয়েছিলাম।

ঘ. শ্রীসিরাজ বলেছেন,—'অনেকের ধারণা মুসলিম সম্প্রদায় খুব ঐক্যবদ্ধ। ধারণাটি ভুল।' আমার প্রবন্ধের আগাগোড়া আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম, নিজ-নিজ মানুষের প্রতিও বিদ্বেষের ঐতিহ্য বহন করে প্রতিটি ধর্ম। হিন্দু-ইসলাম-খ্রীষ্টান প্রতিটি ধর্মের মধ্যেকার যে সংকীর্ণতা বাস্তবে প্রতিফলিত হচ্ছে, সেটা দেখানোই ছিল আমার উদ্দেশ্য। ধর্মগ্রন্থে যা লেখা থাকে তা পালন করা হয় না। আমি কোথাও 'সোনার পাথরবাটি'র খোঁজ করি নি, 'কাণ্ডজে সাংবাদিকতা'ও করি নি। তবে শ্রীসিরাজের সাংবাদিকতার মাধ্যমে জানতে পারলাম তাঁর কোন্-কোন্ উপন্যাস মুর্শিদাবাদকে নিয়ে লেখা। সুন্দর বিজ্ঞাপন।

ঙ. আমার এইসব মন্তব্যকে শেষ পর্যন্ত ইনিয়ে-বিনিয়ে তাঁকে মেনে নিতে হয়েছে। যে ভুলটি আমার অমার্জনীয় তা স্বীকার করছি। চাঁই সম্প্রদায়কে আমি মুসলমান আখ্যা দিয়েছি। আমি এঁদের মধ্যে সমীক্ষার কিছু কাজ করেছি, এঁদের সম্পর্কে কিছু জানাশোনা আমার রয়েছে। পাণ্ডুলিপিতে কেন এই ভুল রয়েছে তা আমি জানি। কিন্তু তার জন্য সাফাই গাইব না। এই ভুলের জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আমাকে অজ্ঞ বললেও তা স্বীকার করে নিচ্ছি।

শ্রীসিরাজের মতো উদারহৃদয় সংস্কারবিমুক্ত প্রথ্যাত কথাসাহিত্যিক আমার প্রবন্ধের মূল স্পিরিট সম্পর্কে একটি কথাও উচ্চারণ করলেন না, এতে বড়ো মর্মাহত হয়েছি। মনে হচ্ছে, মূল উদ্দেশ্যটি আমি ব্যক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছি।

দিব্যজ্যোতি মজুমদার
কলকাতা-৭০০ ০৩১

৩
সবই অর্থতৃষার দীনতা নয়

"চতুরঙ্গ"-মে '৯০ সংখ্যায় প্রকাশিত পিনাকী ভাদুড়ী লিখিত "সোনার চেয়ে আলোর দাম বেশি" নিবন্ধের রচনাশৈলী সরল কিন্তু গভীর। এর মধ্যে এমন একটা সাবলীলতা আছে যা বহতা নদীর মতো নিবন্ধের সমাপ্তির দিকে টেনে নিয়ে যায়। নিবন্ধে আলোচিত

প্রত্যেকটি রচনার সঙ্গে পরিচিতির যোগসূত্র আগেই ছিল তবু অন্য দিগ্‌বলয় থেকে আলোকিত হয়ে অন্য আলোয় রচনাগুলো আলোচিত হওয়ায় প্রবন্ধের শেষ পর্যন্ত আকর্ষণ বজায় থাকলেও নিবন্ধের অপূর্ণতা ও অসঙ্গতি সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য থেকে যায়।

যেমন, রবীন্দ্রনাথের এই পর্যায়ের রচনাগুলো দুই ভাগে বিভক্ত। এক, শেষ পর্যন্ত যারা সোনার মোহে অবিচল থেকেছে তাদের জীবননাট্যের শেষ অঙ্ক ধ্বংসের অনলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে আর যারা অন্য মূল্যবোধের বৃত্তে প্রবেশ করেছে তাদের জীবন নন্দন উদ্যানের মলয় সমীরণ আর মন্দাকিনীর অমৃত-প্রবাহে প্লাবিত হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে রচনার উদ্‌বৃতিসহ আলোচনা আরো তৃপ্তিদায়ক হত।

দ্বিতীয়ত, এখানে রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনার উল্লেখ থাকলেও 'অজানে শীতের রাতে' (মূল্যপ্রাপ্তি) কবিতা অমুক্ত থাকায় আশাহত হতে হয়। মালি যে উদ্দেশ্য নিয়ে শীতের সরোজ বাজারে নিয়ে গেছিল তা প্রকৃত অর্থেই স্বর্ণতৃষা। (বিনিময়মূল্য হিসাবে স্বর্ণমুদ্রাই তার কামনা ছিল।) অবশেষে মালির সেই হৃদয়-পরিবর্তনের কাহিনী এবং শুধু পদরেণুর বিনিময়ে বুদ্ধের পাদপদ্মে পদ্মাঞ্জলির মধ্যে কাহিনীর সমাপ্তি। এখানে মালির কাছে বুদ্ধের ক্ষমাসুন্দর চক্ষের করুণা-কিরণ পরম পাওয়ার রূপ নিয়েছে। তাই এর অমুক্তিতে নিবন্ধের অপূর্ণতা থেকে যায়।

আর 'তোমার কাছে দেখাইনে মুখ মণিমালার লাজে'—যে প্রসঙ্গ অবতারণার পর উল্লেখ করা হয়েছে তা প্রকৃত অর্থেই অপ্রাসঙ্গিক ও অসঙ্গতি-মূলক। কারণ মণিমালিকার মণিমালার সঙ্গে মণিহারের মণিমালার তুলনা চলে না। মণিহারে যে মণিমালার উল্লেখ করা হয়েছে অর্থে তার মূল্য নির্ধারিত নয়। আর এখানে যে লজ্জা তা তীব্র স্বর্ণতৃষার দীনতা নয়—এই লজ্জা বুকভাঙা অভিমানের করুণ অভিব্যক্তি।

এই প্রসঙ্গে রক্তকরবীর উল্লেখও মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। যুক্তি মোটামুটি এই—এ নাটকে ব্যক্তিগত স্বর্ণতৃষা উপজীব্য নয়। এখানে লড়াইটা হচ্ছে দুই সমাজব্যবস্থার। এ লড়াই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার লড়াই। এখানে রবীন্দ্রনাথ সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সপক্ষে কথা বলেছেন। সত্য বটে নন্দিনী রাজাকে বলেছেন--'সোনার পিণ্ড কি তোমার হাতের আশ্চর্য ছন্দে সাড়া দেয়—যেমন সাড়া দিতে পারে ধানের খেত।' কিন্তু হাওয়ার হিন্দোলে দোলে যে মাঠের সোনা সে তো আলোর নয়—সে একান্ত অর্থেই ধুলোর—কারণ এ কোনো অমর্ত্য লোকের কথা বলে না—এ শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের বিকল্প ব্যবস্থার কথা বলে। আসল কথা হচ্ছে নতুন উৎপাদনব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে খেতখামার ছেড়ে কলকারখানায় মানুষের ছুটে আসা দেখে রবীন্দ্রনাথের রক্ষণশীল মন (এই নাটকের প্রেক্ষাপটে) বেদনাঘন হৃদয়ে ধ্বংসের বীজই শুধু দেখেছে, শুনতে পায় নি সৃষ্টির কোনো উল্লাস। তাই "রক্তকরবী"র সংসার হয়েছে সৃষ্টিছাড়া অনাসৃষ্টির লীলাভূমি। নাটকের শেষে যে সোনার কথা বলা হয়েছে (পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে) তা আলোর নয়—তা ধুলোর এবং সর্বাংশে আক্ষরিক অর্থে।

অরুণশংকর দাশ

Rupa
PUBLICATIONS

THE COMPLETE WORKS OF SAKI Rs. 95

BIBHUTIBHUSAN BANERJI / W. T. CLARK and TARAPADA MUKHERJI
PATHER PANCHALI : Song of the Road Rs. 50

ROBERT LUDLUM
THE BOURNE ULTIMATUM Rs. 50

W. O. COLE and P. S. SAMBHI
A POPULAR DICTIONARY OF SIKHISM Rs. 50

COLLINS POCKET REFERENCE ENGLISH DICTIONARY Rs. 48

K. BLANCHARD and S. JOHNSON
THE ONE MINUTE MANAGER Rs. 30

K. BLANCHARD, P. ZIGARMI and D. ZIGARMI
LEADERSHIP AND THE ONE MINUTE MANAGER Rs. 30

S. JOHNSON and L. WILSON
THE ONE MINUTE SALES PERSON Rs. 30

K. BLANCHARD and R. LORBER
PUTTING THE ONE MINUTE MANAGER TO WORK Rs. 30

K. BLANCHARD, W. ONCKEN and H. BURROWS
THE ONE MINUTE MANAGER MEETS THE MONKEY Rs. 40

Rupa & Co.
15 Bankim Chatterjee Street
Calcutta 700 073

চতুরঙ্গ

প্রতি সংখ্যা ছয় টাকা
সডাক গ্রাহকমূল্য বার্ষিক ৭০ টাকা
যান্মাসিক ৩৫ টাকা

এজেন্সির নিয়মাবলী

১। পাঁচ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না।
২। কমিশন শতকরা ২৫। পঁচিশ কপির উর্ধ্বে শতকরা ৩০।
৩। ডাক-খরচ আমরা বহন করি।
৪। কপি-পিছু দেড় টাকা আমাদের দপ্তরে জমা রাখতে হবে।

•

লেখকদের প্রতি নিবেদন

যাঁরা প্রকাশের জন্য কবিতা পাঠাবেন তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে নকল রেখে পাঠান—অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়।

অন্যান্য অমনোনীত রচনা যাঁরা ফেরত নিতে চান তাঁরা অনুগ্রহ করে উপযুক্ত পরিমাণে ডাক-টিকিট পাঠালে আমাদের সহায়তা করা হবে।

প্রেরিত রচনায় অপরিচিত বা স্বল্পপরিচিত বিদেশী ব্যক্তিনাম আর স্থাননাম থাকলে, সঙ্গে আলাদা একটি কাগজে ইংরেজি বড়ো হরফে সেগুলি লিখে দিলে উপকার হবে।